ভারত-আত্মার বাণী

THE SOUL OF INDIA SPEAKS

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ
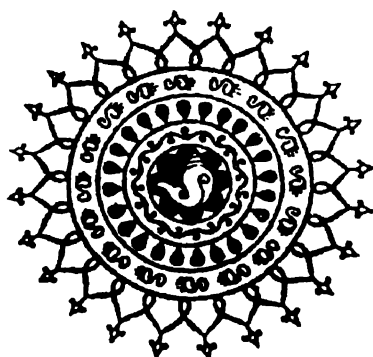
ভূমিকা

ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূলকথা বিশ্বাত্মবোধ, ভারতের ধর্ম বিশ্বমানবধর্ম, ভারতের বাণী বিশ্ব-মৈত্রী ও বিশ্ব-প্রীতির বাণী। এই বাণী উত্থিত হইয়াছিল ভারতে মানব-সভ্যতার আদি যুগে। আর আজিও, এই অতি-আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্র-গান্ধী প্রমুখ ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের মাধ্যমে এই শাশ্বত বাণীই বিক্ষুব্ধ জগৎকে শুনাইতেছে। ভারতের এই চিরন্তন আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাই আমরা এই গ্রন্থে অনুসরণ করিয়াছি এবং উহার ব্যাখ্যা করিতে ক্ষীণ প্রয়াস করিয়াছি।

অবশ্য বিশ্বপ্রীতির বাণী, মানবতার বাণী, অন্যান্য দেশের নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রাদিতেও না আছে তাহা নয়। কিন্তু এই নীতির ভিত্তি কী, কেন স্বভাবত স্বার্থপর মানব-জন্তুটি পরার্থপর দেবতা হইবে, অপরকে আপনার ন্যায় ভালবাসিবে, এই সম্ভাব্যতার মূল কী, এ প্রশ্নের উত্তর ঐ সকল পাশ্চাত্য শাস্ত্র দিতে পারে না।

সে উত্তর দিয়াছেন আর্যঋষি—

'ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।'

—লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশত লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়।

তুমি অপরকে, তোমার শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন? কারণ, তুমি তোমার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে ভালবাস বলিয়া, তুমিই সেই—তত্ত্বমসি।

'The highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality — "Love your neighbour as yourself,' but why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbours?" The answer is not in the Bible, But it is in the Vedas—in the great formula—'That thou art' (তৎ-ত্বম্-অসি) which gives in three words metaphysics and morals together '

—Dr. Duessen

এস্থলে বলা হইল, বেদের তৎ-ত্বম্-অসি এই তিনটি শব্দে নীতি ও তত্ত্ব, ধর্ম ও দর্শন, উভয়ই আছে। বস্তুত বেদান্তের একত্ব-তত্ত্বই বিশ্বপ্রেমের মূল। জীবনে ও লোক-ব্যবহারে, জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে এই একত্বের সাধনাই সমগ্র ঋষিশাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়। ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্যে এই কথাটিই সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে—

'এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।'

এই কথাটিই বেদোপনিষৎ-গীতা-মহাভারত-পুরাণাদি সমগ্র ঋষিশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক এই গ্রন্থে বিস্তার করা হইয়াছে।

অধুনা জগতের চিন্তানায়কগণের এবং রাষ্ট্রনায়কগণেরও একটি প্রধান চিন্তার বিষয় হইতেছে—মানব-জাতির ঐক্য-সাধন। জগতে এক জাতি— মানব-জাতি, এক সমাজ—মানব-সমাজ, এক ধর্ম—মানব-ধর্ম। ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সকলই এই আদর্শ দ্বারা কীরূপে অনুপ্রাণিত ও অনুশাসিত হইতে পারে মহাপ্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাই চিন্তা করিতেছেন। আধুনিক যুগের মানবধর্মবাদ (Posivitism of Humanitarianism), শান্তিবাদ (pacifism) প্রভৃতি মতবাদে এই চিন্তাধারারই অভিব্যক্তি। বিশ্বরাষ্ট্র-সম্মেলন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রভৃতির পরিকল্পনা ইহারই ফল।

কিন্তু বুদ্ধিপ্রসূত এই সকল নৈতিক উপায় বাহ্য, মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন না ঘটিলে, মানবাত্মা অধ্যাত্ম-সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভেদজ্ঞান বিদূরিত হয় না। যতদিন পর্যন্ত তাহা না হয় ততদিন এই সকল নৈতিক উপায়ই অবলম্বনীয়, অন্য পথ নাই। কিন্তু ঐক্যবোধের প্রকৃত পথ আধ্যাত্মিক, অধ্যাত্ম-অনুভূতি, যাহা ভারত চিরকাল শিক্ষা দিয়াছে—এই অনুভূতি যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে এক অদ্বয় বস্তু আছেন, এক পরম পুরুষ আছেন, যাঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, God, Spirit, Divinity, যাহাই বল না কেন, যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, 'ভূতেষু ভূতেষু গূঢ়'—যাঁহার সংযোগে আমরা সকলেই এক।

বিশ্বাত্মার পরশে, বিশ্বমানবের এই একাত্মতার অনুভবই বিশ্বপ্রেমধর্মের মূল। এই অনুভব যত সুদৃঢ় হইবে ততই ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হইবে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত অহমিকা হ্রাস পাইবে, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে প্রীতি-মৈত্রী বর্ধিত হইবে, বিশ্বময় অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

এই ঐক্যের মন্ত্রই সেই সুদূর অতীতে এই ভারতে ঋগ্বেদের ঋষির কণ্ঠে সমগ্র মানব-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া উদ্গীত হইয়াছিল—

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।। —ঋক্, ১০।১৯১

—তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করিতে পার।

ইহাই ভারত-আত্মার বাণী।

এই গ্রন্থটি প্রধানত বাণী-সংগ্রহ-গ্রন্থ। প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য ব্যতীতও আধুনিক যুগের মহাপুরুষগণের প্রচুর বাণী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অরবিন্দ-গ্রন্থরাজি, বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী, শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্য ও গান্ধী-সাহিত্যের প্রকাশকগণের ঔদার্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই সঙ্কলনে সাহসী হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীঅনিলবরণ রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রী ডি জি টেণ্ডুলকর (D. G. Tendulkar) প্রমুখ খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণের পুস্তকাদি হইতেও অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য এই সকল প্রকাশক ও গ্রন্থকারের নিকট আমি অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ আছি।

বৃদ্ধবয়সে (৮২) এই গ্রন্থ-প্রণয়নকালে দৃষ্টিশক্তি বড়ই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়টি কল্যাণীয় শ্রীমান্ অনিলচন্দ্র ঘোষকে আমার পরিকল্পনা-অনুসারে লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। পরে ভগবৎকৃপায় চক্ষুর অবস্থা কিছু ভাল হইলে পরবর্তী দুইটি অধ্যায় নিজেই লিখিতে পারিয়াছি, তাহা না পারিলে পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ থাকিত। ষষ্ঠ অধ্যায়টি আর পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধ করি নাই।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৬০
১৬ই মার্চ, ১৯৫৪

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ

হেথা মূর্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উহার আধ্যাত্মিকতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য-ইতিহাসের কোনও কোনও পাশ্চাত্য সমালোচক এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতার মাত্রাধিক্যহেতুই ভারতের অশেষ দুঃখ-দুর্দশা। ইহা অপেক্ষা পরত্রের দিকেই ভারতবাসিগণ অধিক ঝুঁকিয়াছিলেন, ঐহিক সুখ-সম্পদ, রাজত্ব-প্রভুত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁহারা অসার বলিয়া মনে করিতেন, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সংসার-ত্যাগ ও কর্মত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনায় নিরত থাকিতেন। এই হেতু ভারত কখনও স্বাধীন সমর্থ রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হয় নাই। তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসে ভারত চিরকালই স্বেচ্ছাচারী রাজগণের এবং ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের অধীন ছিল। অচলায়তন সামাজিক অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। ফলে দারিদ্র্য, রিক্ততা, জীবনসংগ্রামে পদে পদে অক্ষমতা ও দীর্ঘকাল পরাধীনতা।

ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতা সম্বন্ধে 'প্রাণবন্ত' পাশ্চাত্য সভ্যতার সমর্থনকারী-দিগের এই সকল বিরুদ্ধমত কতদূর যুক্তিসহ তাহা আমরা পরে দেখিব। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অবদান বর্তমান জগৎ পাইয়াছে তাহার ফল তো আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি। দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল, আবার আসন্ন তৃতীয়টির আশঙ্কায় সকলে সন্ত্রস্ত, প্রলয়ঙ্কর আণবিক বোমা প্রয়োগের প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত।

যে সভ্যতা বাইবেলখানি গুটাইয়া রাখিয়াছে, ব্যাপক লোকহত্যার অভিযানে বিজ্ঞানের অপব্যবহার করিতেছে, অহংসর্বস্ব, পরস্বলোলুপ, জাত্যভিমানস্ফীত, সতত বিবদমান রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে ধ্বংসের পথে নিতেছে, তাহার কি আখ্যা দিব, জানি না!

ভারতের অবনতির যুগের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক ঐ সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয়। এসম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের লেখনী-প্রসূত সুবিস্তৃত মূলস্পর্শী তথ্যালোচনায় এই সকল মতবাদ একেবারে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকলের পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

বস্তুত আধ্যাত্মিকতা ভারতের অবনতির কারণ নয়। বরং এ কথাও বলা যায় যে, সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা অমর হইয়া আছে। জগতের প্রাচীন সভ্যতা প্রায় সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

"দোর্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম,
কাঁপিত যাহার তেজে মহীসিন্ধু ব্যোম?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ,
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল
প্রাচীন মিশরবাসী, কোথা সে সকল?"

কিন্তু ভারত এখনও আছে, এবং ভারতীয় রূপেই আছে। তাহার অধ্যাত্ম সংস্কৃতির চিহ্নসকল এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, বরং জগতের কল্যাণার্থ নবতররূপে প্রকাশোন্মুখ হইতেছে। সুদীর্ঘ পরাধীনতার যুগেও, বিজাতীয় সভ্যতার প্রতিকূল পরিবৃতির মধ্যেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, গান্ধী, অরবিন্দ প্রমুখ ঋষিগণ ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা মুহ্যমান জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন, যুধ্যমান জগতে প্রীতি, মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ-জটিল বন্ধ,
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী;
কর' ত্রাণ, মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।
এস দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয় সমারোহ—

প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ,
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহন-দীপ্ত
বিষয়-বিষ-বিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণপাণি—
তব শুভ-সংগীতরংগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

—রবীন্দ্রনাথ

'আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। হাজার হাজার বৎসরের নানারকম হাঙ্গামায় জাতটা ম'লো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ ত' আমরা এতদিন উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টায় ক্রুটি কি কিছু হয়েছে? আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে তাই আমরা বেঁচে আছি।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

এই যে দুঃখ-দুর্দশা, পরাধীনতা ইহা তো আসিল ভারত-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে। ইহার পূর্ববর্তী বহু সহস্র বৎসরের গৌরবময় সুদীর্ঘ ইতিহাস কী সাক্ষ্য দেয়? ভারতের জাতীয় অবনতির কারণ আধ্যাত্মিকতা নয়। ভারত যখন অধ্যাত্ম জ্ঞানের উচ্চ শিখরে সমারূঢ় তখনও উহা ক্ষাত্রতেজে সমুদ্দীপ্ত, শিল্প-বাণিজ্যে, ধনৈশ্বর্যে সমুন্নত ছিল। ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য-বীর্য, বৈশ্যের ধনৈশ্বর্য যুগপৎ সুসামঞ্জস্যে সমাজকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বিভবে-বীরত্বে, শিল্পে-সাহিত্যে, কলায়-কাব্যে, মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টায় সর্ববিধ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যাহা অতি আধুনিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। নগ্ন দারিদ্র্য, ঐহিকে ঔদাস্য, জীবন-যুদ্ধে নৈরাশ্য, এ সকল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রকৃষ্ট চিত্র নয়। ইতিহাসের সর্ব প্রাচীন যুগে আমরা দেখি আর্যগণ দেবতার নিকট 'আশিষ্ঠো, দ্রঢ়িষ্ঠো, বলিষ্ঠঃ' দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছেন—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

—বাজসনেয় সংহিতা ১৯।৯

—তুমি তেজ, আমাতে তেজ আধান কর, আমাকে তেজস্বী কর। তুমি বীর্য, আমায় বীর্যবান কর। তুমি বল, আমায় বলবান কর। তুমি ওজঃ, আমায় ওজস্বী কর। তুমি মন্যু (অন্যায়দ্রোহী), আমায় অন্যায়দ্রোহী কর। তুমি সহ্যশক্তি, আমায় সহনশীল কর।

অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতম্।
জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসং জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসম্।

—আমি যেন সুস্থ সবল দেহে শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি, শত শরৎ পরেও যেন শক্তিমান থাকি।

আমি যেন তোমার দৃষ্টিভাজন হইয়া সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকি, তোমার দৃষ্টির অধীনে যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করি।

বল-বীর্য দীর্ঘ জীবন লাভের এই প্রার্থনার সহিত যুক্ত আছে আরো উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা, যাহা ইহাকে প্রকৃতই মহনীয় করিয়াছে—

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।। —শুক্লযজুঃ

—হে পরমেশ্বর, আমাকে এমন দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমি যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি। আমরা যেন পরস্পরকে মিত্রভাবে দর্শন করি।

আবার এই সর্বভূতে প্রীতি-মৈত্রীর সহিত যুক্ত আছে সর্বজাগতিক শান্তির বাণী—

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি
রাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি। —শুক্লযজুঃ

এই তো প্রাচীন আর্যগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। জীবনে ঋদ্ধি, জীবে প্রীতি, জগতে শান্তি।

এই বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির বাণী উত্থিত হইয়াছিল ভারতে আর্য-সভ্যতার আদি যুগে।

ক্রমে আর্যগণের সমগ্র ভারতে সপ্তসিন্ধু হইতে ব্রহ্মাবর্ত, আর্যাবর্ত ও পরে দাক্ষিণাত্যে বসতি বিস্তার। ক্ষাত্রপ্রতিভার পূর্ণতর বিকাশ ও সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন—

'দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত ললাট,
স্পর্ধিতে অম্বরতল অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে।'

সে যুগের রাজধানীতে দেখি—সুবিভক্ত সুবিস্তৃর্ণ রাজপথগুলি নিত্য জলসিক্ত (রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা জলসিক্তেন নিত্যশঃ) রাজপথের উভয় পার্শ্বে আকাশচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণী (বিমানগৃহশোভিতাং), স্থানে স্থানে নারীগণের ক্রীড়াভবন (কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণাং), ধনিগণের ধারাগৃহে (ধারাগৃহেষ্বাতপ মৃদ্ধিমন্তঃ) যন্ত্র-সঞ্চালিত সুশীতল জলপ্রবাহ (যন্ত্রপ্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্), সর্বত্র সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা (বধূনাটক-সঙৈঘশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্), বিবিধ অস্ত্রাগার, যন্ত্রাগার, সর্বশিল্পি-নিবাস (সর্বযন্ত্রায়ুর্বধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ), নানা দেশাগত বণিকগণের সুশোভিত বিপণিশ্রেণী (নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপ-শোভিতাম্), হয়-হস্তি-রথ সমন্বিত অগণিত সৈন্যবাহিনী (বাজিবারণ সম্পূর্ণাং... নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং)।

'রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম-কোলাহলে।'

ওদিকে আবার,

ব্রাহ্মণের তপোবনে অদূরে তাহার
নির্বাক্, গভীর, শান্ত সংযত উদার।

শান্তরসাস্পদ তপোবনে ব্রহ্মধ্যান-নিরত ব্রহ্মর্ষি এবং ব্রহ্মবাদিনী ঋষিপত্নী, মূর্তিমতী তপস্যা—

হেথা মূর্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।

ব্রাহ্মণ-মহিমা ও ক্ষত্রিয়-গরিমার সমন্বয়ই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ভারতবাসীর সমগ্র জীবনধারা

যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিলেন ঋষিগণ। এই পুণ্যভূমিতে সেই প্রাচীন যুগে সকল শ্রেণীর মধ্যেই ঋষির উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষিও ছিলেন, রাজর্ষিও ছিলেন, এমন কি, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় স্থলবিশেষে শূদ্রত্বও ঋষিত্ব লাভের অন্তরায় হইত না। তবে সাত্ত্বিকতায় এবং আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যেই সাধারণত ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব হইত। ব্রহ্মবিদ্যা আগে ক্ষত্রিয়দেরই অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ ঋষি গৌতম প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন।

মনে হইতে পারে, ঋষিগণ বুঝি সকলেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে আশ্রম-নিবাসে সতত অধ্যাত্ম সাধনায় নিরত থাকিতেন; তাহা নয়। তাঁহারা বিষয়ত্যাগী হইয়াও বিষয়ীদিগের সহিত নিঃসম্পর্কিত ছিলেন না। তাঁহারা সর্বভূত-হিতে রত থাকিতেন। দেশের, দশের, সমাজের হিতকামনা করিতেন। আত্মবোধ ও দেশাত্মবোধ তাঁহাদের মধ্যে যুগপৎ বিকশিত হইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ঋষির একটি প্রার্থনা-বাণী উদ্ধৃত করিতেছি—

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্, আ রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্, দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড্‌বানাশুঃ সপ্তিঃ, পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণুঃ রথেষ্ঠ্যাঃ, সভেয়ো যুবা, অস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্, নিকামে নিকামে নঃ পর্যন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং, যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্। যজুঃ ২২

—আমাদের এই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মজ্ঞানে দীপ্তিমান হউন; যুদ্ধনিপুণ, দুষ্ট দমনকারী, মহারথী বীর ক্ষত্রিয়গণের এখানে উদ্ভব হউক; গাভীসকল দুগ্ধবতী, বৃষসকল ভারবহনে সক্ষম এবং অশ্বসকল দ্রুতগামী হউক; রমণীগণ গৃহকর্মনিপুণা হউন; যুবকগণ মহারথী 'শত্রুজয়ী' শিক্ষিত ও সুসভ্য হউন; যজমানের গৃহে বীরপুত্র জন্মলাভ করুক; পর্যন্যদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করুন; ওষধি-সকল ফলশস্যপূর্ণ হইয়া পরিপক্ব হউক; দেশের লোক যোগক্ষেমে (অলব্ধ বস্তুর উপার্জনে এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণে) সক্ষম হউক।

রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কামনায় প্রাচীন ঋষির এই প্রার্থনা-বাণীটি কি আধুনিক রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর বাণী বলিয়াও উদ্ধৃত করা যায় না?

বস্তুত ঋষিগণ লোক-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহারাই ছিলেন সমাজের সংস্থাপক, সংগঠন-কর্তা এবং ব্যবস্থাপয়িতা। তাঁহাদের পরিকল্পিত চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, চতুর্বর্গ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় আর্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এ সকলে আধ্যাত্মিকতার সহিত বৈষয়িকতার সুসমঞ্জস সমন্বয়। মানুষের নিম্ন প্রকৃতির, দৈহিক ও প্রাণিক বৃত্তি সমূহের বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা স্বীকার করিয়া ক্রমানুশীলনে উহাদিগকে বিশোধিত ও উন্নীত করিয়া মানবজীবনকে দিব্য জীবনে পরিণত করাই ছিল এ সকলের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে ঋষিগণ মানব-প্রকৃতির গুণগত পার্থক্যানুসারে শ্রেণী-বিভাগ ও প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম বা ধর্ম নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কর্ম যাহাতে আধ্যাত্মজীবন বিকাশের অনুকূল হয় তদনুরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দুর কর্ম-জীবন ও ধর্ম-জীবনে কোনও পার্থক্য নাই, পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় religious and secular life নাই—তাহার সমগ্রজীবনই ধর্ম-জীবন। কেবল ব্যষ্টি-জীবন নয়, সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র সমাজ-জীবন ধর্মের অধীন ছিল। এই ধর্ম, এই সকল বিধি-ব্যবস্থা যে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই ধর্ম-শাস্ত্র বলে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সমস্তই এই ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল।

রাজাও এই ধর্মশাস্ত্রের অধীন ছিলেন। প্রাচীন ভারতে কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সে সকল বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রই ছিল সাধারণ নিয়ম। রাজা রাজবিধি বা আইন-কানুন প্রণয়ন করিতেন না, তিনি ছিলেন কেবল প্রয়োগ-কর্তা, শাসন-কর্তা (Administrator, Executive officer)। বিধি-বিধান সমস্তই ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল, স-পারিষদ রাজা সেই সকল অনুবর্তন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ভারতীয় রাজতন্ত্র প্রাচীন ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ছিল না। রাজা, রাজ-পরিষৎ, রাজ-কর্মচারী সকলকেই ধর্মের অনুশাসনে চলিতে হইত। রাজধর্মের মুখ্য লক্ষণই ছিল প্রজারঞ্জন। রাজা শব্দের উহাই অর্থ। লোকরঞ্জনে পরাঙ্মুখ হইলে রাজপদের অধিকার ছিল না। ঋষি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে এমন ব্যবস্থাও আছে যে, রাজা অধার্মিক ও প্রজাপীড়ক হইলে প্রজাগণ তাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় হত্যা করিবে (মনু)।

বস্তুত রাজার উপরেও রাজা ছিলেন ধর্ম। ঋষিগণ ছিলেন ধর্মের ব্যবস্থাপক, রাজা ছিলেন ধর্মের রক্ষক। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূলে ছিল দুই শক্তি—রাজা ও ঋষি।

আরও উজ্জ্বলতর চিত্র—এ উভয়ের একত্র সমাবেশ, একাধারে রাজা ও ঋষি—রাজর্ষি।

উপনিষদে, পুরাণেতিহাসে এবং প্রাচীন কাব্যাদিতে আমরা রাজর্ষিগণের পরিচয় পাই। উপনিষৎ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র। ইহার অনেকাংশে ঋষিগণ ও রাজর্ষিগণের মধ্যে

ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। কোথাও ঋষি বক্তা, রাজর্ষি শ্রোতা; কোথাও রাজর্ষি বক্তা, ঋষি শ্রোতা (বৃহঃ, ছান্দ্যোঃ ইত্যাদি)।

বলা বাহুল্য, রাজর্ষিগণ সংসারশ্রম ত্যাগ করিয়া ঋষিত্ব লাভ করেন নাই। ইঁহারা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সোৎসাহে সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালনাদি রাজধর্ম পালন করিতেন। ইঁহারা স্বধর্মনিষ্ঠ নির্লিপ্ত গৃহস্থাশ্রমী, কবি কালিদাসের ভাষায় 'রাজ্যাশ্রমী মুনি'। ঋষিপ্রতিম রাজগণই রাজর্ষি।

প্রাচীন রাজবংশসমূহের ইতিবৃত্ত-বর্ণনা পুরাণশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহাতে বহু খ্যাতনামা রাজর্ষির চরিত-কথা কীর্তিত হইয়াছে। ইঁহারা ছিলেন একাধারে প্রজাপালক, ধর্মরক্ষক ও লোকশিক্ষক।

শ্রীগীতাগ্রন্থে নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনকাদি রাজর্ষিগণের জীবনাদর্শ অনুসরণের উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, গীতোক্ত যোগধর্ম পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণ বিদিত ছিলেন (গীঃ ৪।১)। বস্তুত ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণ অনেকেই রাজর্ষিপদবাচ্য ছিলেন এবং গীতোক্ত নিষ্কাম যোগধর্ম প্রতিপালন করিতেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার অতুলনীয় তুলিকায় আদর্শ নৃপতি দিলীপের যে-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি—

তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূত-সমাধিনা।
তথাহি সর্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ।।
অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।
তস্য ধর্মরেতরাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা।।
জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নু রাদদে সোর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ।।

নিশ্চয়ই বিধাতা পঞ্চ মহাভূতের উপাদানেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেননা যেমন, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি গুণ কেবল পরের প্রয়োজনেই লাগে, সেইরূপ তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি-বিভব-অর্থ-সামর্থ্যাদি সমস্ত গুণ পরার্থেই লাগিত, কিছুই নিজের প্রয়োজনে নয়।

তিনি যুবা হইয়াও বিষয়-মোহে অনাকৃষ্ট, বেদ-বেদাঙ্গাদি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধর্মনিরত ছিলেন—সুতরাং জরা ব্যতীতই বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি ভীত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন, আতুর না হইয়াও ধর্মাচরণ করিতেন, লুব্ধ না হইয়া অর্থগ্রহণ করিতেন এবং আসক্ত না হইয়া বিষয় ভোগ করিতেন।

বিষয়ভোগে অনাসক্ত অথচ বাহ্যত রাজ্যভোগে লিপ্ত, বিষয়-মোহে অনাকৃষ্ট অথচ প্রজাপালন-রূপ বিষয়কর্মে সোৎসাহে ব্যাপৃত। কেন? কারণ, তাঁহার সমস্ত কর্মই পরার্থে, 'লোক-সংগ্রহার্থে'—'পরার্থৈকফলাগুণাঃ'। ইহাই গীতোক্ত ধর্ম। বস্তুত রাজর্ষিগণ ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতীক। তাঁহাদের জীবনে জ্ঞানের সহিত কর্মের, ত্যাগের সহিত ভোগের, আধ্যাত্মিকতার সহিত বৈষয়িক কর্তব্যনিষ্ঠার সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল।

কালে কালে কর্ম ও জ্ঞানের, ধর্ম ও মোক্ষের এই সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতেই কর্ম ও জ্ঞানের মোক্ষানুকূলতা বিষয়ে দুইটি বিরোধী মত প্রচলিত ছিল। এক পক্ষ বলিতেন, কর্ম সংসার-বন্ধনের কারণ, উহাদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, কর্মত্যাগই মোক্ষের একমাত্র পথ। ইহাকে বলে নিবৃত্তি মার্গ বা সন্ন্যাস মার্গ। অপরপক্ষ বলিতেন, কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, আসক্তিই বন্ধনের কারণ। ফলাশা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না। ইহাই কর্মযোগ মার্গ।

গীতাগ্রন্থে এই উভয় মার্গই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কর্মযোগ-মার্গই বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োশ্চ কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।

—সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। তাই গীতার উপদেশ—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি।।

(১) কর্মে তোমার অধিকার, (২) ফলে নয়, তোমার যথাধিকার কর্ম করিতে হইবে, (৩) কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইও না, (৪) আর ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

'তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার।'

—সেই হেতু অনাসক্তভাবে সতত কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন কর।

এই উচ্চ কর্মাদর্শ পরবর্তী কালে ভারত বিস্মৃত হইয়াছিল, স্বধর্ম ভুলিয়াছিল। 'মোক্ষ', 'মোক্ষ' করিয়া লক্ষ লক্ষ অনধিকারী লোক কর্মত্যাগে উন্মুখ হইয়াছিল। কয়েক শতক ব্যাপিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল দুঃখমূল সংসারের অসারতা,

কর্মফলের অখণ্ডনীয়তা, কর্মের বন্ধকত্ব, এবং সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু সন্ন্যাস তো কেবল দণ্ড-কমণ্ডলু-গৈরিকবসন নয়। আর প্রকৃত মুমুক্ষত্বও অতি দুর্লভ বস্তু।

ফলে, জীবন-সংগ্রামে অক্ষম, কর্মক্ষম অথচ কর্ম-বিমুখ অলস অদৃষ্টবাদীর সৃষ্টি, দলে দলে অনধিকারীর সন্ন্যাস গ্রহণ, ধর্মধ্বজী ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি। সামাজিক কাঠামোও পূর্ব হইতেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। প্রাচীন গুণগত বর্ণ-ভেদ বংশগত জাতিভেদে পরিণত হইয়া পড়িল, জাতির সংখ্যাও অসংখ্য হইয়া উঠিল। বর্ণভেদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি লোপ পাইল, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও কিছু রহিল না। উহা অর্থহীন আচারমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া সমাজে ভেদ-বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সমাজের সংহতি-শক্তি লোপ পাইল, প্রাণ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িল, সত্বগুণাশ্রিত অতি অল্পসংখ্যক লোক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞান-ভক্তির চর্চায় নিযুক্ত রহিলেন। তমোগুণাক্রান্ত নিদ্রাভিভূত জনসাধারণ বহিঃশত্রুর আক্রমণে চমকিত হইয়া 'কপালং মূলং' বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিল।

সকল জাতির ইতিহাসেই উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন ও পুনরুত্থানের যুগ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই শেষ যুগের দুঃখবাদাত্মক সন্ন্যাসমূলক ধর্ম-দর্শনের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের অবনতির কারণ। উহার পশ্চাতে যে গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে উহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। পরাধীন জাতির গৌরবের কথা কে বলিতে যায়?

আধুনিক যুগে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির স্বরূপ স্বীয় কর্মে, বাক্যে, সাধনায় প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া একদিকে অধ্যাত্মজ্ঞান এবং অপরদিকে কর্ম-মাহাত্ম্য প্রচার দ্বারা তমোভিভূত, আত্মবিস্মৃত মৃতপ্রায় জাতিকে উজ্জীবিত করিতেছিলেন। উহা হইতেই ভারতের নবজাগরণের সূচনা। পরে আসিল মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ইহাও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি-ক্ষেত্রে অকুণ্ঠভাবে সত্য ও অহিংসনীতির প্রবর্তন জগতে এই প্রথম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ

যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ং পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তে-জময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদং অমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।

—বৃহঃ, ২।৫।১

—এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি অধ্যাত্ম, শরীরাবস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সর্ব।

আধ্যাত্মিকতা বলিতে অনেকে অনেক-কিছুই বুঝেন। ঈশ্বরস্বরূপ এবং ঈশ্বরের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ কি তদ্বিষয়ে ভারতীয় ঋষি-শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত এবং তদনুযায়ী যে ধর্ম-নির্দেশ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং উহাকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বলা হইয়াছে। আত্মা শব্দ হইতে আধ্যাত্মিকতা শব্দ আসিয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ, আত্মানুসন্ধান আত্ম-জ্ঞান, আত্মোপলব্ধি। এক তত্ত্বই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, এই তিন নামে অভিহিত হন।

এই আত্মা সর্বাত্মা, বিশ্বাত্মা। ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ লৌকিক ধারণা এই যে, তিনি জীবজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, তিনি স্বর্গে থাকেন, পার্থিব রাজার ন্যায় জগৎ পালন করেন, শাসন করেন, পাপ-পুণ্যের বিচার করেন, দণ্ড-পুরস্কার দেন ইত্যাদি। ঋষি-শাস্ত্রের ঈশ্বর ঠিক সেরূপ নন। তিনি জগন্ময়, জগদাত্মা, সর্বভূতের অন্তরাত্মা।

এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? জগন্নাথ জগন্ময় হইলেন কীরূপে? ইহা বুঝিতে হইলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে আদি ব্রহ্মসঙ্কল্প।

তিনি কামনা করিলেন, আমি এক আছি, বহু হইব।

সোঽকামযত— বহুস্যাম্। তৈত্তিঃ ২।৬।৭

তখন তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন।

তমাত্মানং স্বয়মকুরুত।

তিনিই সমস্ত হইলেন।
স সর্বমভবৎ।

তিনি এইরূপ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে প্রবেশ করিলেন।
তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ।
সে কীরূপ?

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।
এতস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।।

—একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপানুযায়ী বহুরূপ হইয়াছে, সেইরূপ ভূতমাত্রেরই অন্তরস্থ একই আত্মা উপাধিঅনুযায়ী বহুরূপ হইয়াছেন।

আর একটু সূক্ষ্ম কথা আছে, 'বহিশ্চ' অথচ তিনি সর্বাতীত রূপেও বর্তমান আছেন। তিনি বিশ্বানুগ (Emmanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendant) প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত।

তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলিলে তাঁহার স্বগুণ স্বরূপেরই নির্দেশ করা হয়; তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ অমেয়, অচিন্ত্য, মনোবাক্যের অতীত। তাঁহার সগুণ, নির্গুণ উভয়বিধ স্বরূপই এক সঙ্গে বর্ণিত হইল। সগুণ নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নয়। নির্গুণ ব্রহ্মই লীলাবশে ক্রিয়াযুক্ত হন—

লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ। —ভাঃ

এই লীলা সৃষ্টি-লীলা, জগৎলীলা।

এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বাইবেল আদি গ্রন্থে যেরূপ সৃষ্টি-বিবরণ (creation, something out of nothing) আছে, ইহা তাহা নয়। দর্শনশাস্ত্রের একটি কথা আছে, যাহা নাই তাহা হয় না, যাহা আছে তাহারও বিনাশ হয় না, পরিবর্তন হয় মাত্র (নাসৎ উৎপদ্যতে, ন সৎ বিনশ্যতি— সাঃ সৃঃ)। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, তিনিই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিলেন। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই। ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত কথা।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় এই তত্ত্ব বুদ্ধি-বিচার (intellect) দ্বারা নিরূপিত হয় নাই, বোধি (intuition) দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়াছে। ঋষিগণ সত্যদ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁহারা সত্যকে দর্শনের দ্বারা লাভ করিয়াছেন। উপনিষদের ভাষা 'যৎ পশ্যসি তদ্‌বদ'—আপনি যাহা দর্শন করেন তাহাই বলুন। উত্তর—'বেদাহং',

'পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ'—আমি জানিয়াছি, সুধীগণ দর্শন করেন ইত্যাদি। ঋষি যেন ইঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিতেছেন—

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।

—জানিয়াছি আমি ইঁহাকে, ইনি অজর, পুরাতন, সর্বাত্মা, বিভুরূপে সর্বত্র বিদ্যমান।

ঋষি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন আর বলিতেছেন—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

—এই পুরোভাগে অবস্থিত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ও উত্তরে ব্রহ্ম, ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত, এই বিশ্ব বরিষ্ঠ ব্রহ্মই।

এই ব্রহ্মানুভূতি কীরূপ?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—

যাহা আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশমান।

এই আনন্দস্বরূপ এই অমৃতরূপটি আধুনিক ভারতের ঋষি-কবির অনুপম ভাষায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত, পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ

ইহাই বিশ্ব-সত্তার, বিশ্বে ভগবৎ-সত্তার মধুর পরশ।

ভারতের ঋষিগণ সাধনবলে এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, একত্বের মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বহু-বিভক্ত জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তারস্বরে প্রচার করিয়াছেন, এখানে বহু নাই, নানাত্ব নাই—'নেহ নানাস্তি

কিঞ্চন', সমস্তই এক এবং সমস্তই ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ওঁ, ওঁ, ওঁ (ব্রহ্মবাচক একাক্ষর)।

মানবের একত্ব, মহামানবতা, বলিয়া যদি কোনও বস্তু থাকে তবে তাহা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যেই আছে এবং একমাত্র ভারতের বেদান্তই উহা জগৎকে শিক্ষা দিতে পারে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কার ধ্বনি,
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া—
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আছে দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।

—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা—বিশ্বমানবধর্ম

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ।
ভাঃ ১১, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য।

সর্বভূতে আমিই আছি, চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে—এই সত্যের অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই আমার মত।

অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবানের অস্তিত্ব চিন্তা এবং কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

পূর্ব অধ্যায়ে যে বিশ্বাত্ম-দর্শনের আলোচনা হইয়াছে, সহজ কথায় তাহার মর্ম এই যে, ঈশ্বর কেবল বিশ্বেশ্বর নন, তিনি বিশ্বাত্মা, সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সুতরাং আধ্যাত্মিকতার অর্থ, বিশ্বের সহিত অর্থাৎ সর্বভূতের সহিত একাত্মতাবোধ। বিশ্বপ্রেম বলিয়া যদি কোনও বস্তু থাকে, তবে তাহার মূলে এই তত্ত্বই নিহিত। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণে সর্বভূতে মৈত্রী ও প্রীতি এবং সর্বভূতের হিতসাধনই হয় শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভারতীয় ঋষিশাস্ত্র এই ধর্মই শিক্ষা দেন।

'সর্বভূত' বলিতে বুঝায়, যাহা কিছু (সৃষ্ট) হইয়াছে। একব্রহ্ম (Being) জগতের কারণ এবং কার্যভূত সর্বভূত (all Becomings)। অবশ্য, প্রীতি-মৈত্রী সম্পর্কে উল্লিখিত হইলে এই শব্দে বিশ্বমানবই (Humanity) বুঝায়।

জগতের অনেক ধর্মশাস্ত্রই, অনেক নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা দেয়, আপনাকে যেমন পরকেও তেমনি ভালবাসিবে। কিন্তু ভালবাসা তো আদেশ-উপদেশে জন্মে না। 'আমার সুখদুঃখ লইয়া আমি আছি, অন্যের সুখদুঃখে আমার কি? কেন আমি অপরকে নিজের ন্যায় ভালবাসিব?' এই নীতির ভিত্তি কী? এ প্রশ্নের উত্তর কী?

ঐ সকল শাস্ত্রে ইহার কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন আর্যঋষি—

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।—বৃহঃ ৪।৫।৬

লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশত লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশত সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতই সর্বভূত প্রিয় হয়।

তুমি অপরকে তোমার শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন? কারণ, তুমি তোমার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে ভালবাস বলিয়া। তুমিই সেই—'তত্ত্বমসি'। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত এই অভেদতত্ত্ব বুঝা যায় না, ভেদজ্ঞান আসে। তাই ঋষি পরেই বলিতেছেন—

সুতরাং আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও ধ্যেয় বস্তু। আত্মজ্ঞান হইলেই এ সমস্তই যে এক বস্তু তাহা জানা যায়।

'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, আত্মানো বা অরে বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্।'

এই বেদান্ততত্ত্বই বিশ্বপ্রীতির মূল ভিত্তি। ইহা কেবল হিন্দুর ধর্ম নহে, উহা বিশ্বমানবের ধর্ম, সনাতন বিশ্বধর্ম।

বেদান্ত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণও ঠিক এইরূপ কথাই বলেন—

The highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality—'Love your neighbour as yourself'. But why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour? The answer is not in the Bible, but it is in the Vedas—in the great formula—'That thou art' (তৎ-ত্বম্-অসি) which gives in three words metaphysics and morals together." —Dr. Duessen.

বিখ্যাত জর্মন দার্শনিক শোপেনহয়ার লিখিয়াছেন—

'The study of the Upanishads has been the solace of my life, it will be the solace of my death. In the whole world there is no

study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It is destined sooner or later to become the faith of the people'.

–Schopenhauer

—উপনিষৎ পাঠই আমার জীবনে শান্তি দিয়াছে, উহা আমার মরণেও শান্তি দিবে। সমস্ত জগতে মানবাত্মার হিতকর ও উন্নতিকর এমন আর কিছু নাই। আগে হউক পরে হউক, উহাই মানবসমাজের ধর্ম হইবে।

প্রখ্যাত প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ্ মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন—'I share his (Schopenhauer's) enthusiasm for the Vedanta and feel indebted to it for much that has been helpful to me in my passage through life.....I spend my happiest hours in reading Vedantic books. They are to me like the light of the morning, like the pure air of the mountain—so simple, so true, if once understood. The Vedanta philosophy is a system in which human speculation seems of me to have reached its very acme'.

—শোপেনহয়ার যেরূপ উৎসাহী বেদান্ত-ভক্ত আমিও তদ্রূপ্। আমার জীবনপথের পাথেয়স্বরূপ অনেক কিছুর জন্যই আমি বেদান্তের নিকট ঋণী। যখন বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করি তখন মনে করি, জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখময় সময় যাপন করিলাম। বেদান্ত আমার নিকট প্রভাতের আলো, পর্বতের বিশুদ্ধ বায়ু, এমন সরল, এমন সত্য, যদি একবার অর্থবোধ হয়। আমার বোধ হয়, বেদান্ত দর্শনেই মানবীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা চরমে উঠিয়াছে—ইহার ঊর্ধ্বে আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব (Fatherhood of God and brotherhood of man), এই নীতি-তত্ত্ব সকল ধর্মেই শিক্ষা দেয় এবং ইহা সহজবোধ্য। হিন্দুশাস্ত্রেও ঐ কথা আছে—'ভ্রাতরো মনুজাঃ সর্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।' কিন্তু এক-পিতৃকতা অপেক্ষা এক-আত্মিকতার তত্ত্ব অধিকতর মূলস্পর্শী। এক পিতার পুত্রেরাও তো পরস্পর হিংসাদ্বেষ করে। ঋষিশাস্ত্র বলেন, এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে ভালবাসে তাহার মূল কারণ একাত্মতা। অজ্ঞানতাবশত এই অভেদজ্ঞান রুদ্ধ থাকে এবং লোকে পরস্পর হিংসাদ্বেষ করে। যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় সর্বভূতের অন্তরাত্মা ভগবানে যাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহার আপন-পর, শত্রু-মিত্র ভেদবুদ্ধি দূর হইয়াছে, সর্বভূতে প্রীতি জন্মিয়াছে। ভগবদ্ভক্তি ও ভূতপ্রীতি অভিন্ন।

প্রহ্লাদকে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, শত্রু ও মিত্রের প্রতি রাজা কীরূপ ব্যবহার করিবেন, বল তো? প্রহ্লাদ বলিলেন, পিতঃ, রাগ করিবেন না ('মা ক্রুধ')। আমি তো সেরূপ শত্রু-মিত্র দেখি না। যখন জগন্ময়, জগন্নাথ, পরমাত্মা গোবিন্দ সর্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু-মিত্র কথা কোথা হইতে হইবে, কাহাকেও শত্রু মনে করিব কীরূপে?

—সর্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ।। —বিঃ পুঃ

ইহাই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের, প্রীতি-তত্ত্বের, নীতি-তত্ত্বের ও ভক্তি-তত্ত্বের মূল কথা। —সর্বভূতে বিশ্বাত্মার অনুভূতি, সর্বভূতে প্রীতি এবং সর্বভূতের হিতসাধন। ইহা মানবমাত্রেরই ধর্ম, বিশ্বমানব ধর্ম।

ইহাই শ্রীগীতাগ্রন্থেরও সারকথা।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।

গীঃ ৬।৩০, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য

—যে যোগী একত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ সর্বভূতে আমিই আছি এইরূপ একত্ববুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ সর্বভূতে নারায়ণ আছেন ইহা জানিয়া নারায়ণজ্ঞানে সর্বভূতে প্রীতি করেন, সর্বভূতের সেবা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন আমাতেই অবস্থান করেন।

Whoever loves God in all and whose soul is founded upon divine oneness, however he lives and acts, lives and acts in God– that may almost be said to sum up the whole final result of the Gita's teachings. –Sri Aurobindo

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা ঠিক এক কথা নয়। আধ্যাত্মিকতা অর্থ আত্মানুসন্ধান, আত্মোপলব্ধি। আত্মাই ঈশ্বর। সেই আত্মদেবের অস্তিত্বে স্থির বিশ্বাস, তাঁহাতে প্রগাঢ় ভক্তি, তাঁহাকে পাইবার জন্য আকুলতা, তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনে আগ্রহ, এই সকলই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। এই অর্থে ধর্ম শব্দ আধ্যাত্মিকতার সহিত একার্থক। সুতরাং সকল মানবের ধর্ম একই যাহার নাম আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু জগতে নানা ধর্ম (religion) প্রচলিত আছে দেখা যায়। এ স্থলে ধর্ম অর্থ সাম্প্রদায়িক ধর্মমত। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে, উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে, ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর-

প্রেরিত মহাপুরুষগণের আদেশ-উপদেশের পার্থক্য হেতু বিভিন্ন ধর্মমতের (creed, cult) উদ্ভব হয় এবং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ও যাজকমণ্ডলীর (sect, church) সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর এক হইলেও, সর্বেশ্বর হইলেও সংস্কারান্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়া পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ করে। এ দৃশ্য দেখিয়া সর্বেশ্বর হাসেন না কাঁদেন তাহা বলা যায় না।

এইরূপে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম পরিণত হয় ধর্মান্ধতায়। উহা অনেক সময় সংস্কারান্ধ যাজকসম্প্রদায় ও স্বার্থান্বেষী রাজশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া জগতে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে। স্থানে স্থানে 'ধর্মরাজ্য' স্থাপিত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের ধর্মযুদ্ধসমূহের এবং ইনকুইজিশন্ (Inquisition) প্রভৃতি নিদারুণ নিষ্ঠুর প্রতিষ্ঠানাদির কথা কে না জানে! এ সকলকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের সুসভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশেই স্বচক্ষে দেখিলাম। উন্মত্ত জনতা বিধর্মী বলিয়াই শতসহস্র নরনারী, বালক, শিশুদিগকে পর্যন্ত হত্যা করিল। লক্ষ লক্ষ লোক নানারূপে নির্যাতিত ও হৃতসর্বস্ব হইয়া দেশান্তরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল।

ধর্মের নামে জগতে মানুষ মানুষের উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া 'ধর্মরাজ্য' নাম শুনিলেই লোকে শিহরিয়া উঠে।

প্রকৃত ধর্মরাজ্য অর্থ বাইবেলের ভাষায় ঈশ্বরের রাজ্য (Kingdom of God on earth)। ভারতীয় ঐতিহ্যে এরূপ কথা 'রামরাজ্য' যাহা মহাত্মাজী সর্বদা বলিতেন; 'রামই ঈশ্বর'। এরূপ রাজ্য যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী তাঁহারা জগতের নমস্য। অনুরূপ কথা, তথাগত বুদ্ধের 'ধর্মচক্র প্রবর্তন', যে প্রতীক স্বাধীন ভারত গ্রহণ করিয়াছে।

বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা ও ভেদ-বিদ্বেষ এখনও অতি প্রবল। বিশ্বমানবধর্ম বলিয়া কোনও বস্তু আছে এ কথা বলিলে কে শুনিবে? তথাপি বলিব, উহা আছে। এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, বিভিন্ন ধর্মের সার-সঙ্কলন করিয়া বুদ্ধির কসরতে এমন একটি ধর্মমত উদ্ভাবন করা, যাহা সকলেই গ্রহণ করিবে, যাহা সার্বজনীন ধর্ম হইবে। তাহা সম্ভবপর নয়। সেরূপ চেষ্টা কয়েকবার হইয়াছে, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

বিশ্বমানব ধর্মের মূল কথাটা হইতেছে, বিশ্বাত্মার অনুভূতি, বিশ্বজীবনের অনুভূতি, এই অনুভূতির যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে এক অদ্বয় বস্তু আছেন, এক পরম পুরুষ আছেন, যাঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—God, Spirit, Divinity যাহাই বল না

কেন—যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা 'ভূতেষু ভূতেষু গূঢ়'—যাঁহার সংযোগে আমরা সকলেই এক—

"বিশ্বসাথে যোগে যথায় বিহার
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" —রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বাত্মার পরশে বিশ্বমানবের এই একাত্মতার অনুভবই বিশ্বপ্রেমধর্ম। এই অনুভব যত সুদৃঢ় হইবে ততই ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইবে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে প্রীতি-মৈত্রী বর্ধিত হইবে, বিশ্বময় অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে, জগতে সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা হইবে।

ইহাকেই ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক ধর্ম (spiritual religion of humanity) বলিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

"A spiritual religion of humanity is the hope of the future. By this we do not mean what is ordinarily called a universal religion, a thing of creed and intellectual belief. Mankind has tried unity by that means; it has failed and deserved to fail because there can be no universal religious system. The inner spirit is indeed one, but more than any other the spiritual life insists on freedom and variation in its self-expression and means of development. What it meant is the growing realisation that there is a secret spirit, divine reality in which we are all one and of which humanity is the highest vehicle on earth and that the human race and the human being are the means by which it will progressively reveal itself here with a growing attempt to live out this knowledge and bring about a kingdom of the divine spirit upon earth. It means that oneness with fellowmen will become the leading principle of our life, not merely a principle of co-operation, but a deeper brotherhood, a real and an inner sense of unity and equality: the realization by the individual that only in the life of his fellowmen is his own life complete, the realisation by the race that only on the free and the full life of the individual can its own perfection and permanent happiness be founded; a way of salvation in accordance with this religion that is to say, a means by which this can be developed by each man within himself so that it may be developed in the life of the race."

প্রশ্ন হইতে পারে, এই অধ্যাত্মজ্ঞান, এই একাত্মতাবোধ ত সহজ কথা নয়। ইহাতে চাই মানুষের নিম্নপ্রকৃতির সম্পূর্ণ সংশোধন দিব্য প্রকৃতিলাভ। ইহা কখনও মানবমাত্রেরই ধর্ম হইবে তাহা কি কল্পনা করা যায়। এ কথা ঠিক, কিন্তু জগতে অল্পসংখ্যক ঈদৃশ সিদ্ধ মহাপুরুষের উদ্ভব হইলেও তাঁহাদের প্রভাবে জনসমাজ পবিত্র হইতে পারে। সতত এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন পরিচালনা করিলে তাহা নিষ্ফল হয় না; কারণ ভিতরে ভগবৎ-প্রেরণা, বিশ্বাত্মার প্রেরণা রহিয়াছে। এই ধর্মের অল্পমাত্র আচরণও মানবসমাজকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে ('স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ')। ক্রমে ক্রমে চিত্ত নিষ্কলুষ হয়, স্বার্থপরতার স্থলে পরার্থপরতার ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, হৃদয় প্রসারিত হয়, মানুষে মানুষে প্রীতি-মৈত্রীর উদ্রেক হয়।

সমগ্র ঋষিশাস্ত্রেরই এই লক্ষ্য। বিবিধ ধর্মশাস্ত্রে এমন সকল অনুশাসন রহিয়াছে যাহা পালন করিলে মানব নিম্নপ্রকৃতির কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার যোগ্য হইতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে সে সকল বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ঋষিশাস্ত্রে—সর্বভূতহিত, বিশ্বপ্রেম

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কায়েন মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাঞ্জলে।।

—মভা শান্তি ২৬২

যিনি কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সকলের হিতে রত থাকেন, যিনি সকলের নিত্যসুহৃদ্, হে জাজলে, তিনিই ধর্ম জানেন।

ঈশ্বর, জীব, জগৎ সম্বন্ধে বেদান্ত শাস্ত্রের যে উপপত্তি তাহা পূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, উহাই বিশ্বপ্রেমধর্মের মূল উৎস। এই বিষয়টি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রসমূহের সাহায্যে এক্ষণে আলোচনা করিব।

হিন্দুশাস্ত্র তো শাস্ত্রসমুদ্র। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ঋজু কুটিল বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যামৃত উদ্ধার করা সহজসাধ্য নহে। এই হেতুই হিন্দুধর্ম যাহাকে বলা হয়, সেই বস্তুটির কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই সুপ্রাচীন ধর্মের ইতিহাস স্থূলভাবে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়—কর্মপ্রধান বৈদিক যুগ, জ্ঞানপ্রধান ঔপনিষদিক ও দার্শনিক যুগ, ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক যুগ।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও তদনুসরণে রচিত সূত্রগ্রন্থাদি এবং মন্বাদি ধর্মসংহিতা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডাত্মক শব্দ। বেদের উপনিষৎ ভাগ ও বেদান্ত দর্শনাদি জ্ঞানমূলক শাস্ত্র। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণাদি ভক্তিমূলক শাস্ত্র। মহাভারতে এবং তদন্তর্গত গীতাগ্রন্থে ত্রিবিধ মার্গেরই আলোচনা আছে।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখিব, এই সকল বিভিন্ন শাস্ত্রে সাধনাদি বিষয়ে ভেদবিরোধ থাকিলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট বিষয় প্রায় একই—

দর্শন বা তত্ত্বোপদেশ—বিশ্বাত্মবোধ।

আচরণ বা ধর্মোপদেশ---সর্বভূতহিত, বিশ্বপ্রেম।

বৈদিক কর্মকাণ্ডে— বিশ্বাত্মবোধ, সর্বভূতহিত

যিনি বিশ্বাত্মা, তিনিই বিশ্বরূপ, বিশ্বই তাঁহার দেহ—'ইদং বিশ্বং শরীরং তে।' বিশ্ব বলিতে কেবল পৃথিবী বুঝায় না, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে গ্রহরাজি ঘুরিতেছে সেই সকল লইয়া বিশ্ব, বিজ্ঞানের সৌরজগৎ (Solar System), শাস্ত্রীয় ভাষায় ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব অসংখ্য, ধূলিকণারও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু বিশ্বের সংখ্যা করা যায় না—'সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি ন বিশ্বানাং কদাচন।'

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড, এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা এক ব্রহ্মা। পুরাণের আখ্যানে আছে, ব্রহ্মা একদিন শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আসিলে দ্বারী যাইয়া সংবাদ দিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কোন্ ব্রহ্মা? তারপর শ্রীকৃষ্ণদেহে ব্রহ্মার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন, স্তবস্তুতি ইত্যাদি।

যাহা হউক, আমাদের এ আলোচনার পক্ষে এক ব্রহ্মাণ্ডই যথেষ্ট। বিশ্ব বলিতে বুঝায় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ, এই ত্রিলোক—ভূর্ভুবঃ স্বঃ। যিনি ত্রিপাদে এ ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন তিনি ত্রিবিক্রম বিষ্ণু (ব্রহ্ম)।

—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিধদে পদম্—ঋক্, বিষ্ণুসূক্ত।

যে বেদ-মন্ত্রটি দ্বিজগণের ইষ্টসাধনার প্রধান সহায়, যে মন্ত্রটি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা জপ করিয়া বেদপন্থী হিন্দুগণ ঈশ্বরোপাসনা করেন, সেই মন্ত্রটির প্রথমেই যুক্ত করা হইয়াছে এই তিনটি শব্দ—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। জপমন্ত্রটি এই—

ওঁ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

সমগ্র মন্ত্রটির বিভিন্ন অংশের বিবৃতি এইরূপ—

ওঁ—ব্রহ্মবীজ, ব্রহ্মবাচক একাক্ষর, পরমাত্মা।

তাঁহার স্বরূপ কী, জীব, জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কী, কী ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিব, চিন্তা করিব?—

ভূর্ভুবঃ স্বঃ—তিনি এই ত্রিলোকে ব্যাপিয়া আছেন, জীব-জগৎ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সর্বভূতে অনুস্যূত আছেন। সুতরাং—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে সেই সর্বান্তর্যামী দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি।

সেই শক্তির পরিচয় পাই কোথায়?—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের (কামনা, বাসনা, সঙ্কল্প, বিচারবুদ্ধি, কর্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির) প্রেরণা দিতেছেন।

সেই অলঙ্ঘ্য প্রেরণা বলেই জগতের কর্মপ্রবাহ, এই বিচিত্র বিশ্বলীলা পরিচালিত হইতেছে, ইহা অনুভব করিয়া সেই লীলাময়ের সর্বান্তর্যামী স্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান করি।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটিকে বলে ব্যাহৃতি, ব্রহ্মশরীর। আরও চারিটি ঊর্ধ্বলোক—মহঃ জনঃ; তপঃ সত্য—উপলক্ষণে এই তিনটির দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই তত্ত্বটিই ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তে বিস্তার করা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই সেই বিরাট পুরুষ যাহা অতীতে ছিল, যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও তিনিই।—

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যম্—ঋক্ ১০।৯০

এই ত্রিলোক—চন্দ্রসূর্যগ্রহ-নক্ষত্র দেব-নর পশু-পক্ষী, তরুলতা—এই সমস্ত লইয়া বিরাট পুরুষের দেহ। এ সকল একাঙ্গীভূত এবং পরস্পর-নির্ভরশীল। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহায়তায় যেমন দেহ-যন্ত্র চলে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহায়তায় যেমন সমাজ-যন্ত্র চলে, সেইরূপ এই বিশ্ব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সহায়তায় এই বিশ্ব-যন্ত্র চলে। পরস্পর নির্ভরশীল অঙ্গসমূহ লইয়া এই বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড জীবন্ত সত্তা। মহাভারতের এই কথাই ইংরেজি ভাষায় এইরূপে অনূদিত হইয়াছে—The whole world is an interdependent organism. সুতরাং প্রত্যেক মানবের কর্তব্য হইতেছে, এই জগৎ-সৃষ্টি রক্ষার্থ, সর্বভূতহিতার্থ কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করা। ঋষিশাস্ত্রে এই ত্যাগমূলক কর্মের সাধারণ নাম **যজ্ঞ**।

মহাভারতে ও শ্রীগীতায় এবং মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে যে, প্রজাপতি জগৎ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের কর্ম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (মভা শাং ৩৪০, ৩৩৬, ৩৭৭; গীঃ ৩।১০; মনু ১।৮৭, ১১।২৩৬ দ্রঃ)। এ সকল কথার মর্ম এই যে, যজ্ঞ-তত্ত্ব অর্থাৎ পরস্পর আদান-প্রদান ও ত্যাগের ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডেরবিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যজ্ঞদ্বারাই এই জগতের ভরণ-পোষণ-সংরক্ষণ চলিতেছে: তাই মহাভারত বলিতেছেন—

যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ, জগতের পশ্চাতে যজ্ঞ—'অনুযজ্ঞং জগৎ সর্বং যজ্ঞশ্চানুজগৎ সদা।' মভা, শাং (২৬৭, ৩৪)

শ্রীগীতায়ও অনুরূপ কথা আছে। ব্রহ্ম সর্বভূতময়, সর্বভূতহিতকর কর্মমাত্রই যজ্ঞ। সুতরাং সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত (গীঃ ৩।১৫)।

শাস্ত্রে দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্যদানাদির বিবিধ ব্যবস্থা আছে। উহার উদ্দেশ্য নিজের যাহা প্রিয় বস্তু তাহা দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। ত্যাগমন্ত্র এইরূপ—'ইদং অগ্নয়ে'—

ন 'মম', 'ইদং' সোমায়—ন 'মম'। যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু, তাহা দেবতার জন্য, অপরের জন্য, আমার নয়। উহা দেবাদিকে অর্পণ না করিয়া নিজের ভোগ করা পাপ।

দেবতা কী—ঋষিগণ এই বিশ্বপ্রকৃতিকে কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখেন না। তাঁহাদের সৃষ্টি ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক।

ক্ষিত্যাদি স্থূল পঞ্চভূতের উপাদানে এই জগৎ-সৃষ্টি। জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সকলই পঞ্চভূতে গঠিত যাহাকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলে জড়পদার্থ। ইহাই আধিভৌতিক দৃষ্টি।

কিন্তু ঋষিদৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে এক অখণ্ড চৈতন্যময় মহাসত্তা অনুস্যূত আছেন, সেই পরম পুরুষই আপনাকে এই বহুবিচিত্র বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়া এই বিশ্বলীলা করিতেছেন। ইহাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি।

সেই পরম পুরুষেরই শক্ত্যংশস্বরূপ দেবগণ তাঁহারই নির্দেশে অগ্নি, বায়ু, বরুণাদি নামে এই বিশ্বলীলা পরিচালনা করিতেছেন। ইহাই আধিদৈবিক দৃষ্টি। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা চক্ষু দিয়া দেখি, এই ব্যাপারে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তিনটি শক্তি দেখেন।—

১। চক্ষুরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়, উহা জড়পদার্থ, যন্ত্রমাত্র (আধিভৌতিক)।

২। কাঁহার ইচ্ছায়, কাঁহার শক্তিতে এই যন্ত্র চালিত হয় (কেনেষিতং—কেন উ, ১।১)? যিনি চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ (চক্ষুসশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং—কেন উ, ১।১।) (আধ্যাত্মিক)।

৩। কোন্ দেবতার পরিচালনায় এই চক্ষুরিন্দ্রিয় কার্য করে? —চক্ষুর দেবতা সূর্য। (আধিদৈবিক)।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।

দেবগণ ঈশ্বর নন, তাঁহারা ঈশ্বর-সৃষ্ট, সুতরাং মনুষ্যাদির ন্যায় সর্বভূতের অন্তর্গত। তাঁহারা ঈশ্বর-নির্দেশে সতত সর্বপ্রকারে জীবের ভরণ-পোষণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন। সুতরাং মনুষ্যের কর্তব্য, অন্নাদিদ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করা। কিন্তু যজ্ঞ কেবল দেবোদ্দেশ্যে নয়, সর্বভূতের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য। মনুষ্যের সমগ্র কর্ম-জীবনই একটা যজ্ঞ-স্বরূপ। এ কথা উপনিষদে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—'পুরুষো বাব যজ্ঞঃ'। —ছান্দোঃ

শাস্ত্রে হিন্দুর নিত্যকর্তব্য পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান আছে।—

১। অধ্যয়ন ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি—ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ।

২। তর্পণাদি—পিতৃযজ্ঞ। ৩। হোমাদি—দৈবযজ্ঞ।

৪। অনাথ অতিথি প্রভৃতিকে অন্নদান—নৃযজ্ঞ।

৫। পশুপক্ষ্যাদি ইতর জন্তুকে অন্নদান—ভূতযজ্ঞ।

প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রত্যহ এই মহাযজ্ঞ কয়েকটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন।

এই জগদ্ব্যবহারে প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি নানারূপ কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যকে শাস্ত্রে ঋণ বলে। এই সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, শাস্ত্রীয় ভাষায় 'আনৃণ্য লাভ' করিতে হয়।

জীবন ধারণার্থ প্রতিদিন সকলেরই অন্নগ্রহণ করিতে হয়। তখন অন্যের অন্নের চিন্তা কে করে? অন্যের প্রতি কোনও কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে, ইহাই বা কে ভাবে? কিন্তু সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র সমস্বরে বলিতেছেন—তুমি যদি অপরকে অন্ন প্রদান না করিয়া নিজে অন্ন গ্রহণ কর, তবে তুমি গ্রাসে গ্রাসে পাপরাশি ভক্ষণ করিবে।—

> কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী। —ঋক্ ১০।১০৭
>
> অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। —মনু ৩।১১৮
>
> ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। —গীতা ৩।১৩

কুটুম্ব, অতিথি প্রভৃতি ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে শাস্ত্রকারগণ তাহার নাম দিয়াছেন 'বিঘস', আর যজ্ঞ হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম 'অমৃত'। প্রতিদিন এই ভুক্তাবশিষ্ট ও যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু দিয়াই গৃহস্থ্যের জীবনরক্ষা করিতে হয়।

> বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনম্।
>
> বিঘসো ভুক্তশেষস্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্। —মনু

শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির ব্যবস্থা আছে। তর্পণ অর্থ যাহাতে অন্যের তৃপ্তি হয় সেই উদ্দেশ্যে জলদান। তর্পণ কেবল পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যেই নয়, সর্বভূতের উদ্দেশ্যেও করিতে হয়। উহাতে এই সকল মন্ত্রপাঠ করিতে হয়।—

> আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
>
> তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহোদয়ঃ।।
>
> আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

—দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, নরগণ—ব্রহ্মা হইতে তৃণশিখা পর্যন্ত সমস্ত জগৎ ('সর্বভূত')—মদ্দত্ত অন্ন-পানীয়দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন।

এই সকল ক্রিয়াকর্মের মর্ম কী? কর্মকাণ্ডাত্মক ধর্মজীবন কি কেবল মন্ত্রপাঠ ও এক অঞ্জলি জল প্রদানেই পর্যবসিত? শাস্ত্রের উদ্দেশ্য উদার, আদর্শ অতি উচ্চ, দৃষ্টি বিশ্বমানবেরও উপরে, বিশ্বাত্মার দিকে। এ সকল বিধি-ব্যবস্থা সেই শাস্ত্রেরই যোগ্য যাহার মূল কথা জগৎ ব্রহ্মময়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এই অধ্যাত্ম সত্যের উপর সমাজ-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই সমগ্র ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

কিন্তু শাস্ত্রবিধির গূঢ়ার্থ আমরা সকলে কি বুঝি? বুঝিয়া কি লোক-ব্যবহারে তদনুরূপ আচরণ করি? জলদান তো প্রতীকমাত্র, উপলক্ষণ মাত্র। মূল কথা হইতেছে সর্বভূতহিতার্থে ত্যাগ। তৃষ্ণার্তকে জল দিবে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিবে, শীতার্তকে বস্ত্র দিবে, সর্বপ্রকারে সর্বজীবের আর্তি নিবারণ করিবে। এই জ্ঞান না থাকিলে এ সকল ক্রিয়া-কলাপ ব্যর্থ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ধর্মকর্ম হইয়া পড়ে ধর্মধ্বজিতা।

'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' (ব্রহ্মা হইতে তৃণশিখা পর্যন্ত সমস্ত জগৎ মদ্দত্ত জলদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন) মন্ত্র পড়িয়া বা যজমানকে পড়াইয়া জলের ছিটা দিয়া আসিয়া আহারে বসিলাম। কিন্তু কী দুর্দৈব। হঠাৎ বিড়ালটি আসিয়া জলপাত্রে মুখ দিয়াছে। অমনি কাষ্ঠপাদুকার নিদারুণ প্রহার। বেচারি সেই প্রহারেই গৃহ ছাড়িল। আমার হিন্দুয়ানির কোনও ক্ষতি হইল না, কিন্তু হিন্দুত্বের শেষ।

মহাভারতে—সর্বভূতহিত, বিশ্বপ্রেম

মহাভারত হিন্দু-শাস্ত্রের বিপুল বিশ্বকোষ। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে এই গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে যাহা আছে অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রে তাহাই আছে, আর ইহাতে যাহা নাই তাহা আর কোথাও নাই।

'যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি তন্নক্বচিৎ।' —মভা, আদি ৬২।৫৩

এই সকল বিভিন্ন শাস্ত্রমত, সাধনপথ ও ধর্ম-তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হইয়াছে, জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম কী? মহাভারত সর্বত্রই এ প্রশ্নের এক উত্তরই দিয়াছেন—যাহা সর্বভূতের হিতকর তাহাই ধর্ম।

সত্য ও অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কারণ উহারা সর্বভূতের হিতকর।

'অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।'

কিন্তু যে স্থলে সত্য ও অহিংসা সর্বভূতের হিতকর হয় না, অনিষ্টকর হয়, সে স্থলে উহারা ধর্ম নয়, অধর্ম।

প্রঃ। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই—'নহি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ' —এ কথা সর্বশাস্ত্রেই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। বস্তুত সত্যের মহিমা হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ

ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই এবং সত্যনিষ্ঠ পুণ্যচরিত মহাপুরুষগণের চরিতাখ্যান ভারতীয় পুরাণেতিহাসে যত আছে তত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই সনাতন সত্য ধর্মও কোনও অবস্থায় অধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, ইহা কি কল্পনা করা যাইতে পারে?

উঃ! পারে। দস্যুতাড়িত কোনও ভীত ব্যক্তি কাহারও দৃষ্টির গোচরে নিভৃতস্থানে আশ্রয় লইল। তাহাকে বধ করিতে উদ্যত পশ্চাদ্ধাবনকারী দস্যুগণ আসিয়া সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, ওই লোকটি কোথায় লুকাইল সত্য কথা বলুন। তিনি কী উত্তর দিবেন? তিনি কি সত্য কথা বলিয়া নির্দোষ লোকের বধের কারণ হইবেন, না মিথ্যা কথা বলিয়া সত্যের অপবাদ করিবেন?

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্ পণ্ডিত গ্রীন সাহেব বলেন, এ স্থলে নীতিশাস্ত্র নিরুত্তর ও নীরব হইয়া যায়। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, এ স্থলে মিথ্যাকথা বলাই কর্তব্য, কেননা এস্থলে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা শ্রেয়স্কর—'বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাৎ বিশিষ্যতে'। তবুও জিহ্বা-দ্বারা মিথ্যা কথা উচ্চারণের দোষক্ষয়ের জন্য অগ্নিতে চরু দিয়া বাগ্দেবীর অর্চনা করিবে (মনু. ৮, ১০৪, যাজ্ঞ. ২, ৮৪)। সত্যের প্রতি কেমন প্রগাঢ় নিষ্ঠা, এ বিধি তাহারই পরিচয়।

এইরূপ ধর্মসঙ্কটস্থলে কি কর্তব্য তদ্বিষয়ে মহাভারতে নানা বিচার-বিতর্ক আছে এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞগণের অভিমত উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের সকলেরই এই মত যে, এরূপস্থলে মিথ্যা কথা বলাই ধর্ম, কেননা যাহা সর্বভূতহিতকর তাহাই ধর্ম, এই কষ্টিপাথরেই সত্যানৃতের পরীক্ষা করিতে হইবে।

নারদ বলিতেছেন—সত্যকথা বলা শ্রেয়স্কর বটে, কিন্তু সত্য না বলিয়াই যাহা সর্বভূতহিতকর তাহাই বলিবে, কারণ যাহা সর্বভূতহিতকর তাহাই সত্য, ইহাই আমার মত।

> সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
> যদ্ভূতহিতমত্যন্তং এতৎ সত্যং মতং মম।। —মভা, শাং ৩২৯, ৯৩

ভীষ্মদেব বলিতেছেন—সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমি একটি দুর্জ্ঞেয় কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থলে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয় সে স্থলে সত্যকথা না বলিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করাই কর্তব্য। যেমন, দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে মৌনাবলম্বন করা উচিত। তাহা অসম্ভব হইলে মিথ্যা কথা বলা উচিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ-নিবারণ এবং ধনপ্রাণ-রক্ষার জন্যই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং যাহাতে সর্বভূতের ধনপ্রাণ রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম, তাহাই সত্য, তাহাই অহিংসা।

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাৎ বিদ্যতে পরং।
যত্তু লোকেষু দুর্জ্ঞানং তৎপ্রবক্ষামি ভারত।।
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।
ধারণার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।

মভা শাং ১০৯

ভীষ্মদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে অনুরূপ উপদেশ দিয়াছেন। (মভা, কর্ণ ৬১)

মহাভারতে অনেক স্থলেই বিবিধ আখ্যান-উপাখ্যান সাহায্যে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। একটি আখ্যান এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

পুরাকালে জাজলি নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ বহু বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে নিরত ছিলেন। তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় দিবারাত্রি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই সময় দুইটি চড়ুই পক্ষী তাহার মস্তকস্থিত জটামধ্যে বাসা নির্মাণ করিয়াছিল এবং তথায় পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। দ্বিজবর ইহা জানিয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পক্ষীগুলি দিবাভাগে আহার অন্বেষণে যাইত এবং সন্ধ্যাগমে আসিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকস্থিত বাসায় আশ্রয় লইত। কালক্রমে শাবকগুলি বড় হইলে পক্ষী দুইটি উহাদিগকে লইয়া উড়িয়া গেল, একমাস অতীত হইলেও আর ফিরিয়া আসিল না। তখন ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, আমি সিদ্ধ হইয়াছি, তাঁহার মনে অভিমানের আবির্ভাব হইল ('সিদ্ধোহস্মীতি মতিং চক্রে ততস্তং মান আবিশৎ')। 'আমিই যথার্থ ধর্মোপার্জন করিয়াছি', এই বলিয়া একদিন তিনি মহা আস্ফালন করিতেছিলেন ('আস্ফোয়ত্তথাকাশে ধর্মঃ প্রাপ্তো ময়েতি বৈ।') এমন সময় এক আকাশ-বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিল, 'হে জাজলে, ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে তুমি মহাত্মা তুলাধারের তুল্যও হইতে পারিবে না। বারাণসীর সেই মহাত্মা ধর্মজ্ঞ তুলাধারও তোমার মত এরূপ গর্বিত বাক্য বলেন না।' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি মহাত্মা তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বারাণসী অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন এক বণিক দোকানে বসিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। তিনি ব্রাহ্মণকে দেখিয়া স্বাগত-সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,

'হে দ্বিজবর, আপনি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ধার্মিক হইয়াছেন বলিয়া গর্ববোধ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম কাহাকে বলে তাহা আপনি কিছুমাত্র জানেন না। ('ন চ ধর্মস্য সংজ্ঞাং ত্বং পুরা বেথ কথঞ্চন')। আপনি আমার কথা শ্রবণ করিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার কী প্রিয়কার্য সাধন করিতে পারি তাহা বলুন ('করবানি প্রিয়ং কিং তে তদ্‌ব্রূহি দ্বিজসত্তম')।

তপস্বী ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলেন তিনি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনরত মহাতপা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা পাইবেন। কিন্তু দেখিলেন এক গৃহস্থ ব্যবসায়ী। তাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--'হে বণিকপুত্র, আপনি তো দেখি ফলমূলাদির দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন, আপনি এমন শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ বলিয়া যশস্বী হইলেন কীরূপে?'

মহাত্মা তুলাধার বলিলেন—'আমি সর্বভূতে প্রীতি-মৈত্রী ও সর্বভূতহিতসাধনরূপ পুরাতন সনাতন ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি। ('বেদাহং জাজলে ধর্মং সরহস্যং সনাতনম্। সর্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যৎ জনা বিদুঃ।।')। সর্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত করাই আমার প্রধান ব্রত। আমি সকল লোককে সমান জ্ঞান করি ('সমোঽহং সর্বভূতেষু'), লোকে যখন স্বয়ং বিদ্বেষ, কাম এবং ভয় পরিত্যাগ করে, কায়মনবাক্যে জীবের প্রতি অহিংসা আচরণ করে, তখনই তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে।' এইরূপে অহিংসা ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, হিংসামূলক যাগযজ্ঞাদির অপকর্ষতা, ত্যাগমূলক যজ্ঞাদির কর্তব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন এবং সারকথাটি বলিয়া দিলেন—

হে জাজলে, যিনি সকলের নিত্যসুহৃদ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকেন, তিনিই ধর্ম জানেন।

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।। মভা শাং ২৬১

সর্বভূতে প্রীতি-মৈত্রী এবং সর্বভূতের হিতসাধনই পরম ধর্ম, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনাদি নহে, ইহাই এই আখ্যায়িকার সুস্পষ্ট মর্ম।

শ্রীগীতায়—বিশ্বহিত, বিশ্বমানবধর্ম

খ্রিস্টিয়ানের যেমন বাইবেল, মুসলমানের যেমন কোরান, তেমনি হিন্দুর সর্বমান্য ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। উহা পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের বেদ। (The Geeta is the gospel of dedicated life. —Radhakrishnan)

এই কথাটির বিস্তার আবশ্যক।

শ্রীগীতায় নিষ্কাম কর্মযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। উহার তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই— ১। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধি (২।৪৭, ৪৮ ইত্যাদি); কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ (৩।২৭, ১৮।১৬—১৭, ৫।৮—৯ ইত্যাদি); ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ (৩।৯, ৩।৩০, ১৮।৫৭, ৫।১০ ইত্যাদি)। তোমাকে যথাধিকার কর্ম করিতেই হইবে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইও না। আর, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় (গী ২।৪৭)। এ বড় কঠিন কথা।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম করা কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর? ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন? উদ্দেশ্য (motive) ভিন্ন কর্ম হয় না।

উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম হয় না, তা ঠিক। কিন্তু ফলাফলে উদাসীনতা এবং উদ্দেশ্যহীনতা এক কথা নহে। নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য—কর্তব্য-পালন, স্বধর্ম-পালন, উহার ফল—লোকরক্ষা, সৃষ্টিরক্ষা, লোকহিত, গীতার ভাষায় 'লোকসংগ্রহ'। কর্মেই সৃষ্টি, কর্মদ্বারাই সৃষ্টিরক্ষা, তাই প্রকৃতি সকলকেই কর্ম করান। প্রকৃতি আর কী, সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, তাঁহা হইতেই জীবের উৎপত্তি, কর্মপ্রবৃত্তি ('যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং')। তিনি সর্বভূতময়—'যেন সর্বমিদং ততং'। সুতরাং সর্বভূতের ধারণ-পোষণের জন্য, সৃষ্টিরক্ষার জন্য, প্রত্যেকের স্বকর্ম বা স্বধর্ম পালনই ঈশ্বরের অর্চনা। স্বীয় কর্তব্যপালনরূপ ভগবদর্চনা দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে—'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'।

অবশ্য, প্রকৃতির প্রেরণায়, কামনা-বাসনার প্রেরণায় সকলেই কর্ম করে, উহাকে ঈশ্বরার্চনা বলা হয় নাই। জীবের কর্তব্য হইতেছে যে সেই কর্মটিকে নিষ্কাম করিয়া ভাগবত কর্মে পরিণত করা ('মৎকর্মকৃৎ'), নিজের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া 'আমি কর্ম করি' এইরূপ অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, ভগবদিচ্ছার যন্ত্রস্বরূপে ঐশ্বরী প্রকৃতিই আমার মধ্য দিয়া কর্ম করিতেছেন এইরূপ মনে করা, সুতরাং সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা (গী ৩।২৭, ৯।২৭)। এইরূপে, জীবনের সমস্ত কর্মই সর্বভূতহিতার্থে অনাসক্তচিত্তে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সম্পন্ন করাই ঈশ্বরার্চনা, উহাই কর্মযোগ। এইরূপ কর্মকেই যজ্ঞার্থ কর্ম বলা হয়। মানব-জীবনটাই যজ্ঞস্বরূপ, এই যজ্ঞের বেদি জগতের হিত, যজ্ঞেশ্বর জগদাত্মা স্বয়ং ভগবান—যিনি সর্বাত্মরূপে সর্ব যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা, সর্বভূতের সুহৃদ্ ('ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সুহৃদং সর্বভূতানাম্')। (গীঃ ২।৪৭।৪৮, ৩।৯।২৪।৩০, ৫।২৫।২৯, ৬।৩১, ১০।৪৬।৫৭ ইত্যাদি)।

এইরূপ কর্মে বন্ধন হয় না, মোক্ষ হয়; কারণ, বন্ধের কারণ কর্ম নহে, কর্ম-বীজ কামনা, উহাকেই হৃদয়-গ্রন্থি বলে।—

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্তোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্।। কঠ, ২।৩১৫

—জীবিতাবস্থায়ই (ইহ) যখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল (কামনাসমূহ) বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয়, এইটুকুই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সারকথা।

অনেক আধুনিক কৃতবিদ্য ব্যক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসরণে শ্রীগীতাকে কর্তব্যশাস্ত্র (Gospel of Duty) বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কর্তব্য-পালন ও কর্মযোগ ঠিক এক কথা নহে, ইংরেজিতে একটি সুন্দর কথা আছে—

I slept and dreamt that life was Beauty
I woke and found that life was Duty.
নিদ্রায় দেখিনু হায় মধুর স্বপন,—
কি সুন্দর সুখময় মানব জীবন!
জাগিয়া মেলিনু আঁখি, চমকিয়া পুনঃ দেখি,
কঠোর কর্তব্য-ব্রত জীবনযাপন।—প্রভাত-চিন্তা

এ অতি উচ্চ কথা। কিন্তু গীতার আদর্শ উচ্চতর। কর্তব্য পালনে কর্তার অহংজ্ঞান থাকে, ফলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি থাকে, অনেক সময় একটা কঠোরতার অনুভূতিও থাকে। কিন্তু গীতোক্ত কর্মযোগী এ সকলের উপরে। তিনি অনহংবাদী, মুক্তসঙ্গ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার (১৮।২৬)।

কথা হইতেছে এই যে গীতা লৌকিক কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ নহে। উহার কর্মোপদেশের সহিত গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান ও ঐকান্তিক ভাগবত ভক্তি মিশ্রিত। পাশ্চাত্যগণ কর্মতত্ত্বের বিচার করেন কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে; আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ, মোক্ষ, জ্ঞান ভক্তির সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। পাশ্চাত্য জর্মন পণ্ডিত নিট্সে কর্ম-মাহাত্ম্য বা শক্তি-সাধনা, যুদ্ধের কর্তব্যতা, আদর্শ মনুষ্যত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক বিচার করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে পরমেশ্বর গতাসু হইয়াছেন এবং ভবিষ্য আদর্শ মানব-সমাজে খ্রিস্টের স্থান নাই। গীতায়ও আদ্যোপান্ত কর্ম-প্রেরণা, যুদ্ধ-প্রেরণা কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান কী বলিয়াছেন? —'মামনুস্মর যুধ্য চ', আমাকে স্মরণ কর, আর যুদ্ধ কর। আমাতে চিত্ত রাখ, ফলাশা ত্যাগ কর, আমাতে সর্বকর্ম অর্পণ কর, আর যুদ্ধ কর ইত্যাদি (৩০।৩০, ১৮।৫৭)। পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ 'অধিক লোকের অধিক সুখ'। গীতার

উপদেশ, সুখদুঃখের অতীত হও—নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান হও (২।৪৫)। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্বের সারকথা। বস্তুত নিষ্কাম কর্ম মানবীয় কর্ম নহে, উহা ভাগবত কর্ম, উহাতে ভাগবত প্রকৃতি লাভ করিতে হয় ('মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—১৪।২)। সামাজিক কর্তব্য জ্ঞানের সহিত উহার তুলনা হয় না।

That which the Gita teaches is not a human but a divine action; not the performance of social duties but the abandonment of all other standards of duty or conduct, for a selfless performance of divine will working through our nature......In other words, the Gita is not a book of practical ethics but of spiritual life.

–Sri Aurobindo.

গীতায় এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্বধর্ম-পালনের যে উপদেশ—রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন, দেশের, দশের, সমাজের, জগতের হিতার্থ স্বীয় স্বীয় কর্তব্যপালনের উপদেশ আছে, ইহা লোকহিতকর নৈতিক উপদেশ। কিন্তু গীতা যখন বলেন, এই সকল কর্মই নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, তখন উহা হইল মানবাত্মার পরম হিতকর অধ্যাত্মোপদেশ: আমার কর্ম নিষ্কাম হইবে তখনই যখন আমি আমিত্বকে, অহংবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত যে আত্মা বা ঈশ্বর তদ্বিষয়ে সচেতন হইতে পারিব।

জীব একাধারে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা, সুতরাং উহার ত্রিবিধ শক্তি—কর্মশক্তি যাহার ক্রিয়ার ইনি কর্তা, জ্ঞানশক্তি যাহার ক্রিয়ার ইনি জ্ঞাতা এবং ইচ্ছাশক্তি যাহার ক্রিয়ার ইনি ভোক্তা। কর্মশক্তির বিকাশ চেষ্টনায় (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ইহাকে বলে Conation), জ্ঞানশক্তির বিকাশ ভাবনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Cognition), ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কামনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Emotion)। জীবের অন্তর্নিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে তদনুসারে সাধন পথের তিনটি নামকরণ হইয়াছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। জীবের যে কর্মশক্তি উহা বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই ('মৎকর্মকৃৎ') নিষ্কামকর্মযোগ হয়; জীবের মধ্যে যে জ্ঞানশক্তি উহা ঈশ্বরমুখী হইয়া সর্বভূতে ভগবৎসত্তার অনুভূতি ('সর্বভূতেষু মদ্ভাবঃ') হইলেই জ্ঞানযোগ হয় (৪।৩৫)। জীবের যে ইচ্ছাশক্তি, কামনা-বাসনা, উহা বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই ভক্তিযোগ হয়, যাহা উচ্চতম স্তরে ভগবৎপ্রেম।

কর্ম, জ্ঞান, প্রেম (Life, Light and Love)—এই তিনটি জীবে অস্ফুট অপূর্ণ, প্রকৃতি-জড়িত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধনবলে এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। ('মদ্ভাবমাগতাঃ', 'ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ' ইত্যাদি)।

কর্ম, জ্ঞান, প্রেম—এই তিনটির যুগপৎ অনুশীলনেই জীবের পূর্ণ বিকাশ, উহাই পূর্ণাঙ্গ যোগ। গীতায় এই সমন্বয়-যোগই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞান অর্থ সর্বভূতে ভগবৎ-সত্তার জ্ঞান, কেবল নির্গুণ তত্ত্বজ্ঞান নহে। গীতোক্ত যোগী এককে বহুর মধ্যে দেখেন এবং বহুকে তিনি একের মধ্যে দেখেন। ইহার ফলে তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং সর্বভূতহিতসাধনে রত থাকেন। (৬।২৯।৩০।৩১।৩২)। গীতোক্ত যোগী বিশ্বধর্মী, বিশ্বকর্মী, বিশ্বাত্মার উপাসক, তাহার সাধনা কেবল নিজের মুক্তির জন্য নহে, তিনি বিশ্বমানবের দুঃখ দুর্দশা উপেক্ষা করিয়া কেবল নিজ মুক্তিসাধনায় জীবনক্ষেপ করেন না।

চাহিনা ছিঁড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি ব'সে র'ব মুক্তি-সমাধিতে? —রবীন্দ্রনাথ

জগতের মানবমাত্রই যখন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে এই উদার ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করিবেন, সর্বত্রই যখন এই ধর্ম অনুষ্ঠিত হইবে—

জ্ঞানে যখন সকলেই সর্বভূতে সমদর্শী হইবে,
প্রেমে যখন সর্বভূতে প্রীতিমান হইবে,
কর্মে যখন সর্বভূতহিতসাধনে রত হইবে,

তখনই জগতে প্রকৃত ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা (Kingdom of God on earth) হইবে, যাহাকে গান্ধীজি 'রামরাজ্য' বলিতেন। এই সার্বভৌম ধর্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিবাদ, অশান্তি-উপদ্রব সমস্ত দূরীভূত হইবে, জগতে অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে। ইহাই গীতোক্ত ধর্মের মহান আদর্শ।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশে এবং প্রাচ্যদেশেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পূর্বে যে অহিংসক, সর্বভূতহিতে রত, নিষ্কামকর্মী আদর্শ মানব-সমাজকে বর্ণনা করা হইয়াছে, এইরূপ সমাজ এবং আধুনিক সাম্যবাদিগণের পরিকল্পিত মানবসমাজ আদর্শত এক। তবে পার্থক্য এই যে সাম্যবাদিগণের অনেকে ধর্ম বস্তুটিকে একেবারে বাদ দিয়াছেন। বস্তুত, জগতে ধর্মের নামে মানুষ মানুষের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, ইউরোপে মধ্যযুগে ধর্মান্ধ যাজক-সম্প্রদায় স্বার্থান্ধ রাজশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া যে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করিয়াছিল, সে সকল কথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুতরাং পাশ্চাত্য সাম্যবাদিগণের ধর্মবস্তুটির প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ কিছু বিচিত্র নহে। বৈদান্তিক

সমত্বজ্ঞান ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম যে ধর্মের মূল ভিত্তি, সেই উচ্চাঙ্গের ধর্মের সহিত যদি তাঁহারা পরিচিত থাকিতেন তবে তাঁহারাও ধর্মবস্তুটির এমন সরাসরি বাদ দিতে পারিতেন না। কেননা তাঁহারা যে কর্ম-নীতি প্রচার করেন সামাজিক দৃষ্টিতে ভাগবত ধর্মের কর্ম-নীতিও প্রায় তাহাই, পারলৌকিক তত্ত্ব যাহাই হউক। সাম্যবাদের একটি মূল নীতি এই যে, সমাজের সকলকে সমভাবে ভোগ করিতে না দিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা চৌর্যমাত্র (Property is theft)। আমরা দেখিতে পাই, ভাগবত শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে অনুরূপ ভাষায় ঠিক এই নীতিরই উল্লেখ আছে। —

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি।।

যে পরিমাণ ধনাদিতে নিজের ভরণ-পোষণ হয় তাবন্মাত্রেই দেহীদিগের স্বত্ব। যে তাহার অতিরিক্ত ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে সে চৌর, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য (ভাগবত ৭।১৪।৮)।

বস্তুত, সর্বভূতে সাম্যদৃষ্টি এবং সর্বভূতহিতসাধনার্থ নিষ্কাম কর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণবর্জিত আদর্শ মানব-সমাজের পরিকল্পনা ভারতেই প্রথম হইয়াছে।

'যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন।
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃকর্মবিবর্জিতা।।'

অহিংসক, আত্মজ্ঞানী, সর্বভূতহিতে রত একান্তী অর্থাৎ ভাগবত ধর্মাবলম্বী দ্বারা যদি জগৎ পরিপূর্ণ হয় তবে জগতে স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত কর্ম লোপ পায় এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হয়। (মভাঃ শাং ৩৪৮।৬২।৬৩)।

পুরণাদি ভক্তিশাস্ত্রে—বিশ্বপ্রেম, সর্বভূতহিত

পুরাণাদি শাস্ত্র বেদান্তেরই অর্থ-প্রকাশক।

বেদান্ত বলেন, এ সমস্তই ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, এই জগৎ বিষ্ণুময়—'ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ।'

শ্রীগীতা বলেন, বাসুদেবই সমস্ত—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'।

ভাগবত পুরাণ বলেন, এই কৃষ্ণ বস্তুটিকে অখিলাত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে, ইনি বিশ্বাত্মা—'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বং আত্মানমখিলাত্মনাম্।'

ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বাসুদেব, কৃষ্ণ, বিশ্বাত্মা—সকলই এক বস্তু যাঁহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় ভগবান, ঈশ্বর, God।

গীতাগ্রন্থে ভগবানের উক্তি আছে—আমি অজ, অব্যয়াত্মা, সর্বভূতের ঈশ্বর হইলেও জগতের হিতের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

হিন্দুগণ ইহা বিশ্বাস করেন। পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্রে এই অবতার-লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ প্রতিমাদিতে ঈশ্বরার্চনার বিধান। হিন্দুরা যে মূর্তিপূজা করেন তাহাকে প্রতিমা বলে, পুত্তলিকা বলে না। প্রতিমা অর্থ সাদৃশ্য, বাংলায় প্রাণ-প্রতিম, সহোদর-প্রতিম ইত্যাদি শব্দে এই অর্থ পাওয়া যায়। পুত্তলিকা অর্থ মৃত্তিকাদির মূর্তি (idol)। উচ্চাঙ্গের সাধনায় সিদ্ধ না হইলে, নামরূপ ব্যতীত মনুষ্য-মন সেই অনন্তশক্তিমৎ অব্যক্ত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। তাই ঈশ্বরের শক্তি বিশেষের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া চিন্তার অবলম্বনস্বরূপ একটা প্রতীক গ্রহণ করা হয় মাত্র। মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, স্তব-স্তুতি, প্রণাম-মন্ত্রাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সাধক প্রতীক-অবলম্বনে ঈশ্বরেরই পূজা করিতেছেন, পুতুল পূজা করিতেছেন না। হিন্দুরা প্রতিমা-পূজক হইলেও পৌত্তলিক নহেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির অতীত হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিমারও প্রয়োজন হয় না। বস্তুত তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই, তাই সিদ্ধ বুদ্ধ সম্যগ্‌দর্শী ঋষিগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।'

'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' বলিয়া শালগ্রামে বন্দনা করিলে কি শিলাখণ্ডের অর্চনা বুঝায়? অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, এইরূপ উপাসনা অজ্ঞের পক্ষে জড়োপাসনায় পরিণত হইতে পারে। এমন সতর্কবাণী ঋষিশাস্ত্রেই আছে—'অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু কেবলম্ (বৃঃ নাঃ পুঃ)'—অজ্ঞলোকে পাষাণাদিকেই ঈশ্বর বলিয়া অর্চনা করে। ভাগবতশাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থিত আছেন, সুতরাং সর্বভূতকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের অর্চনা নিরর্থক। এই কথাটি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে ভক্তিতত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্।।
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বাঽর্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্‌ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।।

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াঽনঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ।।
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।।

ভাঃ ৩য় স্কন্দ, ২৯ অঃ ২১।২২।২৪।২৭

আমি সর্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপে অবস্থিত আছি; অথচ সেই আমাকে অর্থাৎ সর্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্বভূতে অবস্থিত আত্মা ও ঈশ্বর আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে সকল প্রতিমাদিই ভজনা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যে প্রাণিগণের অবজ্ঞাকারী সে বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। সুতরাং মনুষ্যের কর্তব্য যে, আমি সর্বভূতে অবস্থিত আছি ইহা জানিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলের প্রতি মিত্রতা এবং দানমানাদির দ্বারা সকলকে অর্চনা করে।

ইহাই হইল সর্বভূতস্থ ভগবানের অর্চনা। ইহা ভক্তিমার্গে ঈশ্বরোপাসনার প্রধান অঙ্গ।

তবে কি প্রতিমাদির অর্চনা অনাবশ্যক? উহা কি নিষিদ্ধ? —না, উহা অনাবশ্যকও নয়, নিষিদ্ধও নয়। এই স্থলেই সে সকল ক্রিয়াযোগের বিধিও আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিধিও আছে—'ভূতেষু মদ্ভাবনয়া'—সকল প্রাণীতে আমার ভাবনা করিতে হইবে। পরেই বলা হইয়াছে, আমি তো সর্বভূতেই অবস্থিত আছি, তবে, যে পর্যন্ত পুরুষ সর্বভূতস্থিত আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্যন্ত স্বকর্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাতে আমার অর্চনা করিবে ('যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতঃ')। সুতরাং সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে, প্রতিমাতে যাঁহার অর্চনা করিতেছি তিনি বিশ্বাত্মা, এবং সে অর্চনার উদ্দেশ্য তাঁহাতে অনন্যা ভক্তিলাভ। ইহা বিস্মৃত হইলে প্রতীকোপাসনা অজ্ঞের জড়োপাসনায় পরিণত হয়।

ঈশ্বর সর্বভূতময়, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ যে সাধনা তাহাকেই জ্ঞানযোগ বলা হয়। উহা ভক্তিযোগেরও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্য উদ্ধবকে যে ভক্তিযোগ উপদেশ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

হে উদ্ধব, সর্বভূতে আমাকে চিন্তা করিবে ('সর্বভূতেষু মন্মতিঃ' ভাঃ ১১।১৯)। আমার প্রতিমাদির পূজার্চনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু আমি তো কেবল প্রতিমাতে নই; আমি সর্বাত্মা, আমি তোমার হৃদয়েও আছি, সর্বভূতেও আছি ('সর্বভূতেষ্বাত্মনি

চ সর্বাত্মাহমবস্থিতঃ')। নির্মলচিত্ত হইয়া আপনাতে ও সর্বভূতে আমাকে অন্তরে বাহিরে পূর্ণ দর্শন করিবে ('মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতচাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ' ভাঃ ১১।২৯।১২)। যিনি সর্বভূতে আমার সত্তা দর্শন করেন তাহার অহঙ্কার, স্পর্ধা, অসূয়া ও অভিমান নাশ পাইয়া থাকে। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্বজনের হাসি পরিহাস উপেক্ষা করিয়া ('বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকী') কুক্কুর, চণ্ডাল, গোগর্দভ পর্যন্ত সমুদয় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ('প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভূমাবশ্বচাণ্ডাল গোখরম্')। যতদিন পর্যন্ত সর্বভূতে আমার সত্তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হয় ('যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে') ততদিন পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবে।

হে উদ্ধব, সর্বভূতে আমার অস্তিত্ব চিন্তা করা এবং কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের সেবা করাই সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত।

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ।।

এই আমি তোমাকে মদীয় নিষ্কাম ধর্মতত্ত্ব বলিলাম। ইহাতে ব্রহ্মবাদেরও সারকথা আছে ('ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহ')। ইহা বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং মনীষীদিগের মনীষা ('এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্')। ইহা জ্ঞাত হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। অমৃত পান করিলে আর কি পেয় অবশিষ্ট থাকে ('পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে')? মনুষ্য যখন 'আমার কর্ম আমার প্রয়োজনে আমি করি' এই ভাব ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্ম-সমর্পণপূর্বক আমার কর্ম করিতে ইচ্ছুক হয় ('নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষতো মে') তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া ('তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানে') আমার আত্মভূত হইবার যোগ্য হয় (ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ')। ভাঃ ১১।২৯

এ স্থলে শ্রীভগবান যে উপদেশ দিলেন তাহাকে ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে, ইহাতে ব্রহ্মবাদেরও সারকথা আছে। ইহাতে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও কর্ম-সমর্পণের কথা আছে। সুতরাং ইহাতে ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম এ তিনেরই সমাবেশ আছে। এ স্থলে 'জ্ঞান' অর্থ সর্বভূতে ভগবৎ-সত্তার জ্ঞান। যিনি সর্বভূতে ভগবৎসত্তা অনুভব করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, এই অনুভূতির জন্যই তিনি হন সর্বভূতে সমদর্শী ও সর্বভূতানুকম্পী। ইহাই নিষ্কাম ভক্তের লক্ষণ—('সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'—গীঃ ১৮।৪৪)। ইহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সহিত নিষ্কাম কর্মেরও যোগ আছে, কেননা যিনি সর্বভূতে সমদর্শী ও সর্বভূতানুকম্পী

ভগবদ্ভক্ত তিনি সর্বভূতহিতার্থে সর্বভূতময় ভগবানের কর্মবোধেই সর্বকর্ম করেন। ইহাকেই 'মদীয় নিষ্কাম ধর্মতত্ত্ব' বলা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ-চরিত্রে আমরা ইহাই দেখি। পুরাণে ভক্তরাজ প্রহ্লাদকেই আদর্শ ভক্ত বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ বিদ্যাশিক্ষার্থে গুরুগৃহে প্রেরিত হইলে সেখানে নিজেই এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন। তিনি দৈত্যবালকগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিতেন। সে শিক্ষা কীরূপ?—

'হে দৈতবালকগণ, এই বিশ্বজগৎ সর্বভূতময় বিষ্ণুরই বিস্তার, সকলই বিষ্ণুময় ('বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ'), বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য অভেদ-দৃষ্টিতে সকলকে আত্মবৎ দেখিবেন। ('দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ')। হে দৈত্যগণ, তোমরা সর্বত্র সমান দেখিও ('সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতানুপেত'), এই সমদর্শনই অচ্যুতের আরাধনা ('সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য')। সর্বভূতস্থিত বিষ্ণুতে তোমাদের মতি হউক আর তাঁহার অধিষ্ঠান প্রাণিসমূহ তোমাদের মৈত্রী হউক ('সর্বভূতস্থিত তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশং) (বিঃ পুঃ ১।৭ম অঃ)।

অচ্যুতকে প্রীত করা বহু আয়াসের কর্ম নয়, কারণ তিনি সর্বভূতের আত্মা এবং সর্বত্রই অবস্থিত আছেন ('আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ'), অতএব সর্বভূতে দয়া ও মৈত্রী কর ('তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্')। উহাতেই ভগবান তুষ্ট হন ('যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ')। —ভাঃ ৭।৬ষ্ঠ অঃ

ভক্তোত্তম প্রহ্লাদের এই ধর্মোপদেশে গীতোক্ত 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ, সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ' ইত্যাদি ভক্তলক্ষণ বর্ণনাই পাইতেছি (গীঃ ১২।১৩-২০)। প্রহ্লাদ কেবল উপদেশে নয়, কার্যত আচরণেও এই সকল গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রহ্লাদকে যখন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রহ্লাদ, মিত্র ও শত্রুর প্রতি নৃপতি কীরূপ ব্যবহার করিবেন', প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন—'সাম, দান, ভেদ, দণ্ড আদি রাজনীতির কথা গুরু শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু এ সকল নীতি আমার মনোমত নয়। কিন্তু পিতঃ ক্রোধ করিবেন না (মা ক্রুধঃ), আমি তো সেরূপ শত্রু-মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন? যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু-মিত্র কথা কোথা হইতে হইবে, কাহাকেও শত্রু মনে করিব কীরূপে? ('সর্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে। পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ')। তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে

আছেন আর সকলে আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, এই ব্যক্তি শত্রু, এরূপ পৃথক্ করিব কীরূপে? সুতরাং এই দুষ্ট-বিধিবহুল নীতিশাস্ত্রের কি প্রয়োজন?'

শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে ভক্তিযোগের বর্ণনায় সর্বত্রই ভক্তির সহিত বৈদান্তিক জ্ঞান অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবৎ-সত্তার জ্ঞান সংযুক্ত আছে। কিন্তু আধুনিক ভক্তি-শাস্ত্রাদিতে ভক্তিযোগের এই জ্ঞানমূলক লক্ষণটি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় না। বস্তুত, ভক্তিরও প্রকারভেদ আছে, ভক্তেরও প্রকারভেদ আছে। ভাগবত শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তগণের উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। যথা—

অধম বা প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণ ঃ—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধায়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।

—ভাঃ ১১।২।৪৭

—যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাদিতে হরির পূজা করেন কিন্তু তাঁহার ভক্ত বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত বা নিকৃষ্ট ভক্ত।

যাঁহারা প্রতিমায় শ্রীহরির পূজা করেন তাঁহারা অবশ্য ভক্ত, তাঁহাদের ঈশ্বরে শ্রদ্ধার ভাব আছে বটে, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যের প্রতি কোনও শ্রদ্ধার ভাব নাই। শত্রুর প্রতি হিংসাদ্বেষ আছে, কামক্রোধাদিও সংযত হয় নাই, কেবল ঈশ্বরে কিছু শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে মাত্র। ইহাদের মন্দ কর্ম করিতেও বড় আটকায় না। মোট কথা, ভক্তির অনুশাসনে নিম্নপ্রকৃতির কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। ইঁহারা প্রাকৃত ভক্ত।

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ ঃ—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি ন মধ্যমঃ।।

—ভাঃ ১১।২।৪৬

—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা, শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম।

এ স্থলে নিম্নপ্রকৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ঈশ্বরে শ্রদ্ধা প্রেমে পরিণত হইয়াছে, ভক্তজনের প্রতি মৈত্রীভাব জন্মিয়াছে, অজ্ঞজনের প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল, সেখানে কৃপার ভাব হইয়াছে, শত্রুর প্রতি হিংসাদ্বেষ ছিল সে স্থলে উপেক্ষার ভাব আসিয়াছে। কিন্তু এখনও ভেদজ্ঞান আছে, আপন-পরে শত্রু-মিত্রে সমভাব হয় নাই, সর্বভূতে সমদর্শন, সর্বভূতে ভগবৎ-সত্তার অনুভূতি হয় নাই, তাই ইহারা মধ্যম।

উত্তম ভক্তের লক্ষণ ঃ—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিভেদাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।
সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।

—ভাঃ ১১।১।২২।৪৫

—যাঁহার আত্ম-পর ভেদ নাই, বিত্তাদিতে আমার এবং পর বলিয়া ভেদজ্ঞান নাই, সর্বভূতে যাঁহার সমজ্ঞান, যাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন সংযত তিনি ভক্তোত্তম। যিনি সর্বভূতে আত্মস্থ ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্বভূত দেখিতে পান, তিনি ভক্তোত্তম।

আমাতেও ভগবান আছেন, সর্বভূতেও ভগবান আছেন এবং ভগবানেই সর্বভূত আছে, ইহা যিনি অনুভব করেন তিনিই ভক্তোত্তম। এই অনুভূতি যাঁহার হইয়াছে তাঁহার একমাত্র ধর্ম হয় সর্বভূতের সেবা। দয়া নয়—সেবা, পূজা, আর তাঁহার ভক্তি হয় সর্বভূতে প্রীতি। ভগবদ্ভক্তি ও ভূত-প্রীতি এক হইয়া যায়। এমন উচ্চাঙ্গের ভক্তিবাদ জগতের ধর্ম-সাহিত্যে আর দেখা যায় না। ইহাই বিশ্বধর্ম, বিশ্বপ্রেম।

ইংরেজির অনুকরণে এক্ষণে 'মানবতাবোধ' শব্দটি অনেকে ব্যবহার করেন। ঋষিশাস্ত্রের কথা সর্বভূতের সহিত একাত্মতাবোধ ('সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা'—গীতা)। উহা অধিকতর ব্যাপক ও মূলস্পর্শী। মানবতাবোধ বা লোকপ্রীতি উহারই অন্তর্গত। শাস্ত্রে বৃক্ষাদিতে জলসেচনও পুণ্য কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। চিন্তাশীলতার অভাববশত এ সকল বিধি-ব্যবস্থার তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারি না।

এ পর্যন্ত আমরা পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনা করিলাম। কিন্তু প্রাচীন পুরাণাদি ব্যতীত উত্তর কালেও বিবিধ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। এই পুণ্যভূমিতে যখনই যেখানে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেখানে কোনও মহামানব আবির্ভূত হইয়া যুগোপযোগী ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে যুগাবতার বলা হয়।

বৌদ্ধযুগের পরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ এবং কুমারিল ভট্ট বৈদিক কর্মমার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মার্গই কালক্রমে একরূপ নিরীশ্বর হইয়া পড়িয়াছিল। কুশাগ্রধী পণ্ডিতগণ দার্শনিক বিচার-বিতর্কে বেশ পারদর্শী ছিলেন, সুতরাং জ্ঞানচর্চা যথেষ্ট হইত, কিন্তু উহাতে ভক্তি বস্তুটির নামগন্ধও ছিল না। সে কালের জ্ঞানিগণের দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কথিত আছে, কোনও পণ্ডিতকে মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করিতে বলা হইয়াছিল, তখন তিনি 'পেলব পরমাণু, পেলব, পরমাণু' বলিতে বলিতে চক্ষু মুদিলেন। ইনি কণাদের পরমাণুবাদই সার করিয়াছিলেন, এই মতে পরমাণুই জগতের মূল কারণ, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কেহ নাই। আর একটি

পণ্ডিত অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থে এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া সংস্কারবশত শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া গ্রন্থারম্ভে ঈশ্বরের নমস্ক্রিয়াসূচক কিছু লিখিতে উদ্যোগী হইলেন, অমনি তাঁহার সোঽহং জ্ঞান উদিত হইল, কী ভ্রম! আমিই তো তিনি—'অব্ধি অপার স্বরূপ মম লহরী বিষ্ণু, মহেশ', প্রণাম করিব কাহাকে? 'কাঁহা করু প্রণাম?' কাজেই তাঁহার আর প্রণাম করা হইল না। সেকালে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল। তথায় দেখা যাইত, ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া—তাল ঢুপ্ করিয়া পড়ে না পড়িয়া ঢুপ্ করে—এই অপূর্ব তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ ছল-তর্ক-বাদ-বিতণ্ডার ঢেউ উঠাইতেছেন। এই সকল ছিল সেকালের জ্ঞানের চর্চা ও পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। আর কর্মের তো অন্তই ছিল না। বেদের তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি হইয়াছিলেন, উপদেবতা, অপদেবতা, গ্রাম্যদেবতাও অনেক জুটিয়াছিলেন, এমন কী জ্বর, বসন্ত প্রভৃতিও দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তন্ত্রমন্ত্রের অসৎ ব্যবহার, অভিচার, ব্যভিচারাদিরও অন্ত ছিল না। প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, কামিনী-কাঞ্চনাদির কামনায় কলুষিতচিত্তে এই সকল 'ধর্মকর্ম' বা ধর্মবাণিজ্য সম্পন্ন হইত। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে ধর্মধ্বজিতা যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছিল, ধর্মপ্রাণতা ছিল না। এইরূপ যখন শোচনীয় ধর্মের গ্লানি তখনই শ্রীচৈতন্য অবতার, ভক্তিহীন জ্ঞান ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিহার, প্রেমভক্তি ও হরিনাম প্রচার। ইহারই নাম যুগধর্ম অর্থাৎ যুগোপযোগী ধর্ম। শ্রীচৈতন্য যুগাবতার, প্রেমাবতার।

শ্রীচৈতন্য 'যাচিয়া প্রেম দিয়াছেন', আবার স্বয়ং আচরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম যে কী বস্তু তাহা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—'আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়।' গম্ভীরা লীলায় দ্বাদশ বর্ষ দিবারাত্রি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আর্তি-দৈন্য-হাসি-কান্নায়, তপ্ত ইক্ষুরসবৎ অন্তঃসিদ্ধ বহির্জ্বালাময় কৃষ্ণবিরহের সুখদুঃখে কর্তন করিয়াছেন। সে লীলা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। কোনও মনীষী ভক্ত বলিয়াছেন, 'জগতে একবার ভগবৎপ্রেম মূর্ত হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন, তাহা এই বঙ্গদেশে।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে 'বৈধীভক্তি' ও 'রাগানুগাভক্তি' ভেদে দ্বিবিধ সাধনার উপদেশ আছে। রাগানুগা ভক্তি বা ব্রজের ভাব অতি অন্তরঙ্গ সাধনা, পরম ভাগ্যবান উচ্চাধিকারী ব্যতীত সকলে উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। এই হেতু শ্রীচৈতন্যধর্মে দাস্য ভাব, নাম কীর্তন, জীবে দয়া—সর্বসাধারণের জন্য এই সকলের ব্যবস্থা, ইহাই বৈধী মার্গ।

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন,
ইহাপেক্ষা ধর্ম নাই শুন সনাতন।"

নাম ও নামীতে অভেদ, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবেও অভেদ, 'বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়'—(চৈঃ ভাঃ), কেননা 'সকল কৃষ্ণের গুণ বৈষ্ণবশরীরে'—(চৈঃ চঃ)। যদি নাম লইলে নামীর স্মৃতি মনে আসে, প্রেমের পুলক অঙ্গে আসে, যদি বৈষ্ণব দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তবেই এ সাধনা সার্থক হয়।

মহাপ্রভু, এতৎ সঙ্গে 'জীবে দয়া'কে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে এবং শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ঠিক অনুরূপ উপদেশ আছে। (৩৭পৃঃ)। জীবে দয়া, জীবের সেবা, জীবে প্রেম এ সকল একই বস্তু, একই ভাবের বিভিন্ন বিভাব।

প্রঃ। কিন্তু উপরিউক্ত শ্লোকে এবং গীতা-ভাগবতে অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণবাক্যে উল্লিখিত আছে যে, আমি সর্বভূতে অবস্থিত আছি, ইহা জানিয়া সর্বভূতের ভজনা করা, সর্বভূতের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা (৩৮পৃঃ)। শ্রীচৈতন্য-বাক্যে কি এই 'সর্বভূতস্থ ভগবানের' কোন ইঙ্গিত-আভাস পাওয়া যায়?

উঃ। ইঙ্গিত-আভাস কেন, এ কথার স্পষ্ট উল্লেখই আছে—

'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।'

মনে রাখিতে হইবে, ইহা সাধারণ শিষ্টাচারসম্মত সম্মান নয়, এবং কেবল মনুষ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয় নাই, 'জীবে সম্মান দিবে'। শ্রীকৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া সর্বজীবের সম্মান প্রদর্শন তো একেবারে দণ্ডবৎ প্রণাম, পূজা, সেবা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য উদ্ধবকে সেই উপদেশ দিয়াছেন—'হে উদ্ধব, তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া, লোকের উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত সমস্ত জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। যতদিন পর্যন্ত সর্বভূতে আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি না হয় ততদিন পর্যন্ত এইরূপ উপাসনা করিবে।' (৫০ পৃঃ দ্রঃ)। এ উপাসনা বড় সহজ নয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে যে মহাবাক্যটি আমরা পাইয়াছি 'তৃণাদপি সুনীচেন, অমানিনা মানদেন'—তাহা কার্যত যথাযথ প্রতিপালন করিতে হইলে চিত্তটিকে যেরূপ নিঃশেষে অভিমান-বর্জিত করিতে হয়, সেইরূপ করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ পালন করা সম্ভবপর হয়। সে বড় কঠিন কথা। অভিমান-ত্যাগ কেবল বাহ্য আচরণের উপর নির্ভর করে না, অহংভাব হইতে উহার জন্ম, উহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিলেও আবার অজ্ঞাতসারে আসিয়া উপস্থিত হয়। কথা আছে,

বৈষ্ণব হইতে বড় ছিল মনে সাধ,
'তৃণাদপি সুনীচেন' পড়ে গেল বাদ।

প্রঃ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেকে বলেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 'জীবে দয়া' উপদেশের মুখ্য কথা 'পারমার্থিক দয়া' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দিয়া জীব-উদ্ধার। ঐহিক ও দৈহিক আর্তিনাশ গৌণ ও তুচ্ছ, কেননা উহার ফল অনিত্য। তাঁহারা সেবাধর্মে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎসাহশীলও নন।

উঃ। দেহ-রোগ অপেক্ষা ভবরোগের প্রতিকার যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কী? যাঁহারা সেরূপ অধিকারী এবং সে বিষয়ে 'চাপরাস' পাইয়াছেন, তাঁহারা 'পারমার্থিক' দয়াগুণে জীব-উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা তো সকলের সাধ্য নয়। মহাপ্রভুর উপদেশের মর্মও উহা নয়। জীবের সেবা ভগবানেরই অর্চনা, ইহাই ভাগবত ধর্মের কথা, এবং সকল শাস্ত্রেরই উহা মান্য। এই হেতু শ্রীগৌরাঙ্গধর্মেও নাম-যজ্ঞের সহিত সেবা-যজ্ঞও যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জীবে দয়া জীব উদ্ধারের জন্য নয়, নিজের উদ্ধারের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাভব মানিয়া পরদিন আসিয়া যখন শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—

'প্রভু বোলে, বিপ্র, সব দম্ভ পরিহরি
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি।'

এস্থলে কৃষ্ণভজনের সহিত সর্বভূতের সেবা সাধনাঙ্গ-রূপেই যোগ করিয়া দেওয়া হইল। 'সর্বভূতহিত' ভারতীয় অধ্যাত্মসংস্কৃতির একটি সুমধুর ফল। উহা সকল শাস্ত্রেই উপদিষ্ট সকল ধর্মেরই সাধনাঙ্গ, শ্রীচৈতন্যধর্মেও তাহাই।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যলীলার এক অপূর্ব বিশেষত্ব আছে, জীব এই লীলা হইতে একটি অপার্থিব বস্তু পাইয়াছে—উহা রাগানুগা ভক্তির সংবাদ—'যাহা মুখ্য ব্রজবাসিজনে'।

শ্রুতিতে আছে, 'রসো বৈ সঃ' (তৈত্তি)। বেদের এই রসব্রহ্মই ব্রজে রসরাজ। ব্রজলীলা রসময়ের রসলীলা—বাৎসল্য রস, সখ্যরস, মধুর রস। এখানে ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই, কেবল মাধুর্যের প্রস্রবণ। কেননা ঐশ্বর্যজ্ঞানে 'সখ্য বাৎসল্য মধুরের করে সঙ্কোচন।' এই রসলীলার সংবাদ, ঈশ্বরের উপাসনায় ঐশ্বর্যবোধহীন মাধুর্যের সংবাদ

'জগতে জানাত কে
যদি গৌর না হ'ত?'*

---

* গ্রন্থকারের 'শ্রীকৃষ্ণ'-গ্রন্থে এ বিষয়টি কিছুটা বুঝিবার ক্ষীণ প্রয়াস আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধবাণীতে বিশ্বপ্রেম, মহামৈত্রী, মহাকরুণা

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবংপি সর্ব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

—মাতা যেরূপ আপনার একমাত্র পুত্রকে স্বীয় প্রাণ দিয়াও রক্ষা করেন, সেইরূপ সর্বপ্রাণীতে অপরিমিত প্রীতিযুক্ত মানস রক্ষা করিবে।

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র অতি ব্যাপক। বৌদ্ধশাস্ত্রও উহার অন্তর্গত। হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। লোকমান্য তিলক লিখিয়াছেন—এ কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈনধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মও বৈদিক ধর্মরূপ আপন পিতারই পুত্র, যে নিজের সম্পত্তির অংশ লইয়া কোনও কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উহা পরকীয়া নয়, কিন্তু তৎপূর্বে এখানে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল উহারই এখানে উৎপন্ন এক শাখা।

Mrs. Rhys Davids বলেন—

Goutama was born and brought up and lived and died as a Hindu... There was not much in the metaphysics and principles of Goutama which cannot be found in one or other of the orthodox systems, and a great deal of his morality could be matched from earlier or later Hindu books..... The difference between him and other teachers lay chiefly in his deep earnestness and in his broad public spirit of philanthrophy.*

— গৌতম হিন্দুর গৃহে জন্মিয়াছেন এবং শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, হিন্দুভাবেই জীবনযাপন করিয়াছেন, হিন্দুরূপেই জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। ...তাঁহার ব্যাখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে এমন বেশি কিছু নাই যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও না কোনও হিন্দুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার উপদিষ্ট নীতি-তত্ত্বসমূহের অধিকাংশই

* Quoted by Pt. Nehru in 'The Discovery of India' from Dr. S. Radhakrishnan's 'Indian Philosophy'.

তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গ্রন্থসমূহে তুল্যরূপই দৃষ্ট হয়। যাহাতে তাঁহাকে পূর্ববর্তী আচার্যগণ হইতে বিশিষ্ট করিয়াছে, উহা হইতেছে তাঁহার গভীর আন্তরিকতা, মানবপ্রীতি, বিশ্বমৈত্রী।

বৌদ্ধ দর্শনের মূল উৎস দুঃখবাদ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের অধিকাংশেরই উৎপত্তি দুঃখবাদে। দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই বুদ্ধপূর্ব যুগের কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্ভব। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল সংসার দুঃখময়, জীব ত্রিতাপে তাপিত, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ, উহাই মোক্ষ— 'অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ'—(সাঃ সূঃ ১ .১)। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কী ?—জ্ঞান। কীসের জ্ঞান ? —প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান।

ইহারই নাম কৈবল্য-সিদ্ধি বা কেবল হওয়া। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরতত্ত্ব বাদ দিয়াই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মুক্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন কারণ, এই যুক্তিবাদী শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের প্রমাণ নাই—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'—(সাঃ সূঃ ১ ।৯২)। যাহা হউক, নিরীশ্বর হইলেও সাংখ্যশাস্ত্র সর্বমান্য, মন্বাদি স্মৃতি এবং শ্রীগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে উহার অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে শ্রীমদ্ভাগবত কপিলদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মুখে ভক্তিযোগেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্মেরও মূল কথা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, উহাও নিরীশ্বর। কিন্তু উহার অনেক তত্ত্বই হিন্দুশাস্ত্রেরও সম্মত এবং উত্তরকালীন পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বয়ং বুদ্ধদেব ভগবানের অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর,
জয় জগদীশ হরে! —দশাবতার-স্তোত্র (জয়দেব)

এমনি সর্বসহিষ্ণু, সর্বগ্রহিষ্ণু, সর্বগ্রসিষ্ণু এই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র! প্রখ্যাত সমালোচক Kieth সাহেব লিখিয়াছেন—

'India has a strange genius for converting what it borrows and assimilating it.'

—ভারতের এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, সে যাহা কিছু বাহির হইতে গ্রহণ করে তাহাই পরিপাক করিয়া আত্মস্থ করিয়া ফেলে।

আর, বৌদ্ধধর্ম তো বাহির হইতেও আসে নাই, সুতরাং উহাকে কুক্ষিগত করা হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য হইবার কথা নয়। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব কী তাহা আলোচনা করিলেই এ কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে তাঁহার পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যের নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। ইহাই 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে খ্যাত। এই ধর্মচক্র প্রবর্তনসূত্রে 'চতুঃ আর্যসত্য' বিবৃত হইয়াছে। উহাই বৌদ্ধধর্মের মূলকথা, আর যাহা কিছু উহারই ব্যাখ্যা-বিবৃতি এবং দার্শনিক বিচার-বিতর্ক।

চতুরঙ্গ আর্যসত্য কী?

প্রথম আর্যসত্য—দুঃখের অস্তিত্ব (দুকখং অরিয়সচ্চং)। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ দুঃখ, প্রিয়ের বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তির দুঃখ—সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ (জাতি পি দুক্‌খা, জরা পি দুক্‌খা, ব্যাধি কি দুক্‌খা, মরণং পি দুক্‌খা, অপ্পিয়েহি সম্পযোগো দুক্‌খো, পিয়ে হি বিপ্পযোগো দুক্‌খো, যম্পিচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্‌খং—সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্‌খন্ধা দুক্‌খা)।

এই দুঃখ-দর্শন হিন্দুশাস্ত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দর্শনে, পুরাণে, আখ্যানে ব্যাখ্যানে কেবল শুনি দুঃখেরই কাহিনী। জীবের যত রকমের দুঃখ জন্মিতে পারে শাস্ত্রকারগণ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন ত্রিতাপ, —আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ—'ত্রিবিধ তাপেতে তারা নিশিদিন হতেছে হারা'। এই তো অবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে শাস্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সে সকলের মূল কথা হইতেছে—সংসার দুঃখময়।

প্রাক্তন কর্মফলে জীবের এখানে জন্ম, জন্মিয়াই দুঃখভোগের আরম্ভ, মৃত্যুতেও শেষ নাই, আবার জন্ম, দুঃখভোগ মৃত্যু, আবার জন্ম। জীব এই দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। ইহারই নাম কর্মবন্ধন, সংসার-বন্ধন। চাই এই বন্ধন হইতে মুক্তি যাহার শাস্ত্রীয় নাম মোক্ষ। এই সংসারটা দুঃখের আগার, কারাগার। এই কারাগার হইতে মুক্তিলাভের জন্যই হিন্দুসাধকের কাতর ক্রন্দন—

> তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
> সংসার গারদে আছি, বল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই ভারতীয় সুপ্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্ভব। যোগশাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য তাহাই। এই শাস্ত্র বলেন, বিবেকী পুরুষেরা সমস্তই দুঃখময় বলিয়া বিবেচনা করেন—'দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ' (যোঃ সূঃ)। গীতাশাস্ত্রে

বলেন—জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ দোষদুষ্ট জীবনটা দুঃখময় ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা জ্ঞানের লক্ষণ—'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্...এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্'। (গীতা ১৩।৮)

বুদ্ধদেবেরও প্রথম কথাই হইল দুঃখ-দর্শন।

দ্বিতীয় আর্যসত্য—দুঃখ উৎপত্তির কারণ। ইহা তৃষ্ণা, কামনাবাসনা, যাহা জীবগণকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। (দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চং ঃ যায়ং তণ্হা পেনোভবিকা—কামতণ্হা, ভব-তণ্হা, বিষয়-তণ্হা)।

তৃতীয় আর্যসত্য—দুঃখের নিবৃত্তি। ঐ তৃষ্ণার সম্পূর্ণ বিরাগ, উহার সম্পূর্ণ নিরোধ, সম্পূর্ণ ত্যাগ (দুঃখনিরোধং অরিয়সচ্চং ঃ যো তস্সায়েব তণ্হায় অসেস বিরাগনিরোধো চাগো)।

দুঃখের কারণ বাসনা এবং বাসনা উৎপত্তির কারণ হইতেছে অহংজ্ঞান, আত্মাভিমান, অহঙ্কার। আমরা সকলেই 'আমি' 'আমি' করি এবং এই 'আমির' সুখের জন্য, 'আমির' ভোগের জন্য অনন্ত কামনাবাসনায় জড়িত হই। এই 'আমিটা' যাহার লোপ পাইয়াছে তাহার বাসনার অগ্নিও নির্বাপিত হইয়াছে, উহাতে ইন্ধন যোগাইবার কোনও উপাদান নাই। তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায় তিনি নির্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

এ সকল কথা ঋষিশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় নিষ্কাম কর্মযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম মুক্তপুরুষের কর্ম। উহার প্রধান লক্ষণ—ফল কামনা ত্যাগ ও অহংত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ (গীতা ২।৪৮, ৩।২৭, ১৮।১৬—১৭ ইত্যাদি)।

উপনিষৎ শাস্ত্রেরও উহাই মূলকথা। কামনাই কর্মবীজ, উহাই পুনর্জন্মের কারণ। শাস্ত্রে ইহাকে হৃদয়গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারিলেই মর্ত্য মানুষ অমর হইতে পারে।

'যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহগ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্।।'

—জীবিতাবস্থায়ই (ইহ) হৃদয়ের গ্রন্থিসকল (কামনাসমূহ) যখন ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য মানুষ, অমর হয়, এইটুকুই সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের সারকথা। (কঠ ২।৩।১০)

চতুর্থ আর্যসত্য—দুঃখ নিবৃত্তির পথপ্রদর্শক অষ্টাঙ্গ মার্গ। তাহা এই—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম, সৎপথে জীবিকার্জন, সম্যক্ উদ্যম্, সম্যক্ স্মৃতি (চিন্তা), সম্যক্ সমাধি (চিত্তের প্রশান্ত অবস্থা)।

(সম্মা দিট্‌ঠি, সম্মা সংকপ্পো, সম্মা, বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা ব্যায়ামো, সম্মাসতি, সম্মা সমাধি)।

তথাগত এই ধর্মোপদেশ সমাপন করিয়া একটি গাথা আবৃত্তি করিলেন—

'ভ্রমিয়াছি বহুদিন।
বাসনাশৃঙ্খলে বদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে,
খুঁজিয়াছি বৃথা;
কোথা হ'তে আসে এই অশান্তি নরের?
অহঙ্কার বেদনার কারণ কোথায়?
অসহ্য সংসার
দুঃখ মৃত্যু ঘেরে যবে নরে!
পাইয়াছি পাইয়াছি এবে!
অস্মিতার মূল তুই,
তুইরে আসক্তি,
নাহি চাহি তোরে আর।
ভগ্ন এবে পাপাগার;
দূরীভূত যতেক উদ্বেগ,
নির্বাণে প্রবিষ্ট চিত্ত
আকাঙ্ক্ষারে করি পরাজয়।'*

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে এই অষ্টাঙ্গমার্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিবৃতি আছে এবং স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত উপদেশ আছে। ইহাকে 'মধ্যমার্গ' বলে। এ কথার স্থূলমর্ম এই যে, একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগবিলাস বর্জন করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি তীব্র বৈরাগ্য এবং কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনাদিও পরিহার করিতে হইবে, ইহাই বুদ্ধদেবের উপদেশ। শীল-সাধন ইহারই অন্তর্গত। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্রে পঞ্চশীল গ্রহণ করিতে হয়। যথা—

১। প্রাণিহত্যা হইতে বিরতিরূপ বিধির পালনে অঙ্গীকৃত হইতেছি (অহিংসা) —পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

২। অদত্ত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরতিরূপ বিধির পালনে অঙ্গীকৃত হইতেছি (অচৌর্য)—অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

* শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু শীলভদ্রের 'বুদ্ধবাণী' হইতে অনুবাদটি গৃহীত।
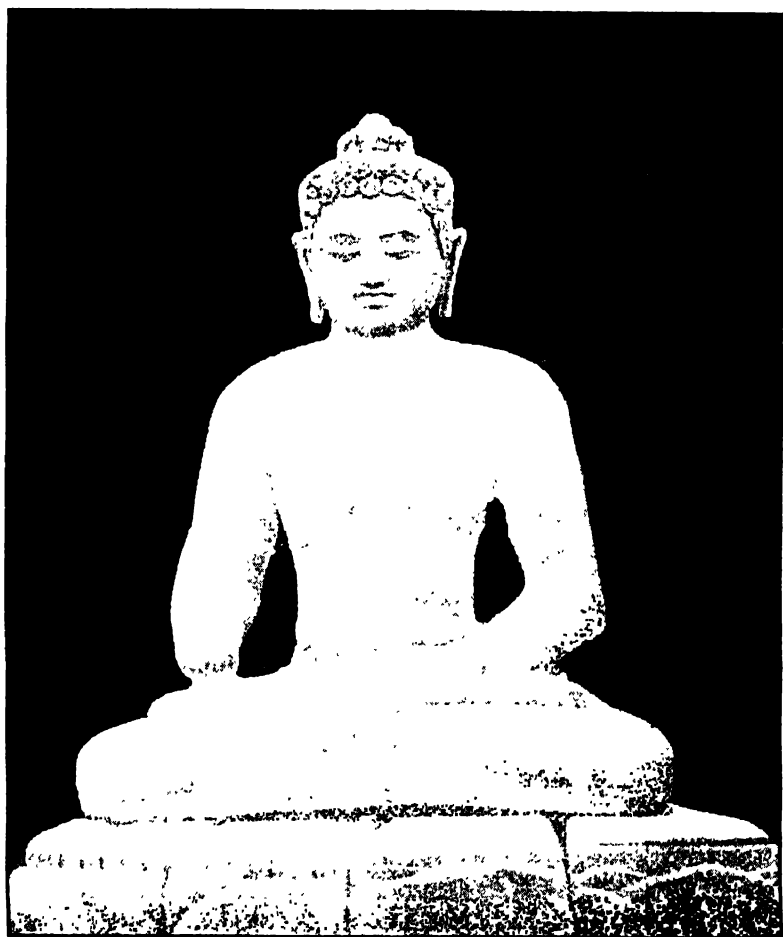
৩। ব্যভিচার হইতে বিরতিরূপ বিধির পালনে অঙ্গীকৃত হইতেছি (ইন্দ্রিয়সংযম) —কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মিথ্যাবাদ হইতে বিরতিরূপ বিধির পালনে অঙ্গীকৃত হইতেছি (সত্যভাষণ) —মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরা, মৈরেয়, মদ্যাদি পানজনিত প্রমত্ততা হইতে বিরতিরূপ বিধির পালনে অঙ্গীকৃত হইতেছি (মাদকদ্রব্য বর্জন)—সুরা-মেরয় মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

কেবল দীক্ষাগ্রহণকালে শীল-সাধনে অঙ্গীকার করিলেই হইল না। আর্য শ্রাবক আজীবন প্রতিদিন এই বলিয়া আপনার শীলগুলি অনুস্মরণ করেন—আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে (ইধ অরিয়সাবক্যে অত্তনো শীলানি অনুস্‌সরতি —অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি ইত্যাদি)। এই ধর্মে চারিত্র্যশুদ্ধিই সাধনার প্রধান অঙ্গ।

মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে মতভেদ আছে, বিভিন্ন ঋষিশাস্ত্রের মধ্যেও মতভেদ আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সমগ্র ঋষিশাস্ত্র এবং বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পূর্ণ এক মত। উহাই এই পুস্তকে আমাদের আলোচ্য বিষয়। পূর্বালোচনায় আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত ঋষিশাস্ত্রেরই অনুশাসন ও উপদেশ—সর্বভূতহিত, সর্বজীবে করুণা, বিশ্বমানবে প্রীতি-মৈত্রী। উহাই ভারত-আত্মার বাণী। বুদ্ধবাণীতে, বুদ্ধজীবনীতে, বৌদ্ধধর্মেও আমরা ঠিক অনুরূপ বাণীই দেখিতে পাই।

শিষ্য বলিলেন, দেব, আমাকে ধ্যান শিক্ষা দিন।

সকল ধর্মেই ধ্যান-ধারণা সাধনার প্রধান অঙ্গ। বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের বিষয় কী? ধ্যেয় বস্তু কি?

বুদ্ধ কহিলেন—ধ্যান পঞ্চবিধ।

প্রথম—মৈত্রীর ধ্যান—এই ধ্যানে হৃদয়কে এরূপ ব্যবস্থিত করিবে যাহাতে তুমি সর্বজীবের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করিতে পার, এমন কী শত্রুরও সুখ তোমার কাম্য হইতে পারে।

দ্বিতীয়—করুণার ধ্যান—এই ধ্যানে ক্লিষ্ট সর্বজীব তোমার চিন্তার বিষয়ীভূত হইবে, তুমি কল্পনায় তাহাদের দুঃখ ও উদ্বেগ দেখিবে, ঐ চিন্তায় তাহাদের জন্য গভীর অনুকম্পায় তোমার হৃদয় অভিভূত হইবে।

তৃতীয়—আনন্দের ধ্যান—এই ধ্যানে তুমি অপরের সমৃদ্ধি চিন্তা করিবে এবং তাহাদের হর্ষে হর্ষ অনুভব করিবে।

চতুর্থ—অপবিত্রতার ধ্যান—এই ধ্যানে তুমি অসাধুতার অশুভ ফল এবং পাপের ও ব্যাধির পরিণাম চিন্তা করিবে। মুহূর্তের সুখ কত তুচ্ছ, উহার পরিণাম কত ভয়াবহ।

পঞ্চম—শান্তির ধ্যান—এই ধ্যানে তুমি একেবারে রাগ-দ্বেষের অতীত, সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অতীত। অদৃষ্টের ফল সত্ত্বেও তুমি অবিচলিত ও পূর্ণ ধৈর্যসম্পন্ন রহিবে।

সর্বজীবে মৈত্রী-ভাবনা, আর্তজীবের দুঃখে করুণা, অপরের সুখ-সমৃদ্ধিতে আনন্দ, পাপের পরিণাম চিন্তা এবং চিত্তের নির্দ্বন্দ্ব প্রশান্ত ভাব—এই সকল হইল ধ্যানের বিষয়।

এই মৈত্রী ভাবনা অবসরমত নয়, প্রতিদিন ভাবিতে হইবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

—সকল প্রাণী সুখী হউক, শত্রুহীন হউক, অহিংসিত হউক, সুখী আত্মা হইয়া কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপনার যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে যেন বঞ্চিত না হয়।

এই মৈত্রী-ভাবনা কথার কথা নয়, চিত্তে হিংসা-দ্বেষ, লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, বিষয়-তৃষ্ণা বিন্দুমাত্রও থাকিলে এই ভাবনা সত্য হয় না। এ সম্বন্ধে 'করণীয় মেত্তসূত্তে (মৈত্রী-সূত্রে)' বিস্তারিত উপদেশ আছে। যথা—

করণীয়মত্থকুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সূজু চ,
সুবচো চস্‌স মৃদু অনতিমানী।

—শান্তপদ লাভ করিয়া পরমার্থ কুশল ব্যক্তির যাহা করণীয় তাহা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, নম্র ও অনভিমানী হইবেন।

সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ,
অপ্‌পকিচ্চো চ সল্লহুকবুদ্ধি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপপগব ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

—অল্পেই তাঁর সন্তোষ হইবে, অল্পেই তাঁর ভরণ হইবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, সংযতেন্দ্রিয়, বিবেকী, অপ্রগলভ এবং সংসারে অনাসক্ত হইবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্ঞ্ ঞূপরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

—এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও তিনি আচরণ করিবেন না যে জন্য অন্যে তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে। তিনি কামনা করিবেন, সকল প্রাণী সুখী হউক, নিরাপদ হউক, প্রসন্নচিত্ত হউক।

য়ে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘাবা য়ে মহন্তা বা
মজ্জিমা রস্সকাণুকথুলা।
দিট্ঠা বা য়েব অদ্দিট্ঠা
য়ে চ দূরে বসন্তি অধিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

—যে কোনও প্রাণী আছে, সবল কী দুর্বল, দীর্ঘ অথবা স্থূল, মধ্যমাকৃতি, খর্ব ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ, দৃশ্য বা অদৃশ্য, দূরবর্তী বা অদূরবর্তী, যাহারা জাত বা যাহারা জন্মিবে, নিঃশেসে সর্ব প্রাণী সুখী আত্মা হউক।

ন পরোপরং নিকুবেথ
নাতিমঞ্ঞ্ঞেথ কত্থচিনং কঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্ঞ্ ঞা
নাঞ্ঞ্ ঞমঞ্ঞ্ ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয়্য।

—পরস্পরকে বঞ্চনা করিও না, কুত্রাপি কাহাকেও ঘৃণা করিও না, ক্রোধ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া কাহারও দুঃখ ইচ্ছা করিও না।

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবং পি সর্ব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

—মাতা যেমন নিজ একমাত্র পুত্রকে স্বীয় আয়ু দিয়াও রক্ষা করেন, সেইরূপ সর্বভূতে অপরিমিত প্রীতির ভাব রক্ষা করিবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধোচ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

—উর্ধ্ব দিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সর্বলোকের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মৈত্রীভাব রক্ষা করিবে।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সায়ানো বা য়াবতস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

—যখন দণ্ডায়মান থাক, বা যখন চলিতে থাক, বা যখন বসিয়া থাক, বা যখন শয়নে থাক, যতক্ষণ জাগরিত থাকিবে ততক্ষণ এই ভাবে মগ্ন হইয়া থাকাকেই **ব্রহ্মবিহার** বলে।

'ব্রহ্মবিহার' ঋষিশাস্ত্রের কথা। আর্যঋষির শ্রেষ্ঠ সাধন-সম্পদ এই ব্রহ্মবিহার, ভূমাজ্ঞান। ঋষি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন আর বলিতেছেন—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।।

এই পুরোভাগে অবস্থিত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ও উত্তরে ব্রহ্ম, উর্ধ্ব ও অধোদিকে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত, এই বিশ্ব বরিষ্ঠ ব্রহ্মই—জগৎ ব্রহ্মময়।

বুদ্ধদেবও অনুরূপ ভাষায়ই বলিতেছেন, উর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সর্বলোকে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রাণীতে অপরিমিত প্রীতির ভাব রক্ষা করিবে। যতক্ষণ জাগরিত থাক সতত এইভাবে মগ্ন থাকিবে। ইহাই ব্রহ্ম-বিহার, ব্রহ্মে স্থিতি। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণবাক্যেও ঠিক এই কথাই দেখিতে পাই—সর্বভূতে আমিই অবস্থিত আছি, এই একত্ব জ্ঞানে স্থিত থাকিয়া যিনি সর্বভূতের ভজনা করেন, সর্বভূতে প্রীতি করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থিতি করেন। (২৩ পৃঃ)।

একমাত্র পুত্রের প্রতি মাতার যেরূপ প্রীতি সেইরূপ প্রীতি সর্বভূতে বিস্তার করিয়া দিবে। এ কী শূন্যতার পথ না পূর্ণতার পথ? এ তো বিশ্বাত্মবোধের পথ, এ তো বিশ্বপ্রেমের বাণী। ইহাই ভারত-আত্মার বাণী।

ভারত-আত্মার এই শাশ্বত-বাণী বৌদ্ধযুগেই প্রথম বহির্ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতও একদিন দিগ্বিজয় বহির্গত হইয়াছিল, কিন্তু আসুরিক সৈন্যদল লইয়া নয়, মহাকারুণিক ভিক্ষুদল লইয়া, জগৎ জয়ের জন্য নয়, জগতের হৃদয় জয় করিবার জন্য, ভীতি-প্রদর্শনে জগৎকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য নয়, সুনীতি-প্রদর্শনে জগৎকে শুদ্ধ করিবার জন্য।

বৌদ্ধধর্মের মহাযান পন্থার আবির্ভাব হইলে যে পরহিতব্রত, মহোৎসাহী, নিষ্কামকর্মী সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিশেষভাবে তাঁহাদেরই প্রযত্নে ভারতের এই পবিত্র ধর্মবাণী তিব্বত, চীন, জাপান, তুর্কীস্থান ও পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধবাণীতে ও বৌদ্ধধর্মে বেদান্তের সত্যালোকেরই প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন।—

'বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেননি, তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন ক'রে ভাবতে হবে এবং কেমন ক'রে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। প্রত্যহ শীল-সাধন দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রী ভাবন' দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে—অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর এক দিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না, এই তো অখিল লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি'।'

'মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে ধারণ করে দেখা দিয়েছেন—'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।'

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'—তারই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক—যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সর্বকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, যে মুক্তি সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম, নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

'ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্য দীপ্তিতে প্রকাশ হ'ল ভারতবর্ষের। মানব ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হ'ল দেশ-দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হ'য়ে উঠল অর্থাৎ স্বীকৃত হ'ল সকল দেশের দ্বারা, কেননা, বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ যে দিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে।

সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি—এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ-কলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হউন মানবশ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধ মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে।'

—রবীন্দ্রনাথ

স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সমন্বয় তত্ত্বটি যেরূপ সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য—

'কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সর্বতোভাবে আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট হিন্দুগণ অজ্ঞেয়-বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বর-বাদী জৈনদিগের মতে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন? —বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না সত্য, কিন্তু মনুষ্যের ভিতর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব আনয়ন করাই তাঁহাদের ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য, উঁহারা স্বতন্ত্র ভগবান মানুন বা নাই মানুন, আপনাকে দেবতা করাই উঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—এবং সকল ধর্মের উদ্দেশ্যও তাহাই। তাঁহারা জগৎপিতা জগদীশ্বরকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রস্বরূপ আদর্শ মনুষ্য বুদ্ধদেব বা জৈনদে দেখিয়াছেন এবং পুত্রকে দেখা হইলেই পিতাকে দেখা হইল।

...শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন—ধ্বংস করিতে নয়। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি, স্বাভাবিক বিকাশ হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।'

—চিকাগো বক্তৃতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের ভক্তিবাদে মানবতা ও মৈত্রীর বাণী

'নানা সাধনায় মৈত্রীদ্বারা সকল ধর্মের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব ও যোগস্থাপন করিবার ইচ্ছা সবারই (মধ্যযুগের সাধকদের) ছিল। বার বার সাধকের পর সাধক এই চেষ্টা করিয়াছেন, বার বার আংশিকভাবে সফল বা নিষ্ফল হইয়াছেন, তবু চেষ্টার বিরাম নাই। ইহার দ্বারা সকল ধর্মের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের জন্য, সর্ব সাধন ও মানবের সঙ্গে যোগের জন্য তাঁহাদের অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝা যায়। মনে হয় যেন এই মৈত্রীই ভারতের ভগবন্নির্দিষ্ট শাশ্বত সাধনা। যতদিনে ইহা পূর্ণ না হয় ততদিন ভারতের মুক্তি নাই। ভারতের আত্মা যেন কায়ার পর কায়া ত্যাগ করিয়া ও গ্রহণ করিয়া তার সাধনার মুক্তি খুঁজিতেছে।' —শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বৌদ্ধযুগের শেষে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ ও কুমারিল ভট্ট বৈদিক কর্মমার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এই দুই মার্গেরই বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। 'জ্ঞানীরা' শুষ্ক জ্ঞানচর্চা ও বাদ্‌বিতণ্ডায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন, কিন্তু উহাতে আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধও ছিল না, তাঁহারা প্রায় নিরীশ্বর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কর্মকাণ্ড কদাচার ও অর্থহীন লোকাচারের আবর্জনায় সমাবৃত হইয়াছিল। দেব-দেবীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, উপদেবতা, অপদেবতা ও গ্রাম্য দেবতাও অনেক জুটিয়াছিলেন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে কর্মধ্বজিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ধর্মপ্রাণতা ছিল না। প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা ও কামকাঞ্চনাদির আশায় এই সকল ধর্মকর্ম বা ধর্মবাণিজ্য সম্পন্ন হইত। এ সকলে ভগবদ্ভক্তির কোনও সম্পর্ক ছিল না। সমাজে উচ্চবর্ণের জাত্যভিমান নিম্নবর্ণসমূহকে নানাভাবে নির্যাতিত ও ব্যথিত করিতেছিল।

দেখা গিয়াছে, এই পুণ্যভূমিতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া যুগোপযোগী ধর্ম সংস্থাপন করেন। এই মধ্যযুগেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই যুগে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহু ভক্ত সাধক আবির্ভূত হইয়া ভক্তিহীন জ্ঞানকর্মের স্থলে বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

এই ভক্তিবাদের কেন্দ্র ছিল প্রধানত দক্ষিণ ভারতে। 'গুরু রামানন্দ দক্ষিণের দীক্ষা উত্তরে লইয়া আসিলেন। তিনি সংস্কৃত ছাড়িলেন—জাতিনির্বিশেষে নিজ ভাষায় জ্ঞানভক্তি উপদেশ করিলেন। নবযুগের আরম্ভ হইল।' ইহার ফলে আবির্ভূত হইলেন রবিদাস, কবীর, নানক, দাদু প্রমুখ সমন্বয়পন্থী সাধকের দল। অসংখ্য সাধক এই কয় শতকে আবির্ভূত হইয়া সমন্বয়মূলক উদার ভক্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই যুগে সাধনার অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, সাধকদের মধ্যে অনেকেই সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন। রবিদাস ছিলেন মুচি, কবীর জোলা, নানক শস্যবিক্রেতার ছেলে, দাদু তূলাধুনকর। আর এই সব সাধকেরা অনেকেই নিরক্ষর ছিলেন এবং প্রায় সকলেই সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন। এই সব উপদেশ কবিতায় লেখা। সাধকদের অনেকেই সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। সংস্কৃতের আভিজাত্য বর্জন করিয়া জনসাধারণের ভাষায় সহজ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া এই সাধকগণ ধর্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা সাধারণ মানুষের মনের আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের শিক্ষা— মানুষে মানুষে জন্মে-জাতিতে ভেদ নাই, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, মানুষের সেবা করিয়া, সকল কুসংস্কার ও আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর ছাড়িয়া দিয়া, সহজভাবে সেই প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই প্রকৃত ধর্ম।

১২শ শতাব্দীর পূর্বে ভক্তিবাদের প্রচার দক্ষিণ ভারতের আলবারগণ করেন। দ্বাদশ আলবারের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তথাকথিত নিচ জাতীয়, একজন ছিলেন পারিয়া নারী। 'পঞ্চম আলবার ডোমজাতীয় শঠকোপের 'তিরু বায়মোলি' বা মুখের বাণী বেদের অপেক্ষা বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে অধিক সমাদৃত, ইহার পর নাথমুনি, যমুনাচার্য এবং পরে রামানুজাচার্যের আবির্ভাবে ভক্তিধারা অব্যাহতভাবে চলে। 'জাতি-বিচারশাসিত দক্ষিণ দেশে দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য বিষ্ণুভক্তি বিলাইয়া নিচ জাতিকেও উচ্চ করিয়া তুলিলেন এবং দেশীয় ভাষায় লিখিত শঠকোপ রচিত তিরু বায়মোলি (Tiru Vaymoli) প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রকে বৈষ্ণবের বেদ বলিয়া আশ্রয় করিলেন।'

ইহার পর মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক প্রমুখ আচার্যগণ ভক্তির বাণী লইয়া আবির্ভূত হন। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বমতের অনুবর্তী (৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আসামের শঙ্করদেবের মহাপুরুষিয়া মতও ভক্তিপ্রধান। শঙ্করদেব নিজে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার মতও অনেক উদার। তাঁহার নাগা মিকির ও মুসলমান শিষ্য ছিল। মহারাষ্ট্রের তুকারাম, নামদেব ও রামদাস বড় ভক্ত সাধক ছিলেন। তুকারাম ছিলেন

শূদ্র, নামদেব দরজি। উত্তর প্রদেশের ভক্ত তুলসীদাস ষোড়শ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ও কবি। তাঁহার রামায়ণ ভক্তিরসের আকর। তুলসীদাস রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, রামানন্দই ভক্তির ধারা জনসাধারণের মধ্যে আনয়ন করেন এবং তাহাই বহু ভক্ত সাধকের মধ্য দিয়া সর্বত্র পরিবেশিত হয়। রামানন্দের উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্ম নন, তিনি প্রেমময়। প্রেমই মানুষকে মানুষের নিকটে আনে, প্রেমই মানুষে-মানুষে সকল ভেদ বিদূরিত করে। একটি কথা আছে—

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামনন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড।।

'ভক্তি উপজিল দ্রাবিড়ে, এদেশে আনিলেন রামানন্দ। কবীর তাহা সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করিলেন।'

রামানন্দ সংস্কৃত ছাড়িয়া চলিত হিন্দী ভাষায় উপদেশ দিতেন। তাঁহার প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে রবিদাস ছিলেন মুচি, কবীর ছিলেন জোলা। তথাকথিত নিচ জাতীয় শিষ্য তাঁহার আরো অনেক ছিলেন।

রবিদাস কাশীর এক মুচির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এত বড় সাধক হইয়াও তিনি নিজের ব্যবসা ত্যাগ করেন নাই। পরশমণি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সকল বর্ণের মধ্যেই তাঁহার শিষ্য ছিল। চিতোরের রানী ঝালী তাঁহার শিষ্যা হন। ব্রাহ্মণগণ অনেক চেষ্টা করিয়া রবিদাসকে জব্দ করিতে পারেন নাই। মীরাবাঈও নাকি রবিদাসের শিষ্যা ছিলেন। রবিদাসের উপদেশ বড়ই উদার ও প্রেমপূর্ণ। শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবে তাঁহার অনেক উপদেশ সংকলিত হইয়াছে। রবিদাসের একটি বড় গুণ ছিল লোকসেবা। সাধু সমাগমে বা তীর্থস্থানে তরুণ ভক্তদের লইয়া রবিদাস সকলের সেবা করিতেন। যুবকগণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। রবিদাস ছিলেন—

জহঁ জহঁ জাউ তুম্‌হারী পূজা।
'যেখানে যাই সেখানেই দেখি তোমার পূজা চলিয়াছে।'
সব ঘট অংতর রমসি নিরংতর মৈঁ দেখন নহিঁ জানা।
'সকল ঘটে তুমি নিরন্তর বিরাজমান। আমিই তোমাকে
দেখিতে শিখি নাই।'
চলত চলত মেরো নিজ হন থাক্যৌ অব মোসে চলা ন জাঈ।
'তাঁহার জন্য চলিয়া চলিয়া আমার নিজ মন ক্লান্ত হইয়াছে—

আর তো ঘুরিয়া মরা যায় না।'

জা কারণ মৈঁ দূর ফিরতো সো অব ঘট মেঁ পাঈ।

'যাঁহার জন্য দূরে দূরে ঘুরিয়া মরিয়াছি তাঁহাকে এখন এ ঘটের মধ্যেই পাইলাম।'

কবীর চলিত হিন্দী ভাষাতেই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহ্‌তা নীর।

'হে কবীর সংস্কৃত কূপজল, ভাষা হইল প্রবহমান জলধারা।'

কবীরের ভাষা শুধু সহজ সরল নয়, শুধু তত্ত্বকথায় পূর্ণ নয়, তাহা অনুপম কাব্যময়। এমন কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এমন গভীর তত্ত্ব-উপদেশ বিরল। উহা শুধু পদ্য নয়, যথার্থই কাব্য; যেমন, এযুগের শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অপূর্ব কবিত্বময়। কবীর সুগায়ক ছিলেন, তাঁহার উপদেশগুলিতেও বহু গান আছে।

কবীর বলিতেছেন—

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ
ঔর মুলুক কেহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা।।
পূরব দিশা হরিকো বাসা
পশ্চিম অল্‌হ মুকামা।
দিলমেঁ খোজি দিলহিমা খোজো
ইঁহে করিমা রামা।।
জেতে ঔরত মরদ উপানী
সো সবরূপ তুম্‌হারা।
কবীর পোংগরা অল্‌হ রামকা
সো গুরু পীর হমারা।।

'খোদা যদি মসজিদেই করেন বাস, আর সব মুলুক তবে কাহার? তীর্থে মূর্তিতে যদি রাম করেন বাস, বাহির তবে দেখে কে?

'পূর্বদিকে হরির বাস, পশ্চিম দিকে আল্লার মোকাম? হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ। এইখানেই করীম ও রাম।'

'যত নারী যত পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সবাই তোমার রূপ। কবীর আল্লা-রামের পুত্র; তিনি আমার গুরু, তিনি আমার পীর।'

জো জানহু জীর আপনা
করহু জীরকো সার।
জিয়রা ঐসা পাহুনা
মিলৈ ন দূজী বার।।

'আপন বলিয়া যদি জান জীবকে, তবে জীবকে লও সার করিয়া। জীবের মত অতিথি আর তো দ্বিতীয় বার মিলে না।'

'কবীরের উপদেশের মোট কথা এই—সত্যের জন্য ধর্মের জন্য সব কৃত্রিম বাধা পরিত্যাগ করিয়া সত্য হও, সহজ হও। সত্যই সহজ। তীর্থে ব্রতে আচারে, তিলকে মালায় ভেখে সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নাই। সত্য আছে অন্তরে, তার পরিচয় মিলে প্রেমে ভক্তিতে দয়ায়। কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না, হিংসা করিবে না, প্রতি জীবে ভগবান বিরাজিত। বিভিন্ন ধর্মের নামভেদের মধ্যেও সেই এক ভগবানের জন্য একই ব্যাকুলতা—কাজেই ঝগড়া বৃথা। হিন্দু-মুসলমান বৃথাই এই ঝগড়া করিয়া মরিল।'

নানক ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের নিকট তলরণ্ডীতে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের পিতা শস্য-বিক্রেতা ছিলেন। নানকের সহিত কবীরের সাক্ষাৎ হয় এবং নানক তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হন। নানক বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বাগদাদেও গিয়াছিলেন। নানক সাম্প্রদায়িকতা, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, প্রেমের পথে আত্মত্যাগই সাধনার মূলকথা। নানকের উপদেশগুলির অনেকই গান। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বাণী পাঞ্জাবীমিশ্রিত হিন্দীতে রচিত।

দাদূ তূলাধুনকর ছিলেন। ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজপুতানার নরানায় তিনি দেহত্যাগ করেন। ইনি সকল ধর্মের মিলন সাধনের জন্য ব্রহ্ম সম্প্রদায় স্থাপন করেন। হিন্দু-মুসলমানকে এক উদার মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিবার বাণী তিনি প্রচার করেন। তিনি বলিয়াছেন—'শাস্ত্রাপেক্ষা আত্মানুভবই বড়। অহমিকা ত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকলকে ভাই-বোনের মত দেখিবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। অন্তরেই ভগবানের ধাম, প্রেমেই সেখানে তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভক্তিতে ঈশ্বরের সহিত মুক্ত হইবে। তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা না করিয়া বরং তাঁর বিশ্বসেবার সঙ্গে নিজ সেবা মিলাইলে যোগ গভীরতর হইবে। নম্র, নিরভিমান, দয়ালু, সেবাপরায়ণ হইবে। নির্ভয় হইবে, উদ্যমী বীর হইবে। সম্প্রদায়বুদ্ধি ত্যাগ করিবে।'

দাদূর প্রার্থনাগুলি মধুর ও গভীর। ইনিও কবীরের ন্যায় গৃহী ছিলেন। কবীরের ন্যায় দাদূরও হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতীয় শিষ্যই ছিল। তাঁহার শিষ্য জগন্নাথ ও রজ্জব তাঁহার বাণী সংগ্রহ ও ভাগ করেন।

রজ্জবের বাণী ও প্রার্থনা ভাবের গভীরতায় ও রচনাসৌষ্ঠবে অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'জগতের কোন সাহিত্যে এমন গভীর ও মধুর প্রার্থনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' রজ্জব বলেন—

'জীবনের সব দিককে সব ভাবকে পূর্ণ করিয়া সাধনা পূর্ণ কর। বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করে, তার দুই একটাকে প্রবল করিতে অন্যগুলিকে মারিয়া খাওয়ায়, তেমনি সাধনায় যদি একটি দুইটি ভাব পুষ্ট করিতে জীবনের অন্য ভাবগুলিকে বধ করা হয়, তবে বাঘ-বিড়ালের সাধনাই হয়। দয়া পুষ্ট করিতে গিয়া কেহ যদি পৌরুষ নষ্ট করিয়া ক্লীব হইয়া যায়, তবে সে সাধনার বলিহারী। বীরদের উপরেই সংসারের সব নূতন সৃষ্টির ভার। কাপুরুষেরা জগতে কী সৃষ্টি করিতে পারে?'

'যত মনুষ্য তত সম্প্রদায়। এমনি করিয়াই বিধাতা বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছিলেন। অথচ সকলের সব প্রণতি মিলিয়া একটি মহাপ্রণতিধারা হরিসাগরের দিকে চলিয়াছে।'

'নারায়ণের পদোদ্ভবা গঙ্গা। প্রতি ভক্তের হৃদয়ে যদি ভগবানের চরণ থাকে, তবে সকল হৃদয় হইতে একটি একটি ভাবগঙ্গা বাহির হয়। জগতের এই সকল গঙ্গাকে মিলিত করিয়া যে মহাতীর্থ হয় সেখানে স্নানেই মুক্তি।'

'প্রতি বিন্দুতে সিন্ধুর ডাক আছে। তবু একটি বিন্দু সাগরের দিকে রওনা হইলে পথেই সে শুকাইয়া মরিবে। সকল বিন্দু একত্র হইলে যে ভক্তির গঙ্গা হয় তাহাতে পথের সব বাধা ও শুষ্কতা দূর হইয়া যায়। জগতের সকল ভাবের ধারা একত্র করিয়া মানবের সব শুষ্কতা দূর কর।'

মধ্যযুগের অসংখ্য ভক্ত ও সাধকের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ এখানে করিলাম। জগতে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার সেই প্রাচীন ধারাই ইঁহাদের মধ্যে নব সমাজব্যবস্থার নব রূপে বহমান রহিয়াছে।

এই প্রবন্ধের উপাদান ও উদ্ধৃতিগুলি ক্ষিতিমোহন সেন-প্রণীত 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক ভারতের বাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

মত-পথ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার সাকার বিগ্রহস্বরূপ। যে তাঁকে নমস্কার করবে সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। —স্বামী বিবেকানন্দ

'I am bringing to Europe, as yet unaware of it, a new message of the Soul, the symphony of India bearing the name of Ramakrishna.....who was the consummation of two thousands years of the spiritual life of three hundred million people.' —Romain Rolland

উপরি-উদ্ধৃত উভয় উক্তিতেই বলা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণে অতীত ভারতের যাবতীয় অধ্যাত্মচিন্তার একত্র সমাবেশ। এ কথাটির মর্ম বিশদভাবে বিস্তার করিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তকও পর্যাপ্ত হইবে না। যেমন বহুমখী প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, তেমনি বহু-বৈচিত্র্যপূর্ণ আধুনিক ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা।

বেদান্ত-শাস্ত্রেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা চরমে উঠিয়াছে। কিন্তু বেদান্তে যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে সে বস্তুটির স্বরূপ কী, তাঁহার সহিত জীব-জগতের সম্পর্ক কী, তাঁহাকে কীরূপে ভাবনা করিতে হয়, কীরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়, এ সকল বিষয়ে ঋষি-শাস্ত্রের এবং শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতৃগণের চিন্তা-ধারা বহু-বিচিত্র।

নির্গুণস্বরূপে ব্রহ্মবস্তু মনোবাক্যের অগোচর, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ সত্তামাত্র—'সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং'—যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে—'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' সগুণবিভাবে তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ, ক্রিয়াশীল, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, লীলা-বিলাসী—এই লীলা জগৎ-লীলা। আবার তাঁহার অবতার-লীলাও আছে, সে লীলায় তিনি যুগ-প্রয়োজনে ধর্ম-সংস্থাপনার্থ দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, নিরাকার হইয়াও সাকাররূপে

প্রতীয়মান হন। তাই পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন—'নির্গুণশ্চ নিরাকারঃ সগুণঃ সাকারঃ স্বয়ং।' শ্রুতিও বলেন, ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত ও অমূর্ত— 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ'।

ভারতীয় ধর্ম-চিন্তার আর একটি বিশিষ্ট প্রকাশ ব্রহ্ম-শক্তির ধ্যান-ধারণা ও উপাসনায়। শক্তি ও শক্তিমান এক, শিব-শক্তি এক, কেবল তাহাই নয়, শক্তি ব্যতীত শিব স্পন্দন করিতেও অসমর্থ, —'ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি'—সুতরাং শক্তিই উপাস্যা—'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—যিনি দুর্গতি-নাশনে দুর্গা, ভোগে ভবানী, জগৎরক্ষায় জগদ্ধাত্রী, প্রলয়ে মহাকালবক্ষে নৃত্যপরা করালী কালী।

পর-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন ধারণাবশত বিভিন্ন সাধন-প্রণালীরও উদ্ভব হইয়াছে—যেমন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ। ইহার প্রত্যেকটিরই অবান্তরভেদ আছে, —সকাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম, আত্মসংস্থযোগ, নির্গুণ, কূটস্থ অক্ষর চিন্তা, বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি, শক্তি-পূজা ও সাকারোপাসনা, নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল আপাত-বিরোধী ভাবধারা ও সাধন-প্রণালীর সমাবেশ একাধারে সম্ভবপর হইতে পারে, ইহা কি কল্পনা করা যায়? এ সকল সম্পর্কে তো মতভেদ, বাদ-বিতণ্ডা, বিচার-বিতর্কের অবধি নাই।

থাকুক এখন বিচার-বিতর্ক, শুনি ঠাকুর কী বলেন—

'আমার ভাব কী জানো? আমি নিত্য, লীলা—দুই-ই লই*। চোখ চাইলেই কী তিনি আর নেই। সব মতই সেই এককে নিয়ে। একঘেয়েকে নিয়ে নাই। তাই আমি শাক্তেও আছি, বৈষ্ণবেও আছি; বেদেও আছি, বেদান্তেও আছি। রাম শিবকে পূজো করেছিলেন, শিব রামকে। কৃষ্ণ স্তব করেছিলেন কালীকে, আবার কৃষ্ণই কালীরূপ ধরেছিলেন। আমি সব ঘাটে আছি, সব সংঘটে। শুধু অকপট হ'লেই হলো।

আকারে যে অনাকারেও সে। কিম্বা বলো, আকার নিরাকার আমার বাপ-মা। বাপ নির্গুণ, মা গুণান্বিতা। কাকে নিন্দা করে কাকে বন্দনা করবে, দুই পাল্লাই সমান ভারি।

---

* নিত্য--The Absolute; লীলা—The Relative phenomenal world.

নির্গুণ মেরা বাপ সগুণ মাহ্‌তারি,
কারে নিন্দো. কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি।

যে সমন্বয় করেছে সে-ই লোক।

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে। যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে। তুমি এটা বুঝেছ? (কেশবের প্রতি)।

কেশব (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)। হ্যাঁ, বুঝেছি।

দুধ কেমন, না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না।

তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী, কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু।

যেমন, জল, ওয়াটার, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে জল। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে পানি। আর এক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তারা বলে ওয়াটার। তিনই এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ গড্‌, কেউ ব্রহ্ম, কেউ কালী; কেউ বলছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা।

যত মত তত পথ। কিন্তু পথটাই পৌঁছোন নয়। যদি ভুল পথেও যাও, ঘুর-পথেও যাও, অন্তরে যদি অসরল না থাকে, তবে সে পথেও একদিন সোজা পথ হয়ে যাবে।

আমার সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বরই—তাঁর কাছেই সকলে আসছে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। —গীতা ৪।১১

মনুষ্যগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌঁছোতে পারে।

শ্রীগীতাগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কথাটি বলিয়াছেন, অধুনা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে বিভিন্ন সাধনপথ অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাহার সত্যতা প্রদর্শন করিলেন।

যত মত তত পথ, এই মহাবাক্যটি ধর্ম-জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্তব্য, জগতের যাবতীয় গির্জা, মসজিদ, মঠ, মন্দিরে প্রস্তর-ফলকে উহা খোদিত করিয়া রাখা কর্তব্য।

এখনও জগতে ধর্মমত লইয়া মানুষে মানুষে ভেদ-বিদ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ যথেষ্টই আছে। জগতের আর কোনও ধর্মগ্রন্থে, কোনও ধর্মাচার্যের মুখে এমন সার্বজনীন উদার ধর্মমত কখনও ব্যক্ত হইয়াছে কি?

ভারতবর্ষও, হিন্দু ভারতও বিভিন্ন মতাবলম্বী পরস্পর বিবদমান ধর্ম-সম্প্রদায়ে বহুধা-বিভক্ত। এই বঙ্গদেশে এক সময়ে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ অতি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। পরস্পর রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি, তর্কাতর্কি, গালাগালি সততই চলিত। এই সকল বাগ্‌যুদ্ধে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা অনেক সময়ই শীলতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। একবার এক পণ্ডিত নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তিকা লিখিয়া উহার নাম দিলেন 'দুর্জনমুখচপেটিকা'। অপর পক্ষ উহার প্রত্যুত্তরে দুইখানি পুস্তক লিখিলেন এবং উহাদের নাম দিলেন— 'দুর্জনমুখমহাচপেটিকা', 'দুর্জনমুখপাদুকা'।

বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতনের ফলে এ দেশে নানা উপধর্ম ও অপধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রচলিত শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মেরও বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। লৌকিক হিন্দুধর্ম অন্ধ-কুসংস্কার, অর্থহীন লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচারের আবর্জনাস্তূপে সমাবৃত হইয়াছিল।

এমন সময় আসিলেন ইংরেজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার চমকপ্রদ খবর ও প্রচারধর্মী খ্রিস্টিয় মিশনারী দল লইয়া। ইহারা হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের উপর প্রবল আক্রমণ চালাইলেন। খ্রিস্টান আদি সুসভ্য জাতি সকলেই একেশ্বরবাদী, নিরাকারবাদী; আর অসভ্য হিন্দুরা বহু দেবোপাসক, মূর্তিপূজক, পৌত্তলিক। এই সকল নিন্দাবাদে বিভ্রান্ত হইয়া ইংরেজি শিক্ষিত নব্যযুবকগণ আস্থা হারাইল, এবং উচ্ছৃঙ্খল নাস্তিক হইয়া পড়িল, অনেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে মহামনস্বী যুগ-মানব রামমোহন খ্রিস্টান পাদ্রীদিগের সম্মুখীন হইলেন বেদান্তের ব্রহ্মবাদ লইয়া। তিনি এদেশে লুপ্তপ্রায় বেদান্ত গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করিলেন এবং তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—আমরা বহু ঈশ্বরের উপাসনা করি না, আমরাও একেশ্বরবাদী, নিরাকারবাদী, আমাদের উপাস্য—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ব্রহ্মসভা স্থাপিত করিলেন, উহাই কালে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল। পাদ্রীদিগের আক্রমণ প্রতিহত হইল, কিন্তু এক্ষণে আবার ইংরেজি শিক্ষিত মনস্বী ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-সমাজের চমক ভাঙ্গিল। ব্রাহ্মমতের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সুপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, সুবক্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। তৎকালের সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এই আন্দোলনের মুখপত্ররূপে সুপ্রচলিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সাকার-নিরাকারবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত সমাধান তো বক্তৃতা-মঞ্চের চিৎকারে বা সাপ্তাহিকের বিষোদ্‌গারে হয় না, উহা সাধনাসাপেক্ষ। সে সাধনা হইতেছিল দক্ষিণেশ্বরে। অতি বিচিত্র সে সাধনা। সে সাধনার সাধ্য বস্তু সাকার, সগুণ, নিরাকার, নির্গুণ, সবই। ভক্তিযোগে মূর্তি-পূজায় উহার আরম্ভ, জ্ঞানযোগে নির্বিকল্প সমাধিতে উহার পরিণতি, আবার ভক্তিপথেই স্থিতি, সকল পথের, সকল মতের সমন্বয়ে উহার পরিসমাপ্তি।

খ্রিস্টিয়াদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, অমনি হিন্দুর সাকারোপাসনা অগ্রাহ্য অপাংক্তেয়, হেয় হইয়া গেল। হিন্দুশাস্ত্রও বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, কেবল নিরাকার নন, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধি—যাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের শেষ কথা, যাহা অচিন্ত্য—নেতি নেতি করিয়া তথায় পৌঁছিতে হয়। ঠাকুর ইহাকেই বলিতেন নিত্য। আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃরূপ ব্রহ্মের যে সগুণ বিভাব তাহাকে বলিতেন লীলা। যিনি সগুণ, তাহার রূপও কল্পনা করা যায়, কেননা রূপও একটা গুণ। ঠাকুর নামরূপের ধ্যানে মৃণ্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ীকে সন্দর্শন করিয়া কালী ব্রহ্ম, কালী ব্রহ্ম বলিয়া অর্চনা বন্দনা করিতেন, আবার আত্মসংস্থ যোগে নামরূপের অতীত নির্বিকল্প ভূমিতে সমারূঢ় হইয়া ভূমানন্দে মগ্ন হইতেন। এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতেই তিনি বলিতেন—আমি নিত্য, লীলা দুই-ই লই।

প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার-নিরাকার বা দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, এক সাধকের পক্ষে দুইটিই যুগপৎ ধারণা কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যে মন নামরূপের ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত, দ্বৈত ভূমিতে ভাব-ভক্তির সাধনায় অভ্যস্ত, তাহা নামরূপের অতীত অদ্বৈতভাবভূমিতে উঠিবে কীরূপে? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে ইহা অসম্ভব হয় নাই যদিও প্রথমে অনেক বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি। ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট বেদান্ত-সাধনার দীক্ষালাভ করেন, ইহাকে তিনি 'ন্যাংটা' বলিতেন। এই সাধন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—
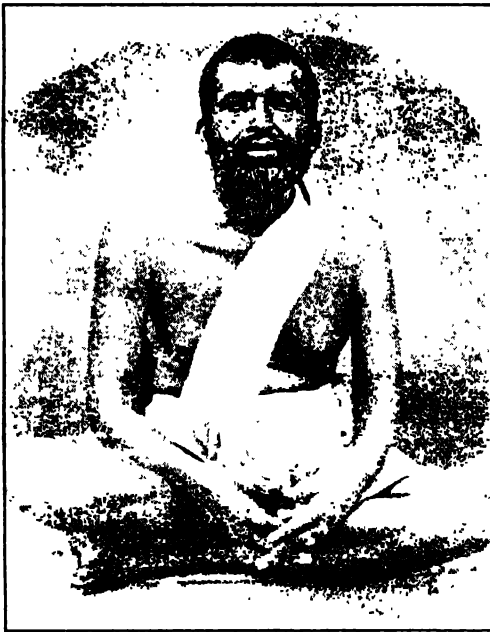
'দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্ত বাক্যের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু এরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চির-পরিচিত চিৎঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি ঐরূপ হইতে লাগিল তখন নির্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মিলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও হোগা নেই' অর্থাৎ, কী হইবে না, এমন কথা? এই বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিয়া এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন।' তখন পুনরায় দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং জগদম্বার মূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে

উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহাদ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হুহু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।'

ঠাকুর সমাধিস্থ হইলে গুরু নিকটেই পঞ্চবটীমূলে আসন পাতিয়া শিষ্যের ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। দিন গেল, রাত্রি আসিল, রাত্রিও গেল, দিন আসিল, ধ্যান ভঙ্গ হইল না।

এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল, তখনও শিষ্য সমাধিস্থ। তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া গুরু চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'—বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল—নির্বিকল্প সমাধি এক দিনে আয়ত্ত হইয়াছে, দেবতার কী অদ্ভুত মায়া! তারপর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবার জন্য শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়াদি আরম্ভ করিলেন।

এই গুরু-শিষ্য সম্পর্কটি কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক, তাহা হইলে কে গুরু, কে শিষ্য, তাহা বুঝা যাইবে।

সকল সাধনারই মূল কথা হইতেছে, প্রকৃতি বা মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, মোক্ষলাভ বা ভগবানের স্থিতি লাভ করা। এই মায়াত্যাগের উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ধর্মোপদেষ্টৃগণ দুই রকম কথা বলেন। কেহ বলেন—মায়া হইতেছে অজ্ঞান ('অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'), জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান বা মায়া দূর হয় না, মোক্ষ লাভও হয় না। মোক্ষ বিষয়ে জীবের আত্মস্বাতন্ত্র্য আছে, সে সদ্গুরুর আশ্রয়ে আত্মপ্রযত্নে আত্মসংস্থ যোগে বা আত্মানাত্ম-বিবেক বিচারদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ইহাই জ্ঞানমার্গ। ইহা পুরুষকার-সাপেক্ষ। পুরুষকারের প্রতিমূর্তি জ্ঞানগুরু ভগবান বশিষ্ঠদেব এই মার্গেরই উপদেশ দিয়াছেন এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করা অজ্ঞানতার ফল, এই কথা বলিয়াছেন।

'যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যাদ্দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষেঽভিবাঞ্ছতি।।'

—'হে রাম, যাবৎ বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্তই লোকে মূর্খতাবশত ভক্তিদ্বারা মোক্ষ লাভের বাঞ্ছা করিয়া থাকে—(যোঃ বাঃ)।

পক্ষান্তরে, ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মের উপদেষ্টা ভগবান ব্যাসদেব সর্বত্রই ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভক্তিদ্বারাই ভগবৎকৃপায় জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানেই মোক্ষ, সুতরাং ভক্তিই মোক্ষদায়িনী—'ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।' (অধ্যাত্ম রামায়ণ, যুদ্ধ ৭, অরণ্য ১০)। শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের

স্পষ্ট উক্তি আছে, 'আমার মায়া সুদুস্তরা, যাহারা আমার শরণ লয় মাত্র তাহারাই মায়া অতিক্রম করিতে পারে।' ইহাই ভগবৎ শরণাগতি, কৃপাবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ একান্তভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতার শরণাগত তাঁহার এই বেদান্তী গুরুটি কিন্তু ছিলেন বশিষ্ঠদেবের খাঁটি শিষ্য। তিনি ভক্তি জানিতেনও না, মানিতেনও না।

একদিন সন্ধ্যা বেলা ঠাকুর দুই হাতে করতালি দিতে দিতে হরিনাম করিতেছিলেন, পুরীজী উহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, বেদান্তমার্গের এমন উচ্চ অধিকারী, তিনদিনেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে আবার এসব কী? প্রকাশ্যেই উপহাসচ্ছলে বলিয়া ফেলিলেন—'আরে কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো? পশ্চিমাঞ্চলে লোকে অনেক সময় আটার তাল দুই হাতে লইয়া চাপড়ে চাপড়ে রুটী তৈরি করে। পুরীজী তাই বলিলেন, তুমি বেদান্তজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করিয়া এখন হাত চাপ্‌ড়ে রুটী তৈরি করছ নাকি? ঠাকুর হাসিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ভাষায় বলিলেন—'দূর শালা, আমি ঈশ্বরের নাম করছি দেখ্‌ছ না?' পুরীজী বলিলেন, 'ঈশ্বরের নাম করছ তো, হাতে তালি দিচ্ছ কেন?' ঠাকুর বলিলেন—'যে দেওয়াচ্ছে সে-ই জানে, ও সব তুমি বুঝবে না, তুমি ব্রহ্ম নিয়েই আছ, কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী যে ব্রহ্মশক্তি তার খবর তো তুমি রাখ না, ভাব-ভক্তিও বুঝ না।'

গুরু-শিষ্যে এইরূপ ঠোকাঠুকি প্রায়ই হইত। কিন্তু পুরীগোস্বামী শক্তি-ভক্তি বুঝেনও না, মানেনও না। ঠাকুর বলেন, 'মা যখন মানাবেন, তখন মানবে।'

ইহার পরে গোস্বামিজী কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর এবং মথুরবাবু ঔষধপত্র ও সেবাশুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ব্যাধির উপশম হইল না, রোগযন্ত্রণা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে রোগ বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোস্বামিজী নিজের শরীরের উপরে বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন—এ হাড়মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আর আমার বশে নাই। এ পচা শরীরটার সঙ্গে থাকিয়া কেন এত যন্ত্রণা অনুভব করি! আজই এখনই ইহাকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করি। এই ভাবিয়া তখনই তিনি গঙ্গার জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই অগ্রসর হন জল কোথাও তাঁর জানুদেশ অতিক্রম করিয়া উঠে না। ক্রমে তিনি প্রায় অপর তীরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তীরবর্তী বৃক্ষাদিও রাত্রির অন্ধকারে ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ভাগীরথীতে কোথাও আজ ডুব-জল মিলিল না। পুরীজী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বরের এ অপূর্ব লীলা? অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তাঁহার অন্তশ্চক্ষু উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল, তিনি দেখিলেন—মা, বিশ্বজননী মা, শক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা, শরীর মা, মন মা—মা, মা, মা। যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি সবই মা—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। তিনি ধীরে ধীরে জল ভাঙিয়া ফিরিয়া আসিলেন, পঞ্চবটীতলে নিজাসনে বসিয়া অবশিষ্ট রাত্রি জগদম্বার ধ্যানে কাটাইলেন।

প্রত্যুষে ঠাকুর অসুস্থ গুরুর শারীরিক অবস্থা জানিতে আসিয়া দেখেন, লোকটি যেন এক রাত্রিতেই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন। মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, রোগ-যন্ত্রণা কিছুই নাই। গুরু তাহাকে নিকটে বসিতে বলিয়া রাত্রির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, 'রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম।' ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'মাকে যে আগে মানতে না, শক্তি মিথ্যা, ঝুটা বলে আমার সঙ্গে তর্ক করতে, এখন তো দেখলে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বে বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি।'

এই গুরু-শিষ্য সংবাদ পাঠে বুঝা গেল, কে গুরু, কে শিষ্য। আরও বুঝা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণে একাধারে ব্যাস-বশিষ্ঠের একত্র সমাবেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-লীলা অতি অপূর্ব। সকল সাধকই কোনও একটি মাত্র মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। উহাতেই তাঁহার সাধক-জীবন শেষ হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করিবার পরেও, ঈশ্বর দর্শনের পরেও বিবিধ মার্গ অবলম্বন করিয়া বহুকাল সাধন করিয়াছেন। তাঁহাকে এই সকল সাধনে ব্রতী দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণও অনেকে মনে করিতেন, সিদ্ধিলাভের আর বাকি কী আছে? আবার এ সকল সাধন কেন? তাঁহার সাধন সম্বন্ধে ভক্ত-মণ্ডলীর মনে এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহা ঠাকুরের অবিদিত রহিল না। তাঁহারা সমবেত হইলে তিনি একদিন কথায় কথায় হঠাৎ বলিলেন—'সাধারণ নিয়মে গাছে ও লতায় আগে ফুল পরে ফল ধরে, কিন্তু কোনও কোনওটি এমন আছে, যাতে আগেই ফল দেখা দেয়, তারপর ফুল ধরে।'

ফুল ফোটে কেন? পরের জন্য। কথা এই, ঠাকুরের সকল সাধনাই লোক-শিক্ষার জন্য, নিজ প্রয়োজনে নয়। যে সাধনায় তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন পাইয়াছিলেন তাহাও লোক-শিক্ষার জন্য। তাহা শুদ্ধা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, ঈশ্বর দর্শনের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, কাতর ক্রন্দন, যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কীরূপে প্রার্থনা করিতে হয়—'মা, আমি

তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না, মা। লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অচলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন, মা তোমায় ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, তোমার মায়ায় সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভ কীরূপে ঘটিল সে সম্বন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখের কথাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

'মার দেখা পাইলাম না বলিয়া হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। জলশূন্য করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মার দেখা বোধ হয় কোনও কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় সহসা মা-র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কী যে হইয়াছে, কোন্ দিক্ দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে চলিয়া গিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু একটা জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা-র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিতেছিলাম।'

এই উপলব্ধি এবং নির্বিকল্প সমাধির উপলব্ধি কি এক! ঠিক তাহা নয়। নির্বিকল্প সমাধির অর্থ নির্গুণতত্ত্বে স্থিতিলাভ করা, পরব্রহ্মে লীন হওয়া। উহাতে 'আমি' জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা কিছুই থাকে না, দেহও বেশি দিন থাকে না। যে সাধক নির্বিকল্প সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াও জগৎকল্যাণার্থ দেহরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কিছু নিম্নে নামিয়া সগুণ বিরাট-ব্রহ্মভূমিতে অবস্থান করেন। এই অবস্থায় সর্বভূতে ব্রহ্মসত্তার অনুভব হয়, এই অনুভব হয় যে জগৎ ব্রহ্মময়, সর্বপ্রাণীতে, প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে সেই এক বস্তুই অনুস্যূত আছেন, তাহা ছাড়া কিছু নাই—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' ইহাও অদ্বৈতজ্ঞান, এ ভাবে ঠাকুর পূর্বাবধিই সিদ্ধ ছিলেন, তাই তিনি বলিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।' তিনি নারীমাত্রেই জগন্মাতাকে দর্শন করিতেন, সর্বজীবে শিবজ্ঞান করিতেন। একদিন কালীবাড়ীতে কাঙালি ভোজন হইয়া গেল তিনি যাইয়া কাঙালিদের উচ্ছিষ্টপত্র হইতে কিছু ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদ জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

'প্রতিমায় পূজা হয় আর জীবন্ত মানুষে হবে না? তিনিই তো মানুষ হয়ে লীলা করছেন।'

জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার,
তুই নতুন লীলা কী দেখাবি তাঁর নিত্যলীলা চমৎকার।

'তাঁকে সর্বভূতে দেখতে লাগলুম। বেলপাতা তুলতে গেলুম সেদিন। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখলুম গাছ চেতনাময়। মনে কষ্ট হল। ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।''

'দশভূজা, ষড়ভূজা, চতুর্ভূজা, দ্বিভূজা, আরো ছোট করে এক খণ্ড নুড়িতে ঈশ্বরকে এনে ফেলেছি—শালগ্রাম শিলা। তারপরে সমস্ত প্রতীকের বাইরে চলে গিয়েছি। সাকার ভূমি থেকে নিরাকারে চলে গেছি। কিন্তু তুমি (কেশব) কি ভেবেছ নিরাকারেই থেমেছি। নিরাকার থেকে আবার সাকারে ফিরে এসেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছি। নরাকারে নিরাকার।'

এই সর্বভূতে ভগবৎ-সত্তার অনুভূতি আর একদিন ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শ্রীমুখের একটি কথায় এমন সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল যে, উহাতেই তাঁহার পরমভক্ত সূক্ষার্থদর্শী ভাবী বিবেকানন্দের জীবন-লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া গুরুভ্রাতাদিগের নিকট বলিলেন, 'কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। ভগবান যদি কখনও দিন দেন, আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।'

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সেই সময় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুপম 'লীলা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

'কথা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠিল, এবং ঐ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিলেন, —তিনটি বিষয়ে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ ধর্মে উপদেশ করে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন।' যেই নাম সেই ঈশ্বর, নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধুভক্তদিগকে শ্রদ্ধা পূজা বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার এ কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্বজীবে দয়া (প্রকাশ করিবে)। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

'জীবে দয়া, জীবে দয়া, দূর শালা। কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

'ভাববিষ্ট ঠাকুরের এই কথা সকলে শুনিল বটে, কিন্তু তাহার গূঢ়মর্ম কেহই তখন বুঝিতে বা ধারণ করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব-ভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর, নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কী সহজ, সরস ও মধুর আলোকেই প্রদর্শন করিলেন। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্ঘ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া ফলে জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত একথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপ শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞান'-এ জীবের সেবা করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব কী নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিবে, ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বাহুল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে, তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞান'-এ জীবসেবা-রূপ

কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ভগবান যদি কখনও দিন দেন, আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য, সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।'

এস্থলে বেদান্ত-সম্বন্ধে ভাবী স্বামীজী যাহা বলিলেন এ কথাটি গভীর অর্থপূর্ণ। উহার সহিত বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জড়িত আছে।

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিতে দুইটি কথা আছে—

১। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

২। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এ সমস্তই ব্রহ্ম।

এই দুইটি শ্রুতিবাক্য সনাতন ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু ইহাদের ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকগণের মধ্যে মর্মান্তিক মতভেদ আছে। এই মতভেদ হেতু দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়ামিথ্যাত্ববাদ প্রভৃতি বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং রাশীকৃত ভাষ্য-গ্রন্থাদি প্রচলিত হইয়াছে। বেদান্ত বৃক্ষটি এই সকল টীকা-ভায্যের পর-বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন হইয়া এককালে অদৃশ্য-প্রায় হইয়াছিলেন। অনেক স্থলে ভাষ্যগ্রন্থই বেদান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান, নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করাই পরম নিঃশ্রেয়স, উহাই মোক্ষ। আত্মসংস্থ রাজযোগ বা আত্মানাত্মবিবেক বিচার দ্বারা জ্ঞানযোগে উহা লাভ করিতে হয়। ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ। উহার সহিত ভাব-ভক্তির কোনও সম্পর্ক নাই। কালে, এরূপ মতও বাহির হইল যে, বেদান্ত মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর ধর্ম, তপোবনে ব্রহ্মধ্যাননিরতি মুনিঋষির ধর্ম, উহা সাধারণের বোধগম্যও নয়, আলোচ্যও নয়। শ্রীগীতায় পূর্ববর্তী ধর্ম-সাহিত্য সম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক। এই সকল ধর্মপুস্তক এবং কুশাগ্রধী পণ্ডিতগণের ভাষ্য গ্রন্থাদিতে প্রবেশ করিলে জগৎটাকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত করিতে হয়, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া 'নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিতে' মনোনিবেশ করিতে হয় এবং ভাব-ভক্তি-ভালবাসা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহ হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে হয়।

মীমাংসকদিগের কর্মবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানযোগ, স্মৃতিশাস্ত্রের চতুরাশ্রম ব্যবস্থা এবং কর্মজ্ঞানের সমুচ্চয়ে চতুর্বর্গ সাধনা, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের কৈবল্য মুক্তি, এ সকলে কর্ম জ্ঞান ও যোগ-সাধনার কথা আছে, কিন্তু এ সকল শাস্ত্রে ভক্তির কোনও প্রসঙ্গ নাই। পরবর্তী কালে ভক্তির প্রবর্তনে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহাভারত এই পরিবর্তনযুগের গ্রন্থ এবং শ্রীগীতাতেও উল্লিখিত আছে (গীতা ১৩।২৪-২৫)। শ্রীগীতা ঐ সকল বিভিন্ন সাধন-

প্রণালীর যাহা সারতত্ত্ব তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার সহিত ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি যোগ করিয়া সনাতন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। এই পুস্তকে ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ('সর্বভূতস্থিতং যো মাং ইত্যাদি) শ্লোকটি এখানে পুনরুল্লেখ করিতেছি। এই শ্লোকটিতে বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞান, ভক্তের নিষ্কাম ভক্তি এবং কর্মীর সর্বভূতের সেবা—এই তিনটির একত্র সমাবেশ। শ্রীভগবান বলিতেছেন, ঈদৃশ যোগী যে ভাবেই থাকুন না কেন, তিনি সতত আমাতেই থাকেন। তিনিই তো পরমাত্মা, পরব্রহ্ম সুতরাং ইহা যোগীর যোগসিদ্ধিও। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান ও যোগতত্ত্ব ভক্তের নিকট বড়ই মধুর। ইহাই শ্রীগীতার মূল কথা। শ্রীগীতা ও উপনিষৎ, কার্যকরী বেদান্ত।

'যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বেদের একমাত্র টীকা, একমাত্র টীকাস্বরূপ গীতা একবার চিরকালের মত কৃত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকা-টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে।' —স্বামী বিবেকানন্দ

এই ধর্মই শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে প্রিয় শিষ্য উদ্ধবকে বিস্তৃত ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন (ভাঃ ১১ স্কন্ধ, ২৯ অঃ)। উহার কিয়দংশ এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে (৩৭-৩৯ পৃঃ), তাহা দ্রষ্টব্য। এই ধর্মোপদেশ প্রকরণ সমাপনান্তে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ইহা ভক্তিরূপ আনন্দ সমুদ্রের সহিত একীকৃত জ্ঞানামৃত, এবং এইরূপ স্তুতিবাক্যে এই ধর্মোপদেশ প্রকরণ সমাপন করিয়াছেন—

ভবভয়মপহর্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারং।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোস্মি।।

ভাঃ ১১।২৯।৪৯

—যিনি ভবভয় নাশ করিবার জন্য, ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প হইতে মধু উত্তোলন করে, তদ্রূপ বেদসাগর হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানময় বেদ-সার-সুধা উদ্ধার করিয়া ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন, সেই নিগমকর্তা কৃষ্ণাখ্য আদ্য পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।

এই বেদসার-সুধা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই বেদান্ত-মূল ভক্তিযোগের সারকথাটি এই—

'মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ' (৫০ পৃঃ)

—সর্বভূতে আমার অস্তিত্ব চিন্তা করিবে এবং কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের সেবা করিবে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও ঠিক তাহাই—শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা করিবে।

দেখিলাম, গুরুভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে অভেদ।

ভাবাবিষ্ট গুরুর এই বাক্যটি শ্রবণ করিয়া মর্মজ্ঞ ভক্ত বলিলেন—বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কী সহজ, সরস ও মধুর আলোকই ঠাকুর আজ প্রদর্শন করিলেন। যদি ঈশ্বর দিন দেন, আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব।

ঈশ্বর তো সেজন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট করিয়াই রাখিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। ভগবান শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট 'জীবে দয়া' ধর্মের ব্যাখ্যাকালেই সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'না, না, জীবে দয়া নয়, জীবের সেবা'। ঠাকুরের এ কথায় প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে অধিকতর শক্তি-সঞ্চারই করা হইল। জীবে দয়া, জীবে প্রেম, জীবের সেবা—এ সকল একই কথা, এক ভাবেরই বিভিন্ন বিকার। আমি জীবে দয়া করি, দান করি, ইত্যাদি কথায় আত্মাভিমানের গন্ধ থাকে, উচ্চ-নিচ ভেদজ্ঞান থাকে। ঠাকুর এ সব কথা মোটেই শুনিতে পারিতেন না, বলিতেন—তুই দয়া করিবার কে, বল্ সেবা করি।

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর রোগশয্যায় শায়িত। ঘরে একমাত্র নরেন্দ্রনাথ। আজ তাঁহার সংকল্প—যেমন করিয়াই হোক নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিতেই হইবে। ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন, তুই কী চাস্?'

নরেন্দ্র। শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই।

ঠাকুর। বার বার ঐ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? কোথায় কালে বটগাছের মত বর্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা না করে তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস! এত ক্ষুদ্র তোর আদর্শ।

নরেন্দ্র। নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না। আর তা যদি না হয়, তবে আমি ওসব কিছুই করিতে পারিব না।

ঠাকুর। তুই কি ইচ্ছায় করবি। জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে দেবেন। তুই না করিস্, তোর হাড় করবে।

অবশেষে ঠাকুর একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে।'

ইহার কিছুদিন পরে একদিন ধ্যানে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ গভীর সমাধিতে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিল। হৃদয় প্রশান্ত, বদনমণ্ডল ব্রহ্মজ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তিনি আসিয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণত হইলেন।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—'এখনকার মতে চাবি দেওয়া হইল। চাবি আমার হাতে, কাজ শেষ হলে তবে খুলে দেওয়া হবে।'

এদিকে ঠাকুর জগন্মাতার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—মা, ওর অদ্বৈতানুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ করে রাখ মা; আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ ভাগে ঠাকুরের রোগ ভীষণতর হইল। তখন অতি কষ্টে কথা বলিতে পারেন।

সেই অবস্থায় একদিন নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন 'নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইল। তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ওদের রক্ষা করিস, সৎপথে চালাস। আমি শীগগীরই দেহত্যাগ করবো।'

আর একদিন রাত্রে ঠাকুর সজল নয়নে চাহিয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, 'বাবা, আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম।' নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঠাকুরের লীলাবসানের কাল আগতপ্রায়। তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

ঠাকুর প্রিয়তম ভক্তকে সর্বস্ব দিয়া ফকির হইলেন। ভাবী বিবেকানন্দ যে ধনে ধনী হইলেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দ নিঃশেষে জনকল্যাণে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কার্য ছিল দ্বিবিধ—

১। আর্যঋষিগণ অধ্যাত্ম-সাধনা বলে যে অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, আত্ম-বিস্মৃত হিন্দু জাতিকে সে বিষয়ে সচেতন করা এবং লৌকিক হিন্দুধর্মের উপর যে আবর্জনাস্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা অপসারণ করিয়া উহার সত্যস্বরূপটি প্রদর্শন করা।

২। ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির বার্তা জগতে প্রচারিত করা।

বেদান্ত-বাণীই ভারতের শাশ্বত বাণী। বেদান্ত জ্ঞানের দুইটি দিক আছে—আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক।

জ্ঞানযোগে বা ধ্যানযোগে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করাই জীবনের লক্ষ্য, উহাই মোক্ষ। ইহা বেদান্তের আধ্যাত্মিক দিক।

ঈশ্বর বিশ্বাত্মা—সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সুতরাং সর্বভূতে প্রীতি, সর্বভূতের সেবাই ভগবৎ-প্রেম, ভগবানের সেবা। ইহা বিশ্বপ্রেমধর্ম, বিশ্বামানেবর ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধর্মই প্রচার করিয়াছেন। ইহাকে তিনি ব্যবহারিক বা কর্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedanta) বলিয়াছেন।

বিবেক-বাণী

জগদেকারাধ্য আচার্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতিসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বিশ্বমানবের প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ন তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দেশ করিতে পারি। —ভগিনী নিবেদিতা

নর-নারায়ণ পূজা ঃ বিশ্বপ্রেম

'শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্যসার,
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার,
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন।
ব্রহ্মা হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে

ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। শুধু তুলসীর পুজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে।

সকল উপাসনার সার শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধনা করা। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনি যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। যে ব্যক্তি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব—যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' হতে হবে। পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব', 'মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমাদের দেবতা হউক; ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব। বসন্তবল্লোকহিতং চরন্ত, —বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা, এই আমার ধর্ম।

প্রেমই জীবন—স্বার্থপরতাই মৃত্যু

'জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতির অর্থ হৃদয়ের বিস্তার; আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমেই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতি-নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু—জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও। এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুর স্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, একথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।'

'পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত—প্রেততুল্য। হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান হউক,

তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি সাহায্য আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও; এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি—এগিয়ে যাও; এখন একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস! ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে অল্পক্ষণের মধ্যে সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, বলেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না। ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রেই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।'

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ?

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস-সম্পন্ন হও। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব-শক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তিকে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন।

তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হইবে। আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা ব্রজের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।

কর্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedanta)

অদ্বৈতবাদই নীতি-তত্ত্বের ভিত্তি

কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অপরের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে, নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব? কারণ, কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমার প্রয়োজন কী? শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে—শাস্ত্রে বলুন না কেন—আমি উহা মানিতে যাইব কেন? আর ধর, কতকগুলি লোকে ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল---তাহাতেই বা কী। জগতের অন্তত অধিকাংশ লোকের নীতি এইটুকু যে—'চাচা আপনা বাঁচা'। তাই বলিতেছি, আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অদ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।' গীতা ১৩।২৮

অর্থাৎ 'ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা করে না।'

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকে হিংসা করিতেছ—কারণ তাহারা সকলেই যে 'তুমি'। অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য বাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, উহার কোনও হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্যন্ত দেখা গেল, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় একমাত্র সমর্থ।

আপনার উপর বিশ্বাস কর

কীরূপে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্যকরী নয় অর্থাৎ জড়জগতে এখনও উহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ কর, ---

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকাক্ষরং পরম্।
ওমিত্যেকাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।"

কঠোপনিষৎ ২।১৬

অর্থাৎ ওম্—ইহা মহারহস্য। ওম্—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওঙ্কার—তাহা জান। এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও, তখনই, কেবল তখনই, তোমরা যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়ত একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়ত পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়ে উহা হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব আপনার উপর বিশ্বাস কর। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিতে পার। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, কেবল যে সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্যবান হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায় এই। অতএব নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর যদি সাংসারিক ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, —তুমি মহামনীষী হইবে। আর যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর হইয়া যাইবে—পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন উহা কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—এই পর্যন্ত। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাতে রহস্য রাখিলে চলিবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট উহা আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্বত্র, এমন কী রাস্তার ভিখারী দ্বারাও ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, কিন্তু সত্যকথা বলিতে কী, আমাদের অপেক্ষা মার্কিনরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্মজীবনে কার্যকরী করিয়াছে।

আমাদের স্কন্ধে মহাপাপ

আমাদের এই দেশে, এই বেদান্তের জন্মভূমিতে আমাদের সাধারণ লোককে শত শত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এইরূপ অবনত ভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে

বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্য অন্ধকারে।' আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা ক্রমাগত ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে আরও গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে।

তোমরা এইটি বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ—এই বংশপরম্পরাগত ও জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে না পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মেলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার। এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে।

প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও

আবার সেই অদ্ভুত অদ্বৈত পতাকা উড্ডীন কর—কারণ, আর কোন ভিত্তিতেই তোমাদের ভিতর সেই অপূর্ব প্রেম জন্মিতে পারে না—যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবানকে এক ভাবে সর্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না—সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। 'উঠ, জাগ যতদিন না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।' উঠ আর একবার উঠ—কারণ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অপরকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জন করিতে হইবে।

খ্রিস্টিয়ানদের ভাষায় বলি—তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা একসঙ্গে কখনও করিতে পার না। বৈরাগ্য—তোমাদের পূর্বপুরুষগণ বড় বড় কাজ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে এমন লোক অনেক রহিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কী, নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও, অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ—কিন্তু এই তোমাদের সম্মুখে কর্মে পরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি, আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোক যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, এবং প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী—যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি, সকলেই

সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই—'মনে মনে রাখলেই হল—ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা—বাপরে!!' তোমাদের চরিত্রের এই দাগ মুছিয়া ফেল। শরীর কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব উঠ, জাগো ও সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র—চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা জিনিসকে মরণ কামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

অতএব উঠ, জাগো, জগতের আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দাও। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত কর। আমাদের প্রয়োজন ধর্ম ততটা নয়—জড়জগতে এই অদ্বৈতবাদ একটু কার্যে পরিণত করিতে হইবে, প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব বেচারারা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি। মত-মতান্তরে ত আর পেট ভরে না। আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমত আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়ত প্রেমশূন্যতা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মত-মতান্তরের কথা বলিতে পার, কোটী কোটী সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশানুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে তাহারা তোমার শরীরের অংশস্বরূপ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা—দরিদ্র ও ধনী, সাধু ও অসাধু, সকলেই যাহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল সেই অনন্ত সর্বস্বরূপের অংশ হইয়া যাইতেছ, ততদিন কিছু হইবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।

—গীতা ৫।১৯

—'যাহাদের মন এই সাম্যভাবে অবস্থিত, তাহারা ইহ জীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন সেই হেতু তাহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।'

উপনিষৎ শক্তির আকর-স্বরূপ

আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের

দুর্বল, দুঃখী পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের (Salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।

আর উপনিষদ্ তোমায় ইহাও দেখাইয়া দেয় যে, ঐ মুক্তি তোমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মতটি উপনিষদের আর এক বিশেষত্ব। তুমি দ্বৈতবাদী—তা হউক; কিন্তু তোমাকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি কার্যের দ্বারা ইহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র।

এই মহান তত্ত্বটি জগৎ ভারতের নিকট শিখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা যাহাই বলুক, তাহারা যতই আপনাদের গরিমা প্রকাশের চেষ্টা করুক, যত দিন যাইবে, তাহারা বুঝিবে যে, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া কোনও সমাজই টিকিতে পারে না।

জগৎ আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর এক মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব।

আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক বা আধ্যাত্মিক, আমাদের জীবনের যে কোনও বিষয়ে খাটাইয়া দেখা যায়, তাহাতেই উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞানেই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পর পরস্পরকে জানিনা বলিয়াই আমাদের পরস্পরে ভালবাসা নাই। যখনই আমরা পরস্পরে ঠিক ঠিক পরিচিত হই তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমের উদয় হইবেই—কারণ, আমরা কি সকলেই এক আত্মস্বরূপ নই? সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের একত্বভাব স্বভাবতই আসিয়া থাকে। এমন কী, রাজনীতি ও সমাজনীতিক্ষেত্রেও যে সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে কেবল জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে তাহাদের মীমাংসা করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশ বিপুলাবয়ব হইতেছে, বিশাল আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই কেবল উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি! আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ! আন্তর্জাতিক বিধান! ইহাই আজকালকার মূলমন্ত্রস্বরূপ। সকলের ভিতর একত্বভাব কীরূপ বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানেও জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ সার্বভৌমিক ভাবই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা

সমগ্র জড়বস্তুকে, সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড়সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাক— তুমি আমি, চন্দ্র, সূর্য, এমন কী আর যাহা কিছু, সবই এই মহান সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তের নাম মাত্র, আর কিছু নয়। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিতে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়, তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তস্বরূপ আর আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল, অপরিণামী সত্তা অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়।

ভারতে আমাদের কী প্রয়োজন? যদি বৈদেশিকগণের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের ঐগুলির বিশ গুণ প্রয়োজন আছে। কারণ, আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমত আমাদের দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।

দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হইতে হইবে—ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে, তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, জুতা কোন্খানে পায়ে লাগিতেছে। আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইবে, যখন তোমরা আপনাদিগের মানুষ বলিয়া জানিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

আমাদের এখন কেবল আবশ্যক— আত্মার এই অপূর্ব তত্ত্ব, উহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা অবশ্যই পুরাণে রাজ্ঞী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। তাঁহার সন্তান হইবামাত্র তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে তাহার নিকট গাহিতে আরম্ভ করিলেন,

'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। এই উপাখ্যানের মধ্যে মহান সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান বলিয়া উপলব্ধি কর। তুমি মহান হইবে।

যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা, একমাত্র প্রামাণ্য টীকাস্বরূপ গীতা চিরকালের মত কৃত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোনও টীকা-টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে কার্যই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা, যে যে কার্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। উপনিষদ-নিহিত তত্ত্বাবলি জেলে মালা প্রভৃতি ইতর সাধারণে কীরূপে কার্যে পরিণত করিবে? —ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—অনন্ত পথ আছে—ধর্ম অনন্ত, ধর্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া কেহ যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। অতি স্বল্প কর্মও যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত ফল লাভ হয়—অতএব যে যতটুকু পারে, করুক। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে। এইরূপ অন্যান্য সকলের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

জাতিবিভাগ থাকিবেই, বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। সামাজিক জীবনে আমি কোনও বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি। তুমি অপর কার্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার। আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি?—এই কার্য-বিভাগ স্বাভাবিক।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজের নিজের মুক্তি সাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ একথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমুক ছেলেটির মুক্তি দিয়া দিব, তবে উহা অতি অন্যায় কথা, অত্যন্ত ভুল কথা বলিতে হইবে।

অতএব প্রত্যেক নরনারীকে, সকলেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয় তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোনও সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু ভাবিও না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাত, কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি—আমার নিজ মুক্তির জন্য—আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব, ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে, কারণ, তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বুদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে ও নিজের স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেই ভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।

জগতে জ্ঞানালোকে বিস্তার কর। আলোক—আলোক লইয়া আস। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক; যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট পৌঁছায়, ততক্ষণ যেন তোমাদের কার্য শেষ না হয়। দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরও অধিক আলো লইয়া এস, কারণ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোর প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া এস। শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরও অধিক আলো, কারণ, আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল। এইরূপে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু সেই প্রভু করিবেন। কারণ, সেই ভগবানই বলিয়াছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।।

—গীতা ২।৪৭

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়, তুমি এমন ভাবে কর্ম করিওনা, যাহাতে তাহার ফল তোমায় ভোগ করিতে হয়, অথচ কর্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে এইরূপ মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করিবার শক্তিলাভে সাহায্য করেন।

ভারতের দান

ভারতের দান—ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা। আর ধর্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বকে শোণিতপ্রবাহের উপর দিয়া বহন করিতে হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদাপটে গমন করে না, উহারা শান্তি ও প্রেমের পক্ষভরে শান্তভাবে আগমন করিয়া থাকে, আর তাহাই বরাবর হইয়াছে। অতএব ইহা দেখা গেল, ভাবতকেও বরাবর জগৎকে কিছু না কিছু দিতে হইয়াছে। লণ্ডনস্থ জনৈক যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমরা একটি জাতিকেও জয় কর নাই।' ইংরাজ জাতির পক্ষে— ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ইংরাজ জাতির পক্ষে—এ কথা শোভা পায়। তাহাদের পক্ষে একজন অপরকে জয় করিতে পারিলে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ বিবেচিত হয়। তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ইহার ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী? আমি তাহার এই উত্তর পাই যে, ইহার কারণ এই আমরা কখনও অপর জাতিকে জয় করি নাই। ইহাই আমাদের মহা-গৌরব। তোমরা আজকাল সর্বদাই 'আমাদের ধর্ম পরধর্মবিজয়ে সচেষ্ট নয়' বলিয়া উহার নিন্দা শুনিতে পাও, আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও যাহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমদের ধর্ম যে অন্যান্য ধর্ম হইতে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, ইহাই তাহার একটি প্রধান যুক্তি। আমাদের ধর্ম কখনওই অপর ধর্ম বিজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনওই রক্তপাত করে নাই। উহা সর্বদাই আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানেই, কেবল এখানেই পরধর্মে বিদ্বেষরাহিত্য সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এইখানেই এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে উহা কেবল মতবাদের মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। এখানে, কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানের জন্য মসজিদ ও খ্রিস্টিয়ানদের জন্য চার্চ নির্মাণ করিয়া দেয়। আমরা আমাদের ভাব জগতে অনেকবার বহন করিয়াছি। কিন্তু অতি ধীরে, নিস্তব্ধ

ও অজ্ঞাত ভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ উহার শান্তভাব, উহার নীরবত্ব। আবার উহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বলবাচক কোনও নামে অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনী শক্তি বলা যাইতে পারে।

যেমন শিশিরবিন্দু নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িলে অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে দান তদ্রূপ বুঝিতে হইবে, নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না। কখন এরূপ করিল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ বলিয়াছিল, 'ভারতীয় কোনও প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কী কঠিন ব্যাপার!' ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, ইহাই ভারতের ভাবসঙ্গত।' তাঁহারা আধুনিক গ্রন্থকারগণের ন্যায় ছিলেন না—যাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থকারগণের নিকট তাঁহাদের গ্রন্থের শতকরা ৯০ ভাগ চুরি করিয়াছেন, শতকরা দশভাগ মাত্র তাঁহাদের নিজেদের, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, এই সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই বেদান্ত চীন, পারস্য ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহতী গ্রীক শক্তি প্রাচ্য জগতে সমুদয় অংশকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন আবার তথায় ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল। আর খ্রিস্টধর্ম ও উহার এতৎসংসৃষ্ট যে সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে তাহাও ভারতীয় চিন্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম (উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও) যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রিস্টধর্ম অতি নগণ্য অনুকরণ মাত্র।

জগতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি হইয়া গিয়াছে। আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী, আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের সেই মহান সম্রাট অশোক, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন। আর আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, সকলেরই মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কার্যের বিরাম না হয়। ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতাদ্বারা জগৎ জয় করিয়া ফেল। অহো, এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, 'ঘৃণাদ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়'—আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, আমাদিগকে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তাদ্বারা জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি, সেগুলি নয়। ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহারা একেবারে মরিয়া যায়।

আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্বীর্য হইয়া যায়; মৃত্যুকীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে, এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্ভীক সাহসী লোক—ইহাই আমরা চাই। আমরা চাই, রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্বীর্যতা-সম্পাদক, দৌর্বল্যজনক ভাবের দরকার নাই।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হইতে আমরা পাইয়াছিলাম স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ হইতে আমরা পাইয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। এই সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিলেন স্বামিজী দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই সন্নাসীবৃন্দের সাধনার লক্ষ্য এক দিকে যেমন আপনার মোক্ষ, অন্য দিকে তেমনি জগতের হিত। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের জীবনাদর্শ। ঋষিগণ যেমন অধ্যাত্মসাধনায় তেমনি সর্বভূতহিত-সাধনায়ও নিরত থাকিতেন।

শ্রীগীতা বলেন—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।। ৫।২৫

নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বভূতহিতেরত ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

অন্যত্র শ্রীভগবান বলিতেছেন—যাঁহারা সর্বভূতহিতরত থাকিয়া অক্ষর ব্রহ্মচিন্তা করেন তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন—'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ' —গীঃ ১২।৪

পূর্বোক্ত দুইটি শ্লোকেই ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মচিন্তক ঋষিগণের বিশেষণ রূপে 'সর্বভূতহিতে রত' পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার সার্থকতা কী? উহা তো ঋষিত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, বরং অনেকে বলিবেন, উহা সাধনার বিঘ্নকর। কিন্তু

শ্রীগীতার মতে সর্বত্যাগী ঋষিগণই প্রকৃত নিষ্কাম কর্মের অধিকারী এবং লোকহিতার্থে নিষ্কামকর্ম করিয়াই তাঁহারা লোকশিক্ষা ও লোকরক্ষা উভয়ই সম্পাদন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মী সন্ন্যাসিগণ সুষ্ঠুভাবে ও প্রশংসনীয়রূপে যথাযথ এই আদর্শই অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। তাই আমবা দেখি, নগরে, পল্লীতে, তীর্থক্ষেত্রে সর্বত্র সেবাশ্রম—নর-নারায়ণ সেবা, আর্ত, পীড়িত, দুঃখদৈন্য-গ্রস্ত শতসহস্র জীবের কল্যাণ-সাধন; বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, বেদান্তাশ্রম প্রতিষ্ঠা—দেশ-বিদেশে বেদান্তমূল অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন ধর্মপ্রচার।

আধুনিক যুগে যাঁহাদিগের সাধনা ও বাণীতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বিদেশে প্রখ্যাতও হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের সাধনায় পরবর্তী চিন্তানায়কগণও প্রভাবিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেন— 'This new India is impregnated with the soul of Ramkrishna. The twin star of the Paramahansa and the hero who translated his thought into action, dominates and guides her present destinies. Its warm radiance is the leaven working within the soil of India and fertilising it. The present leaders of India : the king of thinkers, the king of poets, and the Mahatma—Aurobindo Ghosh, Tagore and Gandhi—have grown, flowered, and borne fruit under the double constellation of the Swan and the Eagle—a fact, publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi.'

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

ওগো দেব, নিম্নহতে নিম্নতমে, উচ্চ হতে আরো উচ্চে তাকাই যখন,
আছ তুমি সাথে সাথে অফুরন্ত কল্যাণের সুধাভাণ্ড করে অনুক্ষণ,
নিখিল জগতে কেহ দেখে নাই হেন স্বপ্ন এই বিশ্বমানবের লাগি,
বক্ষে লয়ে প্রেমাম্বুধি আছ তুমি সুনিভৃতে সুমহান্ সত্যে তব জাগি',
তুমি জান দুঃখ দ্বন্দ্ব উত্তরি' কেমনে নর লভিবে পরম গতি তার,
কোন্ মায়া মন্ত্র জপি' শাশ্বতের ছন্দসুরে নবজন্ম হবে এ-ধরার।

—বিহারীলাল

India has always existed for humanity and not for herself and it is for humanity and not for herself that she shall be great. She is rising to shed the eternal light entrusted to her over the world. —Sri Aurobindo

বিচারাধীন অবস্থায়ও নির্মম রাজশক্তির আদেশে শ্রীঅরবিন্দ যখন নির্জন কারাবাসে, তখন তাঁহার ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল। সে বিষয় তিনি উত্তরপাড়া অভিভাষণে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'His strength again entered into me. I looked at the jail which secluded me from men and it was no longer by its high walls that I was imprisoned; no it was Vasudeva who surrounded me.

I lay on the coarse blankets that were given me for a couch and felt the arms of Srikrishna around me; the arms of my Friend and Lover. I looked at the prisoners in the jail, the thieves, the murderers, the swindlers, and as I looked at them I saw Vasudeva, it was Narayana whom I found in them. In the communion of yoga the message came—I give you the *Adesha* to go forth; speak to your nation always this word, that it is for the *Sanatan Dharma* that they arise, it is for the world and not for themselves that they arise. I am giving them freedom for the service of the world.

—"তাঁহার শক্তি পুনরায় আমাতে প্রবেশ করল। যে জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে, সেই দিকে আমি তাকালাম, কই জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে তো বন্দি নই, এ যে বাসুদেব, বাসুদেব আমাকে ঘিরে রয়েছেন! যে মোটা কম্বল আমাকে পালঙ্করূপে দেওয়া হয়েছিল, তার উপর শুয়ে আমি অনুভব করলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন, আমার পরম সুহৃদ, আমার প্রেমাস্পদের বাহু। জেলের কয়েদীদের দিকে তাকালাম—চোর, খুনী, জুয়াচোর এই সব লোক, দেখি বাসুদেব, তাঁহাদের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম। ধ্যানস্থ হয়ে আছি, তখন আদেশ-বাণী এল—যাও আমার কাজ কর গিয়ে। যখন তুমি জেলের বাইরে যাবে তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়, সমস্ত জগতের জন্যই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিতেছি জগতের সেবার জন্য।'

এই আদেশ-বাণীতেই তাঁহার ভবিষ্য জীবনের গতি নির্দেশ করিয়া দিল। নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়াতে জেল হইতে মুক্তিলাভের পরই তিনি ব্রিটিশ রাজ্য ছাড়িয়া পণ্ডিচেরীতে যাইয়া যোগসাধনায় নিরত হইলেন। সে যোগের উদ্দেশ্য নিজের মুক্তি লাভ নয়, জগৎকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত করা, মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃত জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিণত করা (to spiritualise mankind)।

বিশ্বমানব-প্রকৃতির অধ্যাত্ম-রূপান্তর, কথাটা বড়ই রহস্যপূর্ণ ও কুয়াসাচ্ছন্ন বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে জগতের উৎপত্তি ও জীবের ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, উহাদের মর্ম সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করি, তবে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হয় যে, উহা একেবারে স্বপ্নবিলাস নয়, এ স্বপ্ন ভবিষ্যতে কোনও কালে বাস্তবে পরিণত হওয়াই সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ যোগলব্ধ-অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বি৻শ্লষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহারই ভিত্তিতেই তাঁহার সাধনার লক্ষ্য ও পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

এই সৃষ্টি কীরূপে হইল? মানুষ কোথা হইতে আসিল? কোথায় যাইবে? তাহার শেষ স্থিতি কোথায়?

শ্রুতি বলেন—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই।

কিন্তু এই যে জগৎটা দেখিতেছি, ইহা কি মিথ্যা? ইহা কি স্বপ্ন-দর্শন?

এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত তাহাই বলেন—'অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়ং অখিলং জগৎ।' —যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সুতরাং জগৎটা স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। জগৎটা ব্রহ্মসত্যে অধ্বস্ত ভ্রমমাত্র, যেমন ঈষৎ অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম। ইহা একটি দার্শনিক মত মাত্র, শ্রুতির কথা নয়।

শ্রুতি বলেন—এ সমস্তই ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এক ব্রহ্মই আছেন; তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিয়াছেন, তিনিই এ সমস্ত হইয়াছেন ('স স্বয়মকুরুত', 'স সর্বমভবৎ')। এক ব্রহ্মই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব ব্যাহত হয় না বা পূর্ণত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না—'পূর্ণাৎ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'।

ব্রহ্মের এই আত্ম-প্রকাশ একবারে হয় নাই, ইহা ক্রম-বিকাশ। আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টির অর্থ নূতন কিছুর উৎপত্তি (Creation) নয়, যাহা আছে তাহারই ক্রম-বিকাশ (Evolution)। এই বিকাশের ক্রম কীরূপ? প্রথমে জড়ের উদ্ভব, পরে জড়ে প্রাণক্রিয়ার উদ্ভব অর্থাৎ ইতরপ্রাণীর উদ্ভব হইল, পরে মনের উদ্ভব অর্থাৎ মননশীল জীব মনুষ্যের উদ্ভব হইল, ইত্যাদি। এ বিষয়ে একটি শ্রুতিবাক্য এই—

'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চানৃতম্।।' —মুঃ ১।১৮

—ব্রহ্ম তপঃশক্তি (সৃজনোন্মুখী স্বীয় ইচ্ছাশক্তি) দ্বারা আপনাকে স্ফীত করিলেন, তাহাতে অন্নের উদ্ভব হইল, অন্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হইল, প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব হইল (মানব-সৃষ্টি) এবং ক্রমে লোকসমূহের উদ্ভব হইল।

'অন্ন' শব্দটি উপনিষদাদি গ্রন্থে অনেক সময় জড় পদার্থের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই শ্রুতিবাক্যের এইরূপ মর্মানুবাদ করিয়াছেন—

By energism of consciousness, Brahma is massed, from that Matter is born and from Matter, Life and Mind and the other worlds.

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন সাহেবের Descent of Man (মানবের উদ্ভব) নামক যুগান্তকারী পুস্তকে বিবর্তন-বাদ বা ক্রমবিকাশ-বাদ প্রচারিত হইলে খ্রিস্টীয় পাদরী সমাজে বিষম হুলস্থুলু পড়িয়া যায়। কারণ, এই মতবাদ অনুসারে জলের ক্ষুদ্র গোল জন্তুবিশেষ হইতে ক্রম-বিকাশে মানুষের উদ্ভব এবং বানর মানুষের নিকট পূর্বপুরুষ। উহাতে বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব জলে ভাসিয়া যায়। যাহা হউক, সত্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। তবে বলা আবশ্যক, এ সত্যটি প্রকারান্তরে আর্য ঋষিগণেরই আবিষ্কার।

ক্রম-বিবর্তনে জঙ্গম বা প্রাণীজগতে কীরূপ ক্রমে জলের ক্ষুদ্র কীট হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, সে বিষয়েও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভারতীয় ঋষিশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

পাশ্চাত্যমতে বিবর্তনের ক্রম এইরূপ—ক্ষুদ্র সরীসৃপ, তাহার পর পক্ষী, পশু, বানর, সর্বশেষ মানুষ। আমাদের শাস্ত্রও বলেন—জীব ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করে। মনুষ্যজন্মেই জীব সাধনবলে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, মানুষ্যত্বের পরবর্তী সোপানই ব্রহ্মত্ব। সুতরাং মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ।

আমাদের শাস্ত্রে ৮৪ লক্ষ যোনির বিবর্তনের ক্রম এইরূপ—স্থাবরজন্ম ২০ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তৎপর মনুষ্য যোনি। এখানেও বানরকেই মানুষের নিকট পূর্বপুরুষ বলা হইয়াছে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ।।
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ। —বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

কিন্তু সৃষ্টির ক্রমবিকাশতত্ত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে অনেকটা একরূপ হইলেও একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞানে মর্মান্তিক প্রভেদ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা দেহগত বা আধিভৌতিক, প্রাচ্য দর্শনের আলোচনা জীবগত বা আধ্যাত্মিক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেবল দেহ লইয়াই আছেন। দেহেরই পরিবর্তন বা বিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং উহার চর্চা করেন। কিন্তু প্রাচ্য দর্শন বলেন, এখানে দুইটি তত্ত্ব—দেহ আর দেহী, শরীর ও আত্মা। প্রত্যেক পদার্থেই এই দুইটি আছে, তা স্থাবর জড়ই হউক, কী জঙ্গম বা প্রাণীই হউক, ব্রহ্ম অনন্তশক্তির আধার, জীবেও অনন্তশক্তি নিহিত আছে। সেই শক্তির বিকাশই ক্রমবিকাশ (Evolution)। এই বিকাশের ক্রমানুসারেই জন্মে জন্মে জীবের নূতন নূতন দেহ প্রাপ্তি হয়। এইরূপে প্রচ্ছন্ন শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীব ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, এই ক্রমবিকাশ জীবগত; অর্থাৎ জীবাত্মার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আত্মশক্তির প্রেরণায়ই দেহেরও আনুষঙ্গিক বিকাশ হইতে থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে এক্ষণে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরই পোষকতা করিতেছেন।

ক্রম-বিবর্তনে জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব হইল, প্রথম অল্প প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল উদ্ভিদে, তারপর পূর্ণ প্রাণের স্পন্দন মানবেতর জন্তুতে, তারপর প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব। মনের শক্তি অসাধারণ, তাহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। মনঃশক্তিবলে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া অপূর্ব মানব-সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও মনের শক্তি অবিদ্যার শক্তি, অজ্ঞানের শক্তি। মানব-মনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহা আত্মজ্ঞান নয়, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান নয়। ভেদাত্মক মনের খণ্ডচেতনায় অখণ্ড সত্যের উদয় হয় না, ভূমাজ্ঞানের উদ্ভব হয় না। মনের ঊর্ধ্বে অতিমানসস্তরে উঠিয়া বিজ্ঞানভূমিতে অধিষ্ঠিত না হইলে পরম সত্যের অনুভূতি হয় না।

শাস্ত্রে আছে, অন্নময় পুরুষ, প্রাণময় পুরুষ, মনোময় পুরুষ এবং বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষ—এই সকল রূপে জগতে ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ (অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ইত্যাদি—তৈত্তিঃ উঃ)। আমরা দেখিতেছি, এই প্রকাশের ঊর্ধ্বতম স্তরে মানব অর্থাৎ মনোময় পুরুষ। বিজ্ঞানময় পুরুষের উদ্ভব এখনও হয় নাই। হয়তো ক্রমবিবর্তন ধারায় ভাগবতী শক্তির প্রেরণায়ই উহা কালে দেখা দিবে। বিজ্ঞানই সত্য—'সত্যং ঋতং বৃহৎ'—এই বিজ্ঞানের উদ্ভব হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হয়, হয়তো কালে সে যুগ আসিবে, যেরূপ শাস্ত্রে আছে।

কিন্তু মানুষ এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে থাকিলেও সে একটি দুর্লভ বস্তুর অধিকারী হইয়াছে, সে সাধন-শক্তি লাভ করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, মানুষ সাধনা বলে আধার উপযোগী করিয়া এবং উর্ধ্ব হইতে ভাগবতী চিন্ময়ী শক্তি বা পরাপ্রকৃতিকে অবতরণ করাইয়া অতিমানস চেতনায় (Supramental Consciousness, Supermind) অধিষ্ঠিত হইতে পারে, সত্যযুগের অবতারণা করিতে পারে। ইহাই তাঁহার সাধনার লক্ষ্য। এ আস্পৃহা, এ তপস্যা ভারতের ঋষিরই যোগ্য এবং ভারতবাসী ইহা অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করে। 'সত্যং ঋতং বৃহৎ'—ভারতেব ঋষিরই সাধন-সম্পদ। একদা উহা ঋষি-কণ্ঠে সতত নিনাদিত হইত।

অতিমানসের স্বরূপ (Supermind)

মানুষের মনবুদ্ধিতে পরমতত্ত্বের কোনও সন্ধান মিলে না, মনবুদ্ধির উপরে যে একটি বৃত্তি আছে, তাহা জাগ্রত হইলেই পরম সত্যের অনুভূতি হয়। উহাই অতিমানস, অতিমানস-চেতনাই সত্য-চেতনা (Truth Consciousness)। ইহাই বিজ্ঞানলোক, উহার উপরে সচ্চিদানন্দ। বিজ্ঞানেই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ প্রকাশ—'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যতি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। 'এখানে উঠিলে মনে হয় কী একটা গ্রন্থি টুটিয়া গেলে, সত্তা যেন পাইল একটা অসীম প্রসারতা, আমি যেন আছি বিশ্বকে ধরিয়া ছাইয়া; তখন আর ভয় নাই, সংশয় নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংঘর্ষ নাই। তখন পাইয়াছি নিজের প্রকৃত সত্তা, অটুট জ্ঞান, অব্যর্থ শক্তি, অনাবিল আনন্দ; বিশ্ববস্তুর সহিত আমার কেবল যোগাযোগ নাই, আমি যেন সকলের সহিত প্রত্যেকের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। এখানেই মুক্তি, জীবন-মুক্তি।' (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

যিনি এই অতিমানস চেতনায় অধিষ্ঠিত তাঁহাকেই অতিমানব বলা হয়। সচ্চিদানন্দই এই সমস্ত হইয়াছেন ('স সর্বমভবৎ')। উহার স্তর এইরূপ—সচ্চিদানন্দ, বিজ্ঞান, মন বুদ্ধি, চিত্ত প্রাণ, দেহ—'উর্ধ্ব মূলমধঃশাখম্'—গী ১৫।১। জীবের সাধনার উদ্দেশ্য, এই বিজ্ঞান বা অতিমানস চেতনাকে জাগ্রত করিয়া আপনার নিম্নপ্রকৃতিকে—মন বুদ্ধি চিত্ত প্রাণ দেহকে রূপান্তরিত করিয়া তোলা।

পূর্বে যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে সাঙ্কেতিকভাবে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—

অতিমানস চেতনার মূল কথা হইল অদ্বৈতবোধ। অদ্বৈত জ্ঞানেরও প্রকারভেদ আছে, অদ্বৈতভাবেরও বিভিন্ন বিভাগ আছে।

১। শুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানে 'আমি' জ্ঞান থাকে না, কোনওরূপ স্বাতন্ত্রবোধই থাকে না, কেবল এক অদ্বিতীয় তত্ত্বেরই অনুভূতি হয়। ইহাকে বলা হয় অদ্বৈত বিজ্ঞান (Comprehending Consciousness)।

২। উক্ত অদ্বৈত বিজ্ঞানে জগতের স্বতন্ত্র জ্ঞানও থাকে না। এই হেতু যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তা করেন, তাঁহারা বলেন—এক ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা মায়মাত্র, উহার পারমার্থিক সত্তা নেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই মায়াবাদ ভ্রমাত্মক। অদ্বৈতভাবেরও বিভিন্ন বিভাব আছে। এক ব্রহ্মই জগতে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং একের মধ্যে বহুর দর্শন এবং বহুর মধ্যে একের দর্শনও অদ্বৈতজ্ঞান। ইহাকে বলা যায় অদ্বৈত-প্রজ্ঞান (Apprehending Consciousness)।

অদ্বৈত বিজ্ঞানের যে মূলতত্ত্ব অদ্বৈতবোধ তাহাই অদ্বৈতপ্রজ্ঞানে বহুকেন্দ্রিক হয়, ইহাতে একের মধ্যে বহুর বিকাশ ও বহুর মধ্যে একের প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে। উপনিষদে, শ্রীগীতায়, পুরাণে সর্বত্রই—আমরা এই কথা দেখিতে পাই—যিনি একের মধ্যে সর্বভূত দেখেন এবং সর্বভূতে সেই এককেই দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। ইহার ফলেই তিনি হন সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতে প্রীত-মৈত্রীযুক্ত বা সর্বভূতানুকম্পী—

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'। —গীঃ ১২।১৩

ইহাই বিশ্বপ্রেমের দার্শনিক ভিত্তি (১৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৩। আবার এমন অনেক ভক্ত সাধক আছেন যাঁহারা দ্বৈতভাবেই ভগবানের অর্চনা বন্দনা করেন, ভগবানের সঙ্গে ভাবভক্তির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এক ভগবানই যেমন অন্তর্যামীরূপে আমাতে আছেন, তেমনি সর্বভূতেও আছেন, এক ভিন্ন দুই নাই। ইহাও অদ্বৈত জ্ঞান, ইহাকে বলা যায় অদ্বৈত সংজ্ঞান (Projecting Consciousness)।

প্রহ্লাদ-চরিত্রে দেখা যায়, তিনি দ্বৈতজ্ঞান লইয়াই ভগবানের অর্চনা-বন্দনা ও প্রার্থনাদি করিতেন, অথচ এক ভগবানই তাঁহাতে এবং সর্বভূতে আছেন এ জ্ঞানও তাঁহার অতি সুদৃঢ় ছিল, তাঁহার প্রতিটি কথাতে উহাই ব্যক্ত হইত। পুরাণকার তাঁহার একটি স্তোত্রে এই দ্বৈতাদ্বৈত-ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রহ্লাদ এইরূপে শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন—

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে।।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।।

ইত্যাদি।

কিন্তু স্তব করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া অদ্বৈতবিজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'তিনিই আমি'—স্তব শেষ হইল এই কথায়—

সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে।।
অহমেবাক্ষরো নিত্যঃ পরমাত্মাত্ম সংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্ম সংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্।।

সেই অনন্ত সর্বগত তিনিই আমি। আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমস্ত, আমাতেই সমস্ত। আমি অক্ষর, নিত্য, পরমাত্মা, ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বেও আমি, পরেও আমিই। এখানে দ্বৈতাদ্বৈত, ভক্তি জ্ঞান, বেদান্ত ভাগবত, সব এক হইয়া গেল।

পরমভক্ত প্রহ্লাদ পরম অদ্বৈতজ্ঞানী। পূর্বোক্ত তিনটি ভাব—অদ্বৈত বিজ্ঞান, অদ্বৈত প্রজ্ঞান, অদ্বৈত সংজ্ঞান, প্রকৃতপক্ষে একই অদ্বৈত সত্য বিভিন্ন সাধকের মধ্যে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন সাধক প্রণালীর মূর্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে আমরা এ তিনটি বিভাব একত্রেই বিদ্যমান দেখিতে পাই। অদ্বৈত বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, আবার অদ্বৈত-প্রজ্ঞান বলে সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করিতেন, অথচ অদ্বৈত সংজ্ঞানে স্থিত হইয়া দ্বৈতভাবে মূর্তি পূজা করিতেন, কিন্তু এমন অবস্থাও ঘটিত যে পূজার ফুল কখনও মায়ের পায়ে পড়িত, কখনও নিজের পায়েও পড়িত।

সুতরাং দেখা যায়, দার্শনিকগণের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ লইয়া যে বাদ-বিসংবাদ তাহা অনর্থক। এই বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এই কারণে যে, প্রত্যেকেই তাঁহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে সত্যের এক অংশই দেখেন এবং উহাকেই পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করেন এবং অন্যে যে সত্যের অপর অংশ দেখেন তাহা অগ্রাহ্য করেন।

'It is only when our human mentality lays an exclusive emphasis on one side of spiritual experience, affirms that to be the sole eternal truth and states it in the terms of our all-dividing mental logic that the necessity for mutually destructive schools of philosophy (অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি) arises'. (Life Divine Vol. I).

বস্তুত বাদ একটিই, তাহা অদ্বৈতবাদ। উহা অতিমানস চেতনায় অধিগম্য, মানস-চেতনায় ভেদজ্ঞান আসে।

স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন যে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—অবস্থা-বিশেষে এ সকলই সত্য।

অতিমানব বা দিব্যমানবের স্বরূপ (Superman)

দিব্য জীবন—Life Divine

পূর্বে দেখিয়াছি, যিনি অতিমানস-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত তাঁহাকে অতিমানব বলা হয়। মানব মনোময় পুরুষ, অতিমানব বিজ্ঞানময় পুরুষ। অতিমানবের যে জীবন-যাত্রা-প্রণালী তাহাই দিব্য জীবন বা ভাগবত জীবন।

অতিমানব সিদ্ধ পুরুষ, মুক্ত পুরুষ। এই মুক্তি সাযুজ্য মুক্তি নয়, সাধর্ম্য-মুক্তি, সাদৃশ্যমুক্তি। শ্রীগীতায় দেখি, সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় শ্রীভগবান সর্বদাই বলিতেছেন—'মম সাধর্ম্যমাগতাং মদ্ভাবমাগতাঃ, মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ইত্যাদি' (গীঃ ১৪।২, ৪।১০, ১৩।১৮)। অতিমানব সচ্চিদানন্দের সাধর্ম প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ।

মুক্তি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইলে দেহাবসানে জীবাত্মা পরব্রহ্মে মিলিত হয়, উহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাকেই পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি বা মোক্ষ বলে।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য উহা নয়। তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য পূর্ণ মুক্তির আনন্দকে পার্থিব জীবনে মূর্ত করা। মুক্তি জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া নয়, এই

জীবনকে, এই দেহ, প্রাণ, মন, জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, সুখ সকলই দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া জীবন উপভোগ করা যায়। ইহাই দিব্য জীবন।

এই জীবনের কেন্দ্রস্থলে সক্রিয় হইবে অতিমানস-বিজ্ঞান, যাহার মূল কথা অদ্বৈত-চেতনা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে এই অদ্বৈত-চেতনা জাগ্রত হইলে মানব-সমাজে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিবে—ঐক্য, পারস্পরিকতা, সামঞ্জস্য (unity, mutuality and harmony)।

ঐক্যের মূল উৎস হইতেছে আত্মিক ঐক্যবোধ, একাত্মতাবোধ ('সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা')। যতদিন এই সত্য হৃদ্‌গত না হয় ততদিন পর্যন্ত বিশ্বমানবের একত্বের আদর্শ, 'one world'-এর আদর্শ (Ideal of human unity) আদর্শবাদই থাকিবে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এই আদর্শকে মূর্ত করে, বাস্তবে পরিণত করে। ইহাই দিব্য মানবত্বের আদর্শ। দিব্য মানুষের অদ্বৈতপ্রজ্ঞানের মধ্যে এই মিলন-সূত্র রহিয়াছে। একের মধ্যে বহুর দর্শন ও বহুর মধ্যে একের দর্শন, ইহাই অদ্বৈতপ্রজ্ঞান। সাধারণ মানবের খণ্ডচেতনা সকলই পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেখে। তাই, ব্যক্তিগত স্বার্থবিরোধ, সম্প্রদায়গত স্বার্থবিরোধ, জাতিগত স্বার্থ-বিরোধ ও সংঘর্ষ। দিব্যমানবের অদ্বৈতচেতনায় বিরোধের স্থলে মৈত্রী এবং ঘৃণা-বিদ্বেষের স্থলে প্রেমের উদ্ভব হইবে, জগতে অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ-জটিল বন্ধ,
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য।
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।'

হিংসাদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষত-বিক্ষত জগতের অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া ঋষি-কবি গাহিয়াছেন—"নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী।"

তাই তো ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ভাগবতী চিন্ময়ী শক্তিকে, পরাপ্রকৃতিকে অবরণ করাইয়া যে নবজন্ম বাস্তব করার জন্য ৪০ বৎসর নির্জন তপস্যায় নিরত রহিলেন। সে তপস্যা চলিতেছে, চলিবেই। মুনিঋষির অধ্যাত্ম সাধনাপূত এই পুণ্যভূমিতে, ভাগীরথের তপস্যাক্ষেত্রে নব গঙ্গাবতরণ হইবেই, এ আশা আমাদের আছে।

পূর্ণযোগ-সাধনার ভিত্তি

শ্রীঅরবিন্দের যে যোগ-সাধনা তাহাকে পূর্ণযোগ বলা হয়। এ যোগের উদ্দেশ্য মানবকে অতিমানবে পরিণত করা। যে ভাগবতী শক্তির প্রেরণায় উদ্ভিদ হইতে পশু এবং পশু হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, সেই শক্তির, ভগবানের সেই পরাপ্রকৃতির করুণা ব্যতিরেকে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং সাধনবলে আধারকে উপযোগী করিয়া উর্ধ্ব হইতে ভাগবতী শক্তিকে অবতরণ করাইয়া পার্থিব জগতে সক্রিয় করা প্রয়োজন। এজন্য সাধকের চাই তিনটি জিনিস—

আস্পৃহা (Aspiration)
আত্ম-উন্মীলন (Psychic opening)
আত্ম-সমর্পণ (Self-surrender)

এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইল। উহাতেই এ তিনটি কথার তাৎপর্য কী, তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।—

(এই উপদেশগুলি 'Basis of Yoga' নামে ইংরেজিতে এবং 'যোগসাধনার ভিত্তি' নামে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

১

ভাগবত সত্যকে আবিষ্কার করবার, শরীরী ক'রে ধরবার জন্য যে আস্পৃহা তাতেই জীবনের অখণ্ড উৎসর্গ, আর কোনও কিছুতেই নয়—এই হল আমাদের যোগের নির্দেশ। একদিকে ভগবান আর একদিকে এমন কোনও বহির্মুখী লক্ষ্য ও কর্ম, সত্যের সন্ধানের সাথে যার কোনও সম্বন্ধ নাই—এই দুয়ের মধ্যে তোমার জীবনকে ভাগাভাগি ক'রে দেওয়া চলবে না। ও-রকমের সামান্য কিছুমাত্র থাকলে যোগে সফলতা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

২

শ্রদ্ধা, ভগবানের নিকট নির্ভর, ভাগবত-শক্তির কাছে সমর্পণ ও আত্মদান—এ সবই অবশ্য-প্রয়োজন, অপরিহার্য। কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর যেন আলস্য দুর্বলতা বা নিম্নতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির কাছে সমর্পণ, এ সকলের ছল মাত্র না হয়, নির্ভরের সাথে থাকবে অক্লান্ত আস্পৃহা আর সেই সাথে থাকবে ভাগবত সত্যের পথ প্রতিরোধ ক'রে দাঁড়ায় যা-কিছু সে সমস্তের নিরন্তর প্রত্যাখ্যান। ভগবানের কাছে সমর্পণ যেন নিজেরই বাসনা ও নিম্নতন বৃত্তির কাছে অথবা নিজের অহং-এর কাছে অথবা

অজ্ঞানের ও তমিস্রার যে কোনও শক্তি ভগবানের মিথ্যা রূপ গ্রহণ ক'রে আসে তার কাছে সমর্পণের ছল, আবরণ বা সুযোগে পরিণত করা না হয়।

৩

তোমার কেবল দরকার আস্পৃহাপরায়ণ হওয়া। মায়ের দিকে নিজেকে খুলে রাখা, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী যা সবকিছু সব প্রত্যাখ্যান করা, তোমার ভিতরে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া—আর তুমি তোমার সব কাজ করবে তাঁরই জন্য, এই স্থির বিশ্বাসে যে শুধু তাঁরই শক্তির কল্যাণে তোমার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব। এভাবে তুমি যদি নিজেকে উন্মুক্ত রাখতে পার, তা হলে যথাসময়ে জ্ঞান ও সিদ্ধি তোমার আসবেই।

৪

এ যোগে সব নির্ভর করে ভাগবত প্রভাবের কাছে তুমি নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে ধরতে পার কি না, তার উপর। আস্পৃহা যদি আন্তরিক হয়, সকল বাধা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যদি থাকে ধীর স্থির সঙ্কল্প, তবে সে উন্মুক্তি কোনও না কোনওরূপে আসবেই। কিন্তু তার জন্য সময় বেশি লাগতে পারে, কমও লাগতে পারে, নির্ভর করে তোমার মন, হৃদয় ও দেহ প্রস্তুত হয়েছে কি

প্রস্তুত হয় নাই তার উপর। সুতরাং যথেষ্ট ধৈর্য যদি না থাকে তা হলে আরম্ভে সাধনা এত দুরূহ বোধ হয় যে, অনেকে সাধনা ছেড়েও দিতে পারে। এ যোগে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই—কেবল প্রয়োজন চেতনাকে একাগ্র করা, বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে, আর মায়ের অধিষ্ঠানকে ও শক্তিকে আহ্বান করা যাতে তিনি তোমার সত্তাটি আপন হাতে তুলে নেন এবং তার শক্তির ক্রিয়ার ফলে চেতনাকে রূপান্তরিত করেন। মস্তিষ্কে বা ভ্রূমধ্যেও চেতনাকে একাগ্র করা যায়—কিন্তু অনেকের পক্ষে উন্মুক্তির এ পথ অতি দুরূহ। মন যখন প্রশান্ত হয়, একাগ্রতা হয় দৃঢ় আর আস্পৃহা তীব্র, তখনই অনুভূতির সূত্রপাত। শ্রদ্ধা যত বেশি হবে, তত ক্ষিপ্রতর ফল লাভের সম্ভাবনা। শেষ কথা, কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে চললে হবে না, এ ছাড়াও ভগবানের সাথে একটা সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপন করতে পারা চাই, এবং মায়ের শক্তি ও অধিষ্ঠান ধারণ করার সামর্থ্য অর্জন করা চাই।

৫

কোনও সাহায্য না নিয়ে, কেবল নিজের আস্পৃহা ও সঙ্কল্পের জোরে নিম্নতন প্রকৃতির বেগ জয় করতে পারে এমন শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। যারাও বা তা পারে, তারা শুধু কতকটা সংযম অর্জন করে, পূর্ণ কর্তৃত্ব নয়। স্থির সঙ্কল্প ও আস্পৃহা প্রয়োজন যাতে ভাগবত-শক্তি তোমার সহায় হয়ে অবতরণ করতে পারে, আর যাতে সে শক্তি যখন নিম্নতন বৃত্তিসকলের উপর কাজ ক'রে চলে তখন সর্বদা তার স্বপক্ষে থাকে তোমার সত্তাটি। কেবল ভাগবত-শক্তিই অধ্যাত্ম সঙ্কল্পকে ও হৃদ্‌গত অন্তঃপুরুষের আস্পৃহাকে সার্থক ক'রে পূর্ণ বিজয় এনে দিতে পারে।

৬

অকপট ঐকান্তিক হলে ফলও অবশ্যম্ভাবী। যদি তুমি ঐকান্তিক হও, তবে দিব্য জীবনে তুমি গড়ে উঠবেই। সর্বতোভাবে ঐকান্তিক হওয়ার অর্থ কেবল ভাগবত সত্যকেই আকাঙ্ক্ষা করা, মা ভগবতীর কাছে উত্তরোত্তর আপনাকে সমর্পণ ক'রে দেওয়া, একমাত্র এই আস্পৃহা ব্যতীত আর সব ব্যক্তিগত দাবি বা আকাঙ্ক্ষা দূর করা, জীবনে প্রত্যেকটি কর্ম ভগবানের কাছে উৎসর্গ করা, প্রত্যেকটি কর্ম ভগবৎ-প্রদত্ত কর্ম হিসাবে ক'রে যাওয়া, তার মধ্যে অহংকে টেনে না আনা। এই হল দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠা।

এ রকমটি একযোগে সম্পূর্ণভাবে হয়ে উঠা যায় না। তবে নিরবচ্ছিন্ন আস্পৃহা যদি থাকে, যদি সত্যসন্ধ হৃদয় ও ঋজু সঙ্কল্প নিয়ে ভাগবতী শক্তিকে সাহায্যের জন্য নিরন্তর আহ্বান করা যায়, তবে উত্তরোত্তর এই চেতনায় গড়ে ওঠা যায়।

৭

যোগ-সাধনা করবার সর্বদা দুটি পথ আছে—এক, সজাগ মন ও প্রাণের ক্রিয়া, তার সহায়ে দেখা, পর্যবেক্ষণ করা, চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত করা কী কর্তব্য আর কী অকর্তব্য। অবশ্য এ ক্রিয়াটিরও পশ্চাতে রয়েছে ভাগবত-শক্তি, এখানেও আকর্ষণ করা হয়, আহ্বান করা হয় ভাগবত-শক্তিকেই—তা না হলে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়, তবুও এখানে ব্যক্তিগত চেষ্টাই প্রধান, একেই সাধনার ভার প্রায় সবখানি বহন করতে হয়।

অন্য পথটি হল অন্তঃপুরুষের পথ—এখানে চেতনা ভগবানের দিকে আপনাকে খুলে ধরে, কেবল অন্তঃপুরুষকেই সে যে খুলে ধরে, সম্মুখে নিয়ে আসে তা নয়, সেই সঙ্গে আবার মনকে প্রাণকে দেহকে খুলে ধরে, জ্যোতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, সাক্ষাৎ বোধ করে কী করতে হবে, অনুভব করে প্রত্যক্ষ করে ভাগবত-শক্তিই কাজ ক'রে চলেছে, আর নিজেও ভাগবত ক্রিয়াকে আহ্বান ক'রে, আপন সজাগ সচেতন সম্মতি দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য ক'রে চলেছে। সাধারণত এ দুটি ধারায় মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী ততদিন যতদিন চেতনা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উন্মুক্ত করবার জন্য তৈরি হয় নাই, তার সফল ক্রিয়ার উৎস হিসাবে ভাগবত অনুপ্রেরণার কাছে সম্পূর্ণ প্রণত হতে পারে নাই—এ অবস্থা হলে পরে সকল দায়িত্ব দূর হয়ে যায়, সাধককে নিজের ব্যক্তিগত ভাব আর কিছু বহন করতে হয় না।

৮

আগুনটি হল আস্পৃহা, আন্তর তপস্যার দিব্য অগ্নি। মানবীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঐ আগুন যখন বার বার ক্রমেই অধিকতর বেগে ও বৈপুল্যে অবতরণ করে, তখন প্রথমে মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে সে বুঝি গ্রস্ত ও লুপ্ত হয়ে গেল; কিন্তু অবতরণের মাত্রা যত বেশি হবে, ততই সে অন্ধকারকে আলোকে মানবমনের অজ্ঞান ও অচেতনাকে অধ্যাত্ম চেতনায় পরিবর্তিত করে চলবে।

৯

সকল আসক্তি জয় করবার আর কেবল ভগবানেরই দিকে ফিরে দাঁড়াইবার সঙ্কল্প যোগ সাধনারই অঙ্গীভূত। সাধনার প্রধান কথা হল প্রতিপদে ভাগবত প্রসাদের উপর আস্থা রেখে, ভগবানের দিকে চিন্তাকে নিরন্তর প্রচালিত করে, আপনাকে উৎসর্গ করে চলা, যতদিন সত্তাটি খুলে না যায়, আর আধারের মধ্যে মায়ের শক্তি যে কাজ করছে তা অনুভব না হয়।

১০

এ যোগের সমস্ত মূল তত্ত্বটি হল ভাগবত প্রভাবের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করা। ও-জিনিসটি রয়েছে ঠিক তোমার মাথার উপরেই; যদি তুমি তার সম্বন্ধে

একবার সচেতন হতে পার, তখন তা হলে প্রয়োজন হবে তোমার ভিতরে তাকে আহ্বান করে নামিয়ে আনা। এ অবতরণ মনের মধ্যে হয়, দেহের মধ্যে হয় কখন শান্তিরূপে, কখন জ্যোতিরূপে, কখন ক্রিয়মান শক্তিরূপে, আবার সাকার কী নিরাকার ভগবৎ অধিষ্ঠানরূপে কিংবা আনন্দরূপে। সে চেতনা যতদিন না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা আর উন্মুক্তির জন্য আস্পৃহা নিয়ে থাকা দরকার। আস্পৃহা, আহ্বান, প্রার্থনা এক অভিন্ন জিনিসেরই নানা আকার, আর সবগুলিই ফলপ্রদ—যে আকার স্বতঃই তোমার আসে বা তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা সহজ তাই গ্রহণ করবে। অন্য পথটি হল একাগ্রতা—চেতনাকে হৃদয়ে একাগ্র কর (কেউ কেউ করে মস্তকের মধ্যে বা উপরে), সেখানে মায়ের ধ্যান কর, সেখানেই তাঁকে ডেকে আন। এ দুটির যে কোনটি করা যেতে পারে কিংবা দুটিই ভিন্ন সময়ে করা যেতে পারে—যখন স্বভাবতই যা তোমার করা আসে, বা করতে প্রেরণা যায়। তবে আরম্ভে সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজন হল মনকে শান্ত করা, সাধনার সময় সাধনা-বহির্ভূত সব চিন্তা ও বৃত্তি দূর করা। শান্ত মনেই অনুভূতির জন্য আয়োজন উত্তরোত্তর সুষ্ঠু হয়ে চলে। কিন্তু সমস্ত কাজটি যদি একযোগে না হয়ে যায় তা হলে অধীর হয়ে পড়বে না। মনের মধ্যে পূর্ণ শান্তি নিয়ে আসা সময়-সাপেক্ষ—চেতনা যতদিন প্রস্তুত না হয় ততদিন অধ্যবসায়ের সাথে লেগে থাকতেই হয়।

১১

যোগ-সাধনার অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়, তোমার সত্তাকে মাতৃশক্তির কাছে উন্মুক্ত করা, সকল অহংকার দাবি বাসনা, শুধু ভাগবত সত্যের জন্য আস্পৃহা ব্যতিরেকে অন্য সব প্রেরণা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করা। এটি যথাযথ করা হলে, ভাগবত শক্তি ও জ্যোতি কাজ আরম্ভ করবে। যোগসিদ্ধির অবশ্য-প্রয়োজনীয় যে প্রতিষ্ঠা, —শান্তি ও সমতা, আন্তর সামর্থ্য, বিশুদ্ধ ভক্তি, ক্রমবর্ধমান চেতনা ও আত্মজ্ঞান, এদের নিয়ে আসবে।

১২

ভাগবত শক্তি গ্রহণ করবার সামর্থ্য লাভ করতে যদি চাও, বাহ্য-জীবনের সকল বিষয়ে তাকে কাজ করতে যদি দিতে চাও, তা হলে তিনটি জিনিস আগে অধিকার করা দরকার ঃ—

(১) অচঞ্চলতা, সমতা—যা ঘটুক না কেন কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হবে না, মনকে স্থির ও দৃঢ় রাখবে—শক্তিরাজের লীলা শুধু দেখে যাবে, অথচ মন নিজে থাকবে প্রশান্ত।

(২) অব্যভিচারী শ্রদ্ধা—এই শ্রদ্ধা যে, পরিণামে পূর্ণমঙ্গল যা তাই ঘটবে, আর সেই সাথে এই শ্রদ্ধাও যে, আমরা যদি সত্যিকার যন্ত্র হয়ে উঠি, তবে তার ফলে ঘটবে ঠিক সেই জিনিস যাকে আমাদের নিজেদেরই সঙ্কল্প ভাগবত জ্যোতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার কর্তব্যকর্মরূপে সাক্ষাৎ দেখতে পায়।

(৩) গ্রহণ-সামর্থ্য—ভগবৎশক্তিকে গ্রহণ করবার, তার জাগ্রত অধিষ্ঠানকে এবং তার মধ্যে আবার মায়ের জাগ্রত অধিষ্ঠানকে অনুভব করবার ক্ষমতা, তাকে কাজ করতে দেওয়া যাতে আমাদের দৃষ্টিকে, সঙ্কল্পকে, কর্মকে সে পরিচালিত করতে পারে। যদি এই শক্তি ও জাগ্রত অধিষ্ঠান অনুভব করা যায়, আর এই সহজ-নম্যতা কর্ম-চেতনার অভ্যাসেই পরিণত হয়—কিন্তু সে সহজ-নম্যতা থাকা চাই কেবল ভাগবত শক্তির কাছে, বিজাতীয় উপকরণ কিছু সে যেন সঙ্গে না নিয়ে আসে—তা হলে পরিণামে সাফল্য সুনিশ্চিত।

পূর্ণযোগের বৈশিষ্ট্য

যে সাধকের যেমন লক্ষ্য, মোক্ষবিষয়ে যাঁহার যেরূপ ধারণা তদনুসারে তাঁহার সাধন-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দেশে হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই সকল বিভিন্ন যোগসাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে।

হঠযোগীর উদ্দেশ্য দেহ ও প্রাণশক্তিকে পরিশুদ্ধ ও বশীভূত করিয়া অমিত শক্তি-সামর্থ্য, অফুরন্ত পরমায়ু লাভ করা। এজন্য তিনি নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এ সকলের বিশেষ কোনও সার্থকতা নেই। পূর্ণযোগীও আধারের অর্থাৎ দেহের অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু সেজন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনাদি আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

রাজযোগের উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তিনিরোধদ্বারা আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থান ('যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, ততো দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্')। চিত্তকে সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য করিতে পারিলেই আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই উদ্দেশ্যে রাজযোগী অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করেন—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—রাজযোগের এই অষ্টাঙ্গ। এই সাধনার সিদ্ধাবস্থায় সাধক নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া চিরানন্দে নিমগ্ন হইয়া যান। ইহাই কৈবল্যসিদ্ধি, মোক্ষ বা পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি।

চিত্তের প্রশান্তি ও ধ্যান-ধারণা সকল সাধনারই প্রয়োজন। পূর্ণযোগী সে উদ্দেশ্যে রাজযোগের বিধি-নিয়মও আবশ্যক মত অনুসরণ করেন। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া তুরীয় লোকে চলিয়া যাওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম নিঃশ্রেয়স বলিয়া পূর্ণযোগী মনে করেন না। তিনি চান অতীন্দ্রিয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া,

আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই অধ্যাত্ম-চেতনাকে ইহজগতে জাগ্রত করিতে, সচ্চিদানন্দের চিন্ময়ী শক্তির সহায়ে নিম্নপ্রকৃতিকে—দেহ, প্রাণ, মনকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্যজীবন উপভোগ করিতে।

যোগত্রয়ী ও পূর্ণযোগ

জীব ব্রহ্মেরই অংশ ('মমৈবাংশো জীবভূতঃ') ব্রহ্মকণা, ব্রহ্মঅগ্নিরই স্ফুলিঙ্গ। স্ফুলিঙ্গে অগ্নির লক্ষণ থাকিবেই, কাজেই জীবেও ব্রহ্মলক্ষণ আছে। কিন্তু উহা অস্ফুট, বীজাবস্থা। জীব একাধারে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। সুতরাং তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি, —কর্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। কর্মশক্তির বিকাশ চেষ্টনায় (Conation, Action), জ্ঞানশক্তির বিকাশ ভাবনায় (Cognition, Thought), ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কামনায় (Emotion, Desire)। এই তিনটি শক্তি সচ্চিদানন্দের তিনটি শক্তির অনুরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দ—কর্ম, জ্ঞান, প্রেম, এই তিনটিই জীবে আছে, কিন্তু উহা অস্ফুট, অপূর্ণ প্রকৃতি-জড়িত, অবিশুদ্ধ। জীবের অন্তর্নিহিত এই তিনটি শক্তি সাধনবলে বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই তিনটির অনুসরণেই তিনটি সাধনমার্গের নাম হইয়াছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। জীবের কর্ম বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই উহা কর্মযোগ হয়, জীবের জ্ঞান বা ভাবনা ঈশ্বরমুখী হইলেই উহা জ্ঞানযোগ হয়, জীবের কামনা বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই প্রেমভক্তিযোগ হয়। এই তিনটির যুগপৎ অনুষ্ঠানেই জীবের পূর্ণবিকাশ, সচ্চিদানন্দের সাধর্মলাভ ('মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—গীতা)।

জ্ঞানযোগী আত্মানাত্মবিবেক-বিচারপূর্বক শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন।

পূর্ণযোগী বলেন—ব্রাহ্মীস্থিতিই শেষ কথা নয়। 'জ্ঞানযোগের অভাব এইখানে যে মানুষকে তুরীয় অতীন্দ্রিয় বস্তুটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া তাহার ইহলোকত্রয়, তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে একেবারে তুচ্ছ, অগ্রাহ্য করিয়াছে। দেহপ্রাণ মনে অসত্য অনৃতের খেলা আছে, কিন্তু ইহারা একান্ত অসত্য, অনৃত নহে! উহাদিগকে সচ্চিদানন্দ বস্তুতেই গড়িয়া তোলা যাইতে পারে এ কথা জ্ঞানযোগী ধরিতে পারেন নাই।.... খণ্ডকে, সীমাকে তিনি দূর করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যকেও হারাইয়াছেন। একীকরণ বুঝিয়াছেন, কিন্তু সমীকরণ বুঝেন নাই। পূর্ণযোগের সাধক আমরা এককে চাই, কারণ একেই প্রতিষ্ঠা; কিন্তু সেই এককে ফুটাইয়া তুলিব বহুতে, ব্রহ্মকে জাগ্রত করিব দেহ, প্রাণ, মনে। একের ও বহুর, ব্রহ্মের ও জগতের

অতীন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে আমাদিগকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, উভয়ের মিলনস্থানটি, সামঞ্জস্য তত্ত্বটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।'

(শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি, তুরীয় চৈতন্য। কিন্তু সেই ব্রহ্ম তো কেবল চৈতন্যস্বরূপ নন, আনন্দস্বরূপও রসস্বরূপও। ভক্ত চান সেই—তুরীয় আনন্দস্বরূপ, সেই রসময়, সেই প্রেমময় ভগবানকে। ভক্তের পথ ভগবৎ-শরণাগতি, আত্মসমর্পণ।

পূর্ণযোগে ভক্তির বিশিষ্ট স্থান আছে। ভাগবত শক্তির নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ উহার মুখ্য কথা। পূর্ণযোগী জানেন ভগবানের এই জগৎ-লীলা আনন্দময়েরই আনন্দলীলা। এই লীলার সাথী হওয়াই পূর্ণযোগীর লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ণযোগী বলেন যে, ভগবান জীবকে কেবল রসভোক্তা করেন নাই, কর্মীও করিয়াছেন। ভাবের মাদকতায় যদি ভক্তির সাধক ক্রমশ কর্মজগৎ হইতে দূরে সরিয়া যান তবে তিনি ভাগবত কর্ম করিবেন কীরূপে; লীলাময়ের লীলার সাথী হইবেন কীরূপে? ইহাই ভক্তিমার্গের অভাব।

কর্মযোগের বিশিষ্ট লক্ষণ—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ, সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ। পূর্ণযোগীও এ সকল গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য দিব্যজীবন লাভ করিয়া ভগবৎকর্ম করা। কিন্তু অনেকে কর্মযোগ সাধন করেন মুক্তিলাভের জন্য, পূর্ণযোগীর উদ্দেশ্য ঠিক তাহা নয়। মুক্তিলাভ করিয়াও, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াও ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য তিনি নিষ্কাম কর্ম করেন, উহাই প্রকৃত ভগবৎকর্ম।

পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য ভাগবত জীবনলাভ। জীবন অর্থ কর্ম, জ্ঞান, প্রেম। এ তিনটি মানুষে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাহাতে এ তিনটিই ঈশ্বরমুখী হইয়া যুগপৎ পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে তাহাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। সুতরাং উহাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—এ তিনেরই পূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে, এই হেতুই ইহাকে পূর্ণযোগ বলা হয় (Synthesis of Yoga, Integral Yoga)।

পূর্ণযোগের ফল

আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য হইতেছে—অতিমানস চেতনায় বিজ্ঞানভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া, মনোময় মানবকে বিজ্ঞানময় অতিমানবে পরিণত

করা। অতিমানব মুক্তপুরুষ, কিন্তু তাহার মুক্তি সাযুজ্য মুক্তি নয়, সাধর্ম্যমুক্তি। তাঁহার সমগ্র সত্তা রূপান্তরিত হয় ভাগবতী চিন্ময়ী শক্তির পরশে, তাঁহার সকল কর্ম পরিচালিত হয় ভাগবত প্রেরণায়, তাঁহার ভাব, তাঁহার ধর্ম ও ভগবানের ধর্ম এক হইয়া যায়।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মানুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। —গীঃ ৪।১০

—বিষয়ানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়া, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন হইয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন (আমার সাধর্ম্য রূপ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন)।

ইহাই মুক্ত জীবন, ভাগবত জীবন। কিন্তু 'ভাগবত জীবন যাহা তাহা শুধু মুক্তিতে নয়, তাহাতে আছে আবার শুদ্ধি, ভুক্তি, সিদ্ধি। অখণ্ড শুদ্ধি একদিকে ভাগবত সত্তাটিকে আমাদের সত্তার মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া দেয়, আর একদিকে সত্তার যে সত্য ধর্ম, সত্য কর্ম—ঋত—তাহাকেও ফুটাইয়া তুলে আমার কর্মজীবনের মধ্যে। যে জটিল যন্ত্রসমষ্টি লইয়া আমার আধার তাহা যতদিন শুদ্ধ না হইতেছে, যতদিন ভাগবত প্রেরণার প্রণালী না হইয়া উঠিতেছে, ততদিন পূর্ণ মুক্তি নাই। আর এই শুদ্ধি যখন পাইয়াছি তখন পাইয়াছি পূর্ণ ভুক্তি—জগতের অতীতে যে আনন্দঘন তাহাও উপভোগ করি, আর জগতে যত কিছু বস্তু সে সকলেরও রসভোগ করি, সেই আনন্দস্বরূপের প্রতীকরূপে বিগ্রহরূপে। আধার শুদ্ধ হইলে, তাহার স্তরে স্তরে ভাগবত আনন্দ প্রতিষ্ঠা হইলে, মানুষ হইয়া উঠে মানবধর্মাবলম্বী ভগবান—তাহাই সিদ্ধি। মানবের প্রকৃতিতে ভগবান তখন আবির্ভূত হন, তাহার সত্তায়, তাহার প্রেমে, তাহার আনন্দে, তাহার জ্ঞানে প্রকটিত হন সেই ঈশ্বর যিনি যুগপৎ এক ও বহু, যিনি জ্ঞান ও শক্তি, যিনি সৎ ও তপঃ, —মানুষ মানুষ হিসাবেই তখন পূর্ণ সার্থক— কোনও অংশকে, কোনও অঙ্গকে, কোনও প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করিয়া নয়, সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া আপন অখণ্ড সমগ্রতায় মানুষ তখন মহীয়ান।

আর এই যে অখণ্ডতা পূর্ণতা তাহা বিশ্ব-মানবকে লইয়া....বিশ্বমানবের সহিত যে একাত্মতা অনুভব করিতেছি তাহা তো অব্যর্থভাবেই আমাকে চালাইয়া লইবে আমি যে অমৃতত্ব পাইয়াছি সকলকেই তাহার অধিকারী করিয়া তুলিতে। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধির অর্থ বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি।'

—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

'চাহিনা ছিঁড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে রব মুক্তি-সমাধিতে।' —রবীন্দ্রনাথ

পূর্ণযোগের দার্শনিক ভিত্তি

'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—ইহাই তো সকল শাস্ত্রের, সকল যোগের, সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যের যদি এই অর্থই হয় যে, এক ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়া-মরীচিকা, তাহা হইলে পুরাণশাস্ত্রাদি দূরে থাকুক, মূল উপনিষদেরই অনেক কথা সহজ বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্য, প্রাচীনকালেই শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ এই মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতকেশরী আচার্যদেবের অদ্বিতীয় মনীষার প্রভাবে এই মত একসময়ে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, লোকে বেদান্ত বলিতে শাঙ্কর-বেদান্ত অর্থাৎ মায়াবাদই বুঝিত।

বলা বাহুল্য, এই মতবাদ গ্রহণ করিলে শ্রীঅরবিন্দের এই 'দিব্যজীবনবাদ' জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। জীবনই যেখানে অগ্রাহ্য, সেখানে 'ভাগবত-জীবন' তো 'অশ্বডিম্ব' বা 'শশশৃঙ্গ', —কথা আছে, বস্তু নাই।

শ্রীঅরবিন্দ এই মায়াতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, পুরুষ, প্রকৃতি, 'সত্য ঋতং' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যেরূপ সুসমঞ্জস সুবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রাচীন বা আধুনিক কালে সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নেই। কিন্তু তিনি এই মতবাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

আবার নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই যদি পরতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহাতেও এই জীবনবাদের স্থান নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব উভয়ই উপাধিমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয় ('ঈশ্বরত্বং চ জীবত্বং উপাধিদ্বয়কল্পিতম্—পঞ্চদশী) তাহাতে 'ভাগবত-জীবন' বলিয়া কোনও বস্তুর সমাবেশ হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের এই জীবনবাদের ভিত্তি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি। এক ব্রহ্মই যখন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎ-লীলা করেন তখন তিনি নির্গুণ থাকিয়াও সগুণ হন—'লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ'—ভাঃ। কেবল নির্গুণ তত্ত্বে জীবজগতের ব্যাখ্যা হয় না, পরমহংসদেবের ভাষায়, 'আমি নিত্য লীলা দুই-ই লই, নইলে ওজনে কম পড়ে।'

শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণ-সগুণ উভয়বিধ বর্ণনাই আছে। এই 'নির্গুণো-গুণী' ব্রহ্মই শ্রীগীতাতে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে পুরুষোত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীগীতাতে তিন পুরুষের উল্লেখ আছে—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ, উত্তম পুরুষ (গীঃ ১৫।১৬—১৮)। শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি তত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'ক্ষর' হইতেছে সচল, পরিণামী—আত্মার বহুভূত বহুরূপে যে পরিণাম তাহাকেই ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে। এখানে পুরুষ বলিতে ভগবানের বহুরূপ (Multiplicity of the Divine Being) বুঝাইতেছে—এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নয়, ইহা প্রকৃতিরই অন্তর্গত। 'অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী, নীরব, নিষ্ক্রিয় পুরুষ, উহা ভগবানের একরূপ (The Unity of the Divine Being) প্রকৃতির সাক্ষী; কিন্তু প্রকৃতি ও তাহার কার্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরম পুরুষই উত্তম, উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণামী একত্ব, এই দুই-ই উত্তমের। তাঁহার প্রকৃতির তাঁহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন; আরও মহান নীরবতা ও অচলতাদ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুই-এরই উপরে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা উপনিষদে প্রায়ই সূচিত হইলেও গীতাতেই উহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধর্মচিন্তার উপর এই ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে সর্বোত্তম ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায়, ইহাই (অর্থাৎ পুরুষোত্তম তত্ত্বই) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণসমূহের মূলে এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। —শ্রীঅরবিন্দের গীতা

এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের ভিত্তি। উহাদ্বারাই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, জ্ঞানবাদিগণের নির্গুণব্রহ্মবাদে তাহা হয় না।

বৈদিক ধর্মের এক প্রধান বিরোধ প্রাচীনকাল হইতেই চলিতেছিল, বেদবাদে ও বেদান্তবাদে, কর্মে ও জ্ঞানে। প্রকৃতপক্ষে এ উভয়ই বেদ-বাদ, কেননা বেদান্ত বেদেরই শিরোভাগ। তাই দেখি মহাভারতে শুকানুপ্রশ্নে শুকদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।—
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাং চ গচ্ছন্তি কর্মণা।।

কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর, এই দুই-ই বেদের আজ্ঞা; তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কোন্ গতি লাভ হয়, আর কর্মদ্বারাই বা কোন্ গতি লাভ হয়? (শাং ২৪০।১)

মহাভারতে বিভিন্ন স্থলে ইহার দুই রকম উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এক উত্তর এই—

কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।। —শাং ২৪০

—কর্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়; সেই হেতু পারদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না। আর এক উত্তর এই—

তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্মানিমান্ সর্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ।।
তস্মাৎ কর্মসু নিস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।

—কর্ম কর, কর্মত্যাগ কর দুই-ই বেদাজ্ঞা। সেই হেতু কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম করিবে (বন, ২।৭৪)। সেই হেতু যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা আসক্তি ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন (অশ্ব, ৫১।৩২)। এইটিই শ্রীগীতার মত। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের প্রধান লক্ষণ, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ও আসক্তি ত্যাগ ('তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর')।

এইরূপে শ্রীগীতা জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। অধিকন্তু শ্রীগীতা কর্মকে ঈশ্বরার্পিত করিয়া ভক্তিপূত করিয়াছেন। শ্রীগীতার পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রসমূহে ভক্তি কোথাও সাধনমার্গরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীগীতা ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল। শ্রীগীতা কেবল জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ ভঞ্জন করেন নাই, আবার উহার সহিত ভক্তিও সংযুক্ত করিয়া দিয়া সনাতন ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। এই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্র গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগ শ্রীঅরবিন্দ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণের সাম্প্রদায়িক মতসকল সম্পূর্ণরূপে নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার উপদিষ্ট এই পূর্ণযোগ এবং তাঁহার ব্যাখ্যাত গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গযোগের লক্ষ্য একই।

শ্রীঅরবিন্দের বাণী

১

১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এদিন ভারতে একটা যুগের শেষ হল, আরম্ভ হল নতুন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যই নয়, এশিয়াব জন্যে, সমগ্র জগতের জন্য এ দিনের অর্থ রয়েছে। সে অর্থ হ'ল নেশনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা নূতন নেশনশক্তির আবির্ভাব, অফুরন্ত যার ভবিষ্য-সম্ভাবনা, মানবজাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ভবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এ জিনিসটি নিশ্চয়ই প্রীতিকর যে, যে-দিনটি আমার স্মরণীয় ছিল আমার নিজের জন্মদিন হিসাবে, আমার জীবন-সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারাই যে-দিনটিতে উৎসব করে এসেছে, ঠিক সেই দিনটি আজ অর্জন করেছে এক বিপুল অর্থ। অধ্যাত্ম-পন্থী হিসাবে এই যোগাযোগটি আমি কেবল একটা হঠাৎ-যোগ বা আকস্মিক-ঘটনা রূপে গ্রহণ করি না, তা হ'ল, যে কাজ নিয়ে আমার জীবন আমি সুরু করি তাতে ভগবৎশক্তির নির্দেশই আমার প্রতিপদ চালিয়ে নিয়েছে। ফলত যে সব জাগতিক আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য আমি দেখে যেতে পারব আশা করছি, একসময়ে যাদের মনে হত অসম্ভব স্বপ্ন বলে, আজ দেখছি তারা তাদের গন্তব্যের নিকটে গিয়ে পৌঁছেছে, অন্তত তাদের কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে, সাফল্যের পথে উঠেছে গিয়ে।

আজকার এই মহৎ উদ্যোগে আমার কাছে বাণী চাওয়া হয়েছে, কিন্তু বাণী দেওয়ার মত সম্ভাবনা এখন আমার নেই। তবে এক আমি সকলকে জানাতে পারি আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, শৈশবে যৌবনে যারা অঙ্কুরিত হয়েছে, এখন যাদের ফলোদ্‌গম হতে চলেছে—কারণ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এইজন্যে যে সেসব হ'ল আমার মতে ভারতের যা ভবিষ্য কর্ম, যাতে ভারত নেতৃস্থান না গ্রহণ করেই পারে না, তাঁর অঙ্গীভূত। আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান, আর নিজের স্থূল স্বার্থসেবার জন্য নয় কেবল, নিজের প্রসার, মহত্ত্ব, শক্তি সমৃদ্ধি লাভের জন্য নয়—যদিও এসকলকে অবহেলা করা তার উচিত হবে না—তবে তার জীবন ধারণ হবে ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, সকল মানবজাতির সহায় ও নেতারূপে।

২

যারা ভগবানের কাছে নিজেদের দিয়ে দেয় নিঃশেষে সর্বাঙ্গ ধরে, ভগবানও তাদেরই কাছে নিজেকে দিয়ে দেন—তাদেরই জন্য শান্তি, জ্যোতি, শক্তি, রতি, মুক্তি, বৃহতের প্রসার, জ্ঞানের শিখর, আনন্দের সাগর।

৩

সকলের ভিতর হ'তে, সাধু সন্ত ঋষির ভিতর হ'তে যেমন তেমনি তস্কর, পতিতা এবং অস্পৃশ্যের ভিতর হ'তেও সেই 'প্রিয়তম' আমাদের পানে চেয়ে দেখেন এবং ডেকে বলেন, 'এই যে আমি।'

৪

জীবনে যাদের নাই ঊর্ধ্ব-স্পৃহা তারা ভগবানের ব্যর্থ সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতিদেবী খুশি হন তাতে এবং তাদের সংখ্যা বাড়াতে ভালবাসেন, কারণ তারা তার স্থিতিতে এনে দেয় নিশ্চয়তা এবং তাঁর রাজ্যকে করে দীর্ঘস্থায়ী।

৫

আমাদের ধর্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা-শোভিত। তাহার মূল গভীরতম জ্ঞানে আরূঢ়, তাহার শাখাগুলি কর্মের অতি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বত্থবৃক্ষ, ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখ, তেমনি এই ধর্ম জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত, কর্মপ্রেরক, নিবৃত্তি তাহার ভিত্তি, প্রবৃত্তি তাহার গৃহছাদ, দেওয়াল, মুক্তি তাহার চূড়া। মানব জাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল হিন্দুধর্ম বৃক্ষের আশ্রিত।

৬

বাঙ্গালির ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙালি ভারতের কেন, জগতের নেতা হ'য়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালি তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি।

৭

শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে। ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে ? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

আমাদের যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্রানন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপ যদি পাই তাই যথেষ্ট।

৯

যিনি মুক্ত তাঁর হল পূর্ণ এবং সর্বগ্রাহী জ্ঞান ('কৃৎস্নবিদ্'), সকল কাজ করেন তিনি মনের শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ('কৃৎস্নকৃৎ')—অন্তরস্থ দিব্যেষণা ও অসীম শক্তির বেগ এবং স্বাতন্ত্র্যের অনুগত হয়ে। যেহেতু অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত তাই অমর জীবনের আধ্যাত্মিক অখণ্ড আনন্দ ভোগ করেন তিনি। ফিরে দাঁড়ান ভাগবত পুরুষের দিকে— যে ভাগবত পুরুষের তিনি এক অংশ, যা তাঁর কর্মের ঈশ্বর, তাঁর আত্মা এবং প্রকৃতির দিব্যপ্রেমিক।

১০

মানুষের মনে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাবের উদয় একটা সঙ্কেত দেয় যে, ভবিষ্যতে মানুষের জীবন ও সমাজে আসবে এক মহা পরিবর্তন। সেই নূতন বাধা পেতে পারে, পুরাতন ভাবধারা সাময়িকভাবে তার উপর জয়ী হতে পারে, কিন্তু এই সংঘর্ষ পূর্বেকার প্রাথমিক অবস্থার সমাজগত চিন্তা ও অনুভূতি সব অথবা আচার ও প্রতিষ্ঠান সবের এনে দেয় পরিবর্তন। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে হোক, সে এগিয়ে চলে—তার এ পরিবর্তন অনিবার্য। পুরাতন সব রূপাবলী নূতনের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় কিম্বা পূর্বের ধারাবাহিকতা রেখেই ভিতরে ভিতরে লাভ করে গভীর পরিবর্তন। আর না হয় তারা এক কঠিনতর আড়ষ্টতার, পরিবর্ধমান দুর্নীতির, অন্তঃশক্তির ক্রম-অবনতির, সত্যকার শক্তির অপহ্নবের যুগে গিয়ে পড়ে—এ-সব ভবিষ্যতে তাকে অমোঘভাবে নিয়ে চলে অধিকতর দুর্বিপাকের মধ্যে, পরিপূর্ণ ধ্বংসের মধ্যে। অতীত হয় আংশিকভাবে উৎবর্তিত হতে পারে নয়ত লাভ করতে পারে অসাড়ত্ব যদি না জানে ভবিষ্যতের সঙ্গে উদার হয়ে সন্ধি করে চলতে।

১১

কোন জাতিবিশেষের জন্য আমাদের সাধনা নয়। সমস্ত জাতির মুক্তি ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের চিন্তার কেন্দ্র হবে। সমষ্টি সাধনা করতে ব'সে যেন আমরা য়ুরোপের মত আড়ম্বরশীল যান্ত্রিক রাজ্য (mechanised state) না গড়ে' তুলি। প্রতি মানব-জীবনেব পরিপূর্ণ সার্থকতা আনাই হচ্ছে এই যোগের উদ্দেশ্য। যোগের সহায়ে মানুষ যেদিন উপলব্ধি করবে, স্থানকালের ব্যবধানে মানুষের স্বতন্ত্র জাতি নেই, ধর্ম নেই, স্বার্থ নেই, তখন এক অভিনব ঐক্যের ওপর নূতন রাজ্য গড়ে' উঠবে—উহাই হবে দেবরাজ্য।

১২

All religions have saved a number of souls but none yet has been able to spiritualise mankind. For that there is needed not cult and creed, but a sustained and all-comprehending effort at spiritual self-evolution.

The changes we see in the world today are intellectual, moral, physical in their ideal and intention; the spiritual revolution waits for its hour and throws up meanwhile its waves here and there. Until it comes the sense of the others cannot be understood and till then all interpretations of present happening and forecast of man's future are vain things. For its

nature, power, event are that which will determine the next cycle of our humanity.

১৩

The Coming of the Spiritual Age

The change from the mental and vital to the spiritual order of life, must necessarily be accomplished in the individual and in a great number of individuals before it can lay any effective hold upon the community. The spirit in humanity discovers, develops, builds into form in the individual man; it is through the progressive and formative individual that it offers the discovery and the chance of a new self-creation to the mind of the race.... Thinkers, historians, sociologists who belittle the individual and would like to lose him in the mass or think of him chiefly as a cell, an atom, have a got hold only of the obscurer side of the truth of Nature's workings in humanity.

১৪

The Bharat Shakti

A civilisation may be predominantly material like the modern European culture, or predominantly mental and intellecutal like the old Graeco-Roman or predominantly spiritual like the still persistent culture in India.

India's central conception is that of the Eternal, the Spirit here incased in matter, involved and immanent in it, evolving on the material plane by rebirth, of the Individual up the scale of being till in mental man it enters the world of ideas and realm of conscious morality, dharma; that develops until the increasing manifestation of the sattwic or spiritual portion of the vehicle of mind enables the individual being to identify itself with the pure spiritual consciousness. India's social system is built upon this conception, her philosophy formulates it, her religion is the aspiration to the spiritual consciousness and its fruits, her art and literature have the same upward look, her whole dharma or law of being is founded upon it.

১৫

The Master Idea of Indian Culture

The master idea that has governed the life, culture, social ideals of the Indian people has been the seeking of man for his true spiritual self and the use of life—subject to a necessary evolution first of his lower physical, vital and mental nature—as a frame and mean for that discovery and for man's ascent from the ignorant nature into the spiritual existence.

মায়ের প্রার্থনা

১

মা আমাদের, ভারতের আত্মশক্তি, মা তুমি, তোমার সন্তানদের কখনও ছেড়ে যাওনি তুমি, গাঢ়তম অবসাদের দিনেও, এমন কী যখন তারা তোমার কথায় কর্ণপাত করেনি, সেবা করেছে অন্য ইষ্ট, অস্বীকার করেছে তোমায় তখন পর্যন্ত—এখন তারা ফিরে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাই তো এই মুক্তির ঊষায়, এই দিব্য মুহূর্তে যখন জ্যোতি ফুটে উঠেছে তোমার মুখমণ্ডলে, প্রণতি জানাই তোমায়। পথ দেখিয়ে নাও আমাদের, —যাতে মুক্তির উন্মুক্ত প্রসার নিয়ে যায় সত্যকার মহত্ত্বের প্রসারে, নিয়ে যায় জাতিসমূহের সম্মেলনক্ষেত্রে তোমার সত্যকার জীবনধারায়। পথ দেখিয়ে নাও যাতে আমরা সর্বদা যেন মহৎ আদর্শের পক্ষে দাঁড়াই, মানবজাতিকে দেখাতে পারি তোমার সত্যকার স্বরূপ, —অধ্যাত্ম সাধনার পথে দিশারী, সকল লোকের মিত্র এবং সহায়।

২

এই নূতন বৎসরের প্রথম মুর্হূতটি উৎসর্গ করলাম তোমাকেই—তুমি যাবতীয় মঙ্গলের অদ্বিতীয় বিধান-কর্তা, জীবনের সার্থকতা তুমিই এনে দিয়েছ তাকে শুচিময়, শ্রীময়, কল্যাণময় করে। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা তুমি, তুমি আমাদের সকল আস্পৃহার লক্ষ্য। এভাবে মহিষ্ঠ হয়ে উঠে যেন নব বৎসর। তোমার আশায় চলেছে যারা, তারা যেন তোমাকে খোঁজে সত্য পথে, যারা তোমাকে খোঁজে তারা যেন পায় তোমাকে, যারা কষ্ট ভোগ করে কিন্তু জানে না কোথায় প্রতিকার, তারা যেন অনুভব করে তোমার জীবনধারা ধীরে ধীরে তাদের তমসাচ্ছন্ন চেতনার কঠিন আবরণ ভেদ করে চলেছে।

কল্যাণবহ তোমার যে ভাস্বর মহিমা তার সম্মুখে গভীর ভক্তিভরে, অশেষ কৃতজ্ঞতায় প্রণত আমি। কৃতজ্ঞতা জানাই পৃথিবীর হয়ে, তুমি এসে আবির্ভূত হও, পৃথিবীর হয়ে তোমায় মিনতি করি তুমি প্রকট হও নিরন্তর পূর্ণতররূপে, তোমার জ্যোতি তোমার প্রেম যেন অবিরাম বৃদ্ধি লাভ করে।

আমাদের চিন্তার, আমাদের অনুভবের, আমাদের কর্মরাজির অদ্বিতীয় অধীশ্বর হও তুমি।

তুমিই আমাদের সত্যসত্তা, তুমি একমাত্র সত্যসত্তা। তোমাকে ছেড়ে সবই মিথ্যা মরীচিকা, সবই শোকবহ অন্ধকার।

তোমারই মধ্যে জীবন জ্যোতি আনন্দ।
তোমারই মধ্যে পরমা শান্তি।

৩

ভগবান! আগুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, ঝরণা যেমন তৃষ্ণা জুড়ায়, তরু যেমন ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে, আমি যেন সেই রকম হ'তে পারি...মানুষেরা এত দুঃখী, এত অবোধ, তাদের সাহায্যের এত প্রয়োজন!

তোমাতেই আমার নির্ভর। আমার অন্তরের নিশ্চয়তা দিনে দিনে বাড়ছে, প্রতিদিন আমি অনুভব করছি আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা আরও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, তোমার জ্যোতি যুগপৎ মধুরতর ও উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। ক্রমেই আমি আমার জীবন থেকে তোমার কর্মকে, আমার ব্যক্তিত্ব থেকে সমগ্র পৃথিবীকে আর পৃথক্ করে রাখতে পারছি না।

ভগবান! ভগবান! অসীম তোমার মহিমা, অপরূপ তোমার সত্য। তোমার সর্বশক্তিমান প্রেমেই পৃথিবীকে উদ্ধার করবে।

৪

পৃথিবীর উপর নেমে এসেছে অন্ধকার—গাঢ়, প্রচণ্ড, বিজয়ী প্রাকৃতিক জগতে রয়েছে শুধু দুঃখ, ভীতি ও বিনষ্টি। একটা শোকের আবরণ তোমার প্রেমের জ্যোতির প্রোজ্জ্বল মহিমাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

মা! অসীম প্রেমে আমি তোমাতে ডুবে যাই, আর যিনি সকল জিনিসের অধীশ্বর একান্ত মিনতি জানাই তাঁকে, যেন তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে দেন, যেন তাঁর কর্মের পথ তিনিই আমাদের নির্দেশ করে দেন যাতে আমরা নির্ভয়ে সে-পথে চলতে পারি।

সময় আসন্ন হয়ে এসেছে, ভগবান! দিব্যশক্তি সকলের আসতেই হবে আর্ত পৃথিবীকে সাহায্য করতে।

মা! করুণাময়ী মা আমার! তোমার সকল সন্তানকে তোমার বিশাল বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গনে তুমি ধরে রেখেছ, সবাইকেই তোমার ভালবাসা সমানভাবে ঘিরে রয়েছে।

আমি হয়েছি তোমার প্রেমের পাবনী শিখা। ভগবান! হে নীরব অচিন্তনীয়! প্রেমের এই হোমকুণ্ডে তুমি পূর্ণাহুতি গ্রহণ কর। তোমার রাজত্ব আসুক, অন্ধকার ও মৃত্যুর উপর বিজয়ী হোক তোমারই আলো। তোমার শক্তিকে প্রকাশ কর; প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমরা তোমাকে আবাহন করছি।

হে ভগবান! প্রকাশ কর তোমার শক্তিকে।

৫

প্রতি মুহূর্তে যা-কিছু অদৃষ্টপূর্ব, যা-কিছু অজ্ঞাত সব রয়েছে ঠিক সম্মুখে আমাদের—প্রতি মুহূর্তে সমস্ত বিশ্ব আপনাকে নূতন করে সৃষ্টি করে চলেছে সমগ্র ভাবে এবং প্রত্যেক অঙ্গে অঙ্গে। আমাদের যদি থাকত সত্যকার জীবনবিশ্বাস, যদি তোমার সর্বশক্তিমত্তা ও তোমার অদ্বিতীয় সত্তায় পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি, তা হলে প্রতি মুহূর্তে তোমার প্রকাশ এত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে সারা বিশ্ব তার কল্যাণে রূপান্তরিত হয়ে যেত। কিন্তু আমরা আমাদের যা-কিছু ঘিরে রয়েছে, যা-কিছু আমাদের আগে হয়ে এসেছে তার এতখানি দাস, যা কার্যত এ যাবৎ প্রকাশ পেয়েছে তার গণ্ডির মধ্যে আমরা এতখানি আবদ্ধ, আমাদের বিশ্বাস এত পঙ্গু, যে মহারূপান্তরের সে অঘটন-সংঘটনের যন্ত্র হওয়ার সামর্থ্য আমাদের আসে নাই।

তা হলেও ভগবান, আমি জানি সেদিন আসবে। আমি জানি একদিন আসবে যখন আমার কাছে যারাই উপস্থিত হবে তাদের সকলকেই তুমি রূপান্তরিত করবে, এতখানি রূপান্তরিত করবে যে, অতীতের সকল বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তারা তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন জীবনযাপন করতে শুরু করবে, সে জীবন তোমাকে দিয়ে তৈরি, তুমিই তার একচ্ছত্র অধীশ্বর। তখন সকল বিক্ষোভ প্রসন্নতায় পরিণত হবে, সকল বেদনা শান্তিতে, সকল সংশয় নিশ্চয়তায়, সকল কুশ্রী সুশ্রীতে, সকল অহংকার আত্মদানে, সকল অন্ধকার আলোতে আর সকল যন্ত্রণা পরিণত হবে এক অচঞ্চল সৌমনস্যে। কিন্তু এই যে অলৌকিক সংঘটন, তা কি তুমি ইতিমধ্যে সম্পাদন করছ না? আমি ত দেখছি চারিদিকেই তা ফুটে উঠেছে। প্রেমের সৌন্দর্যের দিব্য বিধান তুমি, তুমি পরম মুক্তিদাতা। তোমার শক্তির সম্মুখে কোনও বাধা নাই। আমরা অন্ধ, তাই দেখি না তোমার নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের সে অভয় দৃশ্য। হৃদয় আমার গায় হর্ষের স্তোত্র, চিন্তায় জ্বলে ওঠে পুলকের আলো।

লোকোত্তর, অপরূপ তোমার প্রেম, বিশ্বের একচ্ছত্র অধীশ্বর!

৬

ভগবান, প্রেমের অধিপতি, চিরজয়ী তুমি। তোমার সঙ্গে একসুরে বাঁধা যারা যাদের জীবন তোমার জন্যে তোমায় ধরে, তাদের জয় হবে সর্বত্র। কারণ তোমাতেই পরমা শক্তি, যে শক্তি আসে পূর্ণ অনাসক্তি, সমুচ্চ দিব্য দৃষ্টি, অপার কারুণ্য হতে।

তোমার মধ্যে তোমার দ্বারা সকল জিনিস রূপান্তরিত হয়, মহিমান্বিত হয়। তোমারই মধ্যে রয়েছে সকল রহস্যের, সকল শক্তিমত্তার মূল উৎস। এক তোমার মধ্যে বসবাস করা, তোমার সেবা করা, বহুজন মুক্তিকল্পে যত সত্বর সম্ভব তোমার দিব্যকর্মে সিদ্ধি নিয়ে আসা—এ ছাড়া আর কোনও কামনা নাই যাদের তারাই কেবল তোমাতে পৌঁছোতে পারে।

ভগবান, এক তুমিই সৎ বস্তু, আর সব অলীক। তোমার মধ্যে যখন বাস করা যায়, তখনই সব জিনিস দৃষ্টিগোচর হয়, হৃদয়ঙ্গম হয়, তোমার পরাজ্ঞানকে এড়িয়ে কোনও কিছু যেতে পারে না, অথচ বাহ্যত সবেরই অন্যরূপ। সবই তুমি মূলত, সবই তোমার কর্মধারায়। তোমার করুণাময় হস্তক্ষেপের ফল—তাই তো অতি ভয়াল তমিস্রার অন্তরে তুমি জ্বালিয়েছ নক্ষত্র এক।

আমাদের নিষ্ঠা নিরন্তর যেন বর্ধিত হয়ে চলে।

আমাদের আত্মনিবেদন নিরন্তর যেন সুষ্ঠুতর হয়ে চলে। আর তুমি অন্তরে সত্যত অধিপতি— কার্যত এখন জীবনের অধিপতি হয়ে ওঠ।

৭

হে পরমেশ, জীবনের অধিপতি। আমরা যেন উঠে চলে যাই স্থূল দেহযাত্রার সকল দুশ্চিন্তার ঊর্ধ্বে। দেহধারণের লক্ষ্যে সদা নিবদ্ধ এই যত চিন্তা, স্বাস্থ্যের জন্য, আহার্যের জন্য, জীবন আয়তনের এই যত ব্যস্ততা—এদের মত আর কিছুতে মন এত হীন এত পঙ্গু হয়ে পড়ে না। কী নগণ্য এসব জিনিস, একটুখানি ধোঁয়ার রেখা, বাতাসের সামান্য নিঃশ্বাসেই যায় মিলিয়ে—একটুখানি তোমার দিকে চিন্তা তাদের দূর করে দেয় মিথ্যা মরীচিকার মত।

এ দাসত্বের অধীন যারা তাদের মুক্ত কর, মুক্ত কর যারা প্রবল রিপুর দাস; তোমার দিকে চলবার পথে এ সমস্তই বাধা—যেমন নিদারুণ আবার তেমনি অকিঞ্চিৎকর। নিদারুণ তাদের পক্ষে যারা এখনও এ সকলের দাস, অকিঞ্চিৎকর তার কাছে যে এসব পার হয়ে গিয়েছে।

কী করে বলব কী পরম স্বস্তি, কী মধুর লঘুত্ব অনুভব হয়, তখন নিজের ভাবনা থেকে মুক্ত হয়েছি, মুক্ত হয়েছি জীবনের স্বাস্থ্যের, ভোগের, এমন কী আত্মোন্নতির পর্যন্ত দুশ্চিন্তা থেকে।

এ স্বস্তি, এই মুক্তি তুমি আমায় দিয়েছ, হে জগৎ-প্রভু, আমার জীবনের জীবন, আমার আলোর আলো, তুমি নিরন্তর আমায় শিখিয়ে দিয়ে চলেছ ভালবাসা কী, আমায় জানিয়ে দিয়েছ আমার জন্মের হেতু।

৮

আমার মধ্যে তুমি বাস কর, কেবল তুমিই। তাহলে আমার নিজেকে নিয়ে আমার কী ঘটবে তা নিয়ে ব্যস্ত হবার আর কী কারণ থাকতে পারে! তুমি যদি না থাকঁতে, তবে এই যে ধূলি-গঠিত দেহখানি তোমায় প্রকাশ করবার চেষ্টায় আছে তা সকল রূপ হারিয়ে, সকল চেতনা হারিয়ে লোপ পেয়ে যেত। তুমি না থাকলে এই যে ইন্দ্রিয়োবোধ সকল প্রকাশকেন্দ্রের (ব্যষ্টি-সত্তার) সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে দেয়, তা একটা তামস জড়তার মধ্যে লয় পেয়ে যেত। তোমাকে ছাড়া, এই যে চিন্তাশক্তি অনুপ্রাণিত উদ্ভাসিত করে রেখেছে আমাদের সত্তার সংহতি, তা হয়ে পড়ত বিক্ষিপ্ত অসমর্থ ব্যর্থ। তোমার বিহনে, যে দিব্যপ্রেম সব জিনিস সজীব করে, সুশৃঙ্খল করে, অনুপ্রাণিত করে, সতেজ করে, তা হয়ে থাকত কেবল একটা এখনও অজানা সম্ভাবনা হিসাবে। তুমি যেখানে নাই সেখানে সব নিষ্প্রাণ, নিরেট, অচেতন। যা-কিছু আমাদের আলো দেয়, মুগ্ধ করে, আমাদের জীবনের সমস্ত অর্থ, সমস্ত লক্ষ্য তা সবই তুমি। এর চেয়ে আর বেশি কী প্রয়োজন—সকল ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হলে, দুপক্ষ মেলে দিয়ে স্থূল জীবনের যাবতীয় অনিত্যতার ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে হলে? তবেই তো উড়ে যেতে পারি তোমার দিব্য সালোক্যের মধ্যে, পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে পারি তোমার বাণীবহ হয়ে, তোমার আসন্ন আগমনীর অপরূপ বার্তা ঘোষণা করতে।

জগদীশ্বর, পরমবন্ধু অনুপম শিক্ষাদাতা, পূর্ণগর্ভ নীরবতার মধ্যে তোমায় প্রণতি জানাই।

ঋষি-কবি—রবীন্দ্রনাথ

এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।

—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বলীলার মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও রচনা স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—কবি রবীন্দ্রনাথ—কাব্য রচনা ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ—অধ্যাত্ম রচনা।

মোটামুটি বলিতে গেলে নৈবেদ্য হইতেই তাঁহার অধ্যাত্ম রচনার আরম্ভ বলা যায়। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতিতে উহার পরিপুষ্টি ও পূর্ণ পরিণতি। তৎকালে রচিত অনেক কবিতায় কবি-জীবনের এই পট-পরিবর্তনের আভাস-ইঙ্গিত স্পষ্টই পাওয়া যায়।

লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।
যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখির বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।

ঘরের ঠিকানা হলো না গো,
মন করে তবু যাই-যাই।
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ'
সে দিকের পথ চিনি নাই।

এতদিন তরী বাহিলাম
বাহিলাম তরী যে পথে,
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি,
যে পথে ভরসা নাহি পাই।

তীর সাধে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে তরীখান
রশি খুলে দিবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

কোথা বুক জোড়া খোলা হাওয়া,
সাগরের খোলা হাওয়া কই।
কোথা মহা গান ভরি দিবে কান,
কোথা সাগরের মহাগান।

কবির এই অধ্যাত্ম কবিতাগুলির বিভিন্নরূপ সমালোচনা দেখা গিয়াছে। ইংরাজি গীতাঞ্জলি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার পরে পাশ্চাত্যদেশে বহু প্রশংসাসূচক সমালোচনা বাহির হয়। এই সমালোচকগণের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক (mystic) বা মরমী কবি বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং খ্রিস্টীয় সাধু ভক্ত কবিগণের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়াছেন। এদেশে অনেকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম রচনার সহিত বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন।

পাশ্চাত্যেরা যাহাকে মিষ্টিক সাহিত্য বলেন, এদেশের ব্রজলীলাবিষয়ক রস-সাহিত্যও প্রায় তাহাই। খ্রিস্টীয় ভক্ত কবিদের প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রেমরস বর্ণনা এবং শ্রীভাগবত ও পদাবলী সাহিত্যের বর্ণনা অনেক স্থলে প্রায় শব্দশ এক রূপ। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

Let Him kiss me with kisses of his mouth.

—Song of Solomon

ইহার ব্যাখ্যাও আছে—

Let Him kiss me with kisses of his mouth—Who is it that speaks these words? It is the Bride. Who is the Bride? It is the Soul thirsting for God.

—প্রিয়তমের মুখ চুম্বন চাহে কে?

প্রিয়তমা বধূ।

বধূ কে? ভগবৎপ্রেম-পিপাসু মানবাত্মা।

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।।

—ভাঃ ১০।৩১।১৪

স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যাচ্ছলে লিখিয়াছেন—

হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত করিয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান।

প্রিয়তমের সেই চুম্বন, তাঁহার অধরের সহিত সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে; ভগবান যাহাকে তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়; তাঁহার পক্ষে চন্দ্রসূর্যের আর অস্তিত্ব থাকে

না; আর সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা।

আর একটি মিষ্টিক বা মরমী কবিতা এই—

Upon my flowery breast
Wholly for him and save himself for none,
There did I give sweet rest
To my Beloved one,
The fanning of the cedars breathed thereon,
All things I then forgot.
My cheek on Him who for my coming came.
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting them.

—St. John of the Cross

অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনাগর
নাগরী চম্পক গোরী।
নব জলধর তনু চাঁদ আগোরস
ঐছে রহল শ্যাম কোরি।।
বিগলতি কেশ কুসুম শিখি চন্দ্রক
বিগলতি নীল নিচোল।
দুহ'ক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিল্লোল।।

খ্রিস্টীয় সাধু সেন্ট জন এবং নব রসিকের অন্যতম বিদ্যাপতিপ্রায় অনুরূপ ভাষায়ই প্রেমরস আস্বাদনের বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রেমরস আস্বাদনের বর্ণনায় এই সকল খ্রিস্টীয় ভক্তগণের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাত্মাবোধ। এই বস্তুটি খ্রিস্টীয় ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। খ্রিস্টীয় ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাত্মা নহেন, সর্বভূতেস্থ ভগবান নহেন, তিনি স্বর্গস্থ পিতা। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তান্ত্রিক সাহিত্যিক স্যার জন উড্রফ (Sir John Woodroffe) মহোদয়ের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি কহিয়াছেন, কোন খ্রিস্টীয় মিশনারী সাহেব কথাপ্রসঙ্গে একদিন এইরূপ

দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের বিশ্বানুগতা (Immanence of God) এই মতটি পাশ্চাত্য দেশেও প্রসার লাভ করিতেছে, উহা বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। খ্রিস্টীয় মিশনারীদিগের পক্ষে যে ইহা বিশেষ বিপদের কথা তাহাতে আর সন্দেহ কী? কেন না, এই বৈদান্তিক সত্য প্রচলিত হইলে খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের অনেক কাহিনীই অচল হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রকাব্যের বেদান্তমূল ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, উহার সহিত খ্রিস্টীয় ভক্তিবাদের তুলনা চলে না।

কিন্তু শ্রীভাগবতের ব্রজলীলা ও পদাবলী সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের ভাগবত ও তত্ত্বগত সুসঙ্গতি আছে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতির কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে বিশ্বাত্মবোধ, এই বহুবিচিত্র সৃষ্টিতে বিশ্বাত্মারই প্রকাশ, আর এই বিশ্বাত্মা হইতেছেন প্রেমময়, রসময়, পরম প্রেমাস্পদ; তিনি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত তাঁহার মধু ('ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সর্বস্য সর্বাণি ভূতানি মধু')—বৃহঃ।

ভাগবতের ব্রজলীলা ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব এই বৈদান্তিক সত্যই ব্যাখ্যা করে।

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা।

শ্রুতি বলেন, তিনি অগ্রে একই ছিলেন—'আত্মৈব ইদং অগ্র আসীৎ এক-এব'। কিন্তু সেই 'একমেবাদ্বিতীয়' একাকী—রমিত হইলেন না, তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন, তিনি কামনা করিলেন আমার জয় হউক—

'স বৈ নৈব রেমে—
তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ং ঐচ্ছৎ—
স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ'। —বৃহঃ ১।৪।৩

অকাম, আপ্তকাম, আত্মারাম পুরুষে এই প্রথম কামনার উদ্ভব হইল। তারপর? —তাহাতে পুরুষ-প্রকৃতি সম্পৃক্ত, একীভূত ছিল, এখন তিনি আপনাকে দ্বিধা-বিভক্তি করিয়া পতি ও পত্নী হইলেন—

স হ এতাবান্ আস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ।
স ইদমেবাত্মানং অপাতয়ৎ—ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভাবতাম্।
—বৃহঃ ১।৪।৩

একই, পতি ও পত্নী উভয়ই হইলেন। পতি পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, পত্নী পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা।

রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।। —চৈঃ চঃ।

বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি। অসীমে সসীমে, অরূপে সরূপে, পরমাত্মায় জীবাত্মায়, পুরুষে প্রকৃতিতে, ভগবানে ও জীবে যে নিত্য প্রেম-লীলা, তাহাই রাধাকৃষ্ণ-লীলা।

একই, দুই হইয়া পরস্পর প্রেমরস আস্বাদন করিতেছেন। এই তত্ত্বটি বুঝিলেই প্রকৃতিরূপী কবির কাব্যমুখের সমস্ত কথাই সুস্পষ্ট বুঝা যায়—

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নয়তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।।'

'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি।
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনাকে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজলীলাটি কী? এই পুরাণখানি ভক্তিরসের আকর, অথচ এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, উহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, সর্ববেদান্তসার—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং', 'সর্ববেদান্তসারং' হি
শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে— গারুড়ে।

গ্রন্থ-পরিচয়ে গ্রন্থকর্তা স্বয়ংই বলিয়াছেন, ইহা 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং', বেদরূপ কল্পপাদপের পরমানন্দরসপূর্ণ এই ভাগবত ফল।

এ সকল কথার অর্থ কী? ব্রজলীলার সঙ্গে বেদান্তের সম্পর্ক কী? আমাদের ব্যাখ্যা-বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন, ঐ গ্রন্থখানি হইতেই কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত গোপগণের মুখে এইরূপ কথা দিয়াছেন—'একটি বিষয়ে আমরা বড়ই বিস্ময়বোধ করিতেছি—এই বালকের প্রতি আমাদের সকলেরই দুস্ত্যজ অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহাকে আমরা ভাল না বাসিয়া পারি না, আর ইহারই বা আমাদের সকলের প্রতি এমন স্বাভাবিক অনুরাগ কেন?

আবার রাজা পরীক্ষিতের মুখেও ঠিক এইরূপ প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছেন—'ব্রহ্মন্, কৃষ্ণ তো পরের ছেলে; কিন্তু নিজ নিজ পুত্রদিগের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ স্নেহ ছিল, তাঁহাকে তাহারা তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত কেন?'

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইমান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্।।

উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিলেন তাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের এবং প্রেমতত্ত্বের সারকথা এবং তাহাতে ব্রজলীলারহস্য বুঝিবার সুস্পষ্ট সঙ্কেত আছে। সংক্ষেপে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

'তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।।
কৃষ্ণমেনং অবেহি ত্বমাত্মানম্ অখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।

—ভাঃ ১০।১৪।৫৪-৫৫

অতএব নিজের আত্মাই সর্বদেহীর প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ আত্মার জন্যই প্রিয় (২০ পৃঃ দ্রঃ)। কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। ইনি জগতের হিতের জন্য মায়াযোগে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পান।

সুতরাং সেই ভগবান মুকুন্দ যখন বৃন্দাবনে প্রকট হইলেন, তখন ব্রজবাসিগণ সকলেই তাহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া মনে করিতেন। (যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দঃ)। —ভাঃ ১০।১৪।৩৪

কেবল নর-নারী নয়, ব্রজের পশু-পাখি, তরুলতা সকলই তাঁহার প্রকাশে পুলকিত, ব্রজের ভূমি, গিরি, নদীও তাঁহার প্রকাশে প্রাণবন্ত। কেননা, তিনি তো জগদাত্মা, চিদাত্মা, তাঁহার প্রকাশে অচিৎও চিন্ময়। আমরা পূর্বে আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে জীবে অজীবে কোনও পার্থক্য নাই, সকলই সচ্চিদানন্দময়, সকলই কৃষ্ণময় ('বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণুচ, ভগবদ্রূপমখিলম্'— ভাঃ ১০।১৪।৫৬)। কৃষ্ণ জড় অজড় সকলেরই আত্মা, আত্মা সকলেরই প্রিয়, সুতরাং কৃষ্ণ ব্রজের পশুপাখি, তরুলতা সকলেরই প্রিয়।

সেই প্রিয়তম, প্রেমময়, সর্বচিত্তাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সমুদিত হইয়া বেণুবাদন করিতেছেন ('ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ')। সে প্রেমের ডাকে নর-নারী প্রমোদিত, পশুপাখি পুলকিত, তরুলতা মুকুলিত, যমুনা উচ্ছ্বসিত। সে বেণুরবে—

ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।

—বাদিত বেণুরবে মুগ্ধচিত্ত হইয়া হরিণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসে এবং তাঁহার নিকটেই অবস্থিতি করে, অন্যত্র যায় না। সে সঙ্গীত শুনিয়া—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশোধৃত মৌনাঃ।। ১০।৩

—সরোবরস্থ সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গগণ সেই মনোহর সঙ্গীতে মুগ্ধচিত্ত হইয়া ছুটিয়া আসে এবং সংযতভাবে নিমীলিত নয়নে নীরবে হরির নিকট বসিয়া থাকে।

আর ব্রজের তরুলতা? —তাহারাও বিশ্বাত্মার প্রকাশে পুলকিতাঙ্গ।

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষু স্ম।। ১০।৩৫

তিনি যখন বেণুবাদন করেন তখন ফুলপুষ্পভারে প্রণতশাখা তরুলতা তাহাদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু প্রকাশ পাইতেছেন ইহা জ্ঞাপন করিয়াই যেন প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া পুষ্পফল হইতে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে।

[শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, 'এতানি বিষ্ণুর্ব্যক্তিলক্ষণানি'—এ সকল শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশের লক্ষণ]

শ্রীবিষ্ণু তো সর্বত্রই আছেন, তাই তো তিনি বিষ্ণু। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ তো প্রাকৃত জনে অনুভব করিতে পারে না। শ্রীভাগবতকার সেই রসঘন আনন্দস্বরূপের ব্রজভূমে প্রত্যক্ষ প্রকাশ প্রদর্শন করিতেছেন। তাই তিনি বলেন—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবিরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো, দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ। —১০।১৫।৮

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তী গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ।। —১০।১৫।৭

আজ এ ধরণী ধন্য। তোমার পাদস্পর্শে তৃণগুল্ম ধন্য। তোমার নখস্পর্শে তরুলতা ধন্য। তোমার সদয়দৃষ্টি লাভ করিয়া নদীগিরি, পশুপক্ষী ধন্য। আর লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত তোমার ভুজবন্ধন লাভ করিয়া গোপিকাগণ ধন্য। তোমাকে সমাগত দেখিয়া ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ গোপিকাদিগের ন্যায় প্রীতিনেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া আছে, কোকিলগণ সূক্তগান করিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিতেছে। এই বনাবাসিগণ ধন্য। সতের ইহাই স্বভাব।

যিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, তিনিই ব্রজে প্রকট। ব্রজের এই লীলাময় প্রেমঘন রসরাজকে যদি ব্রজে আবদ্ধ না রাখিয়া জগন্ময় জগন্মাতা বলিয়া চিন্তা করি ('রসো বৈ সঃ') তাহা হইলে বুঝিতে পারি, তাঁহার এই জগৎ-লীলাও রসলীলা, আনন্দ-লীলা। তাহা হইলে বুঝিতে পারি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঋষি-কবি অনুপম দেবভাষায় ব্রজে যাঁহার প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন, আধুনিক ভারতের ঋষি-কবিও তাঁহার অতুলন মাতৃভাষায় তাঁহার গীতিকাব্যে পত্রে পত্রে বিশ্বে সেই বিশ্বাত্মার প্রকাশই বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববোধের মরমী কবি, সে অর্থেও তিনি বিশ্বকবি।

'আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে।
ওগো জানিনা কী নন্দন-রাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে,

নব পল্লব-মর্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধ-বিধুর সমীরণে।'

'শরতে আজ কোন অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়,
আনন্দ গান গা রে।
নীল আকাশের নীরব কথা
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।

শস্য খেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে।

'ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।'

'আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।

নীল আকাশের কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চকাচকির মেলা।'

'আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ,
জলের পরে লেগেছে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখিতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালো।
... ...
লুকিয়ে রবে কেগো মিছে
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভুঁইচাঁপারে।
রুদ্রঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে' তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে।'

'আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলো চুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়
আকুল করেছ শ্যামসমারোহে
হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।।'

শ্রীমদ্ভাগবত যেমন বেদান্ত-ভাষ্য, রবীন্দ্র-কাব্যেও তাহাই।

জগতের দিকে তাকাইয়া ঋষি দেখিতেছেন, সকলই ব্রহ্মময়, যাহা প্রকাশ পাইতেছে আনন্দরূপে, অমৃতরূপে—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোক পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভাসিয়া
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল-সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয় প্রান্ত
উদার উষার উদয় অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।'

এইরূপ গভীর বিশ্বাত্মবোধেই আনন্দস্বরূপের, সত্য-সুন্দরের স্পর্শ মিলে। তাই আবার গাহিতেছেন—

'এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্-গগনে পবন হ'ল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর।
এই যে তোমার পরশ-লাগে
চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত'

তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।'

এই বিশ্বসৃষ্টিকে বলা হয় বিশ্বলীলা। লীলা অর্থ খেলা। একা খেলা হয় না, তাই এক বহু হইয়াছেন।

শ্রুতি বলেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রত্যয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি। —তৈত্তি ৩।৬

—'আনন্দ হইতে ভূতসমূহ জন্মিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, আনন্দের দিকেই তাহারা গমন করিতেছে, অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে।'

এই জগৎ-লীলা আনন্দ-লীলা।

'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি। ....'

তাই তো গীতাঞ্জলি, যে গীতে জগৎ মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দ-লীলার মরমী কবি, তাঁহার বাঁশিতে এই আনন্দ-লীলারই গান।

বিশ্বপ্রেমের দরদী কবি রবীন্দ্রনাথ

এই যে আনন্দ-লীলা, ইহা প্রেম-লীলা। প্রেমেই আনন্দ, যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি প্রেমস্বরূপ, প্রেমের প্রস্রবণ, সেই প্রেমের উৎস হইতে অজস্র প্রেমধারা উৎসারিত হইয়া প্রকৃতিকে সরস ও সুন্দর করিতেছে, জগৎকে সঞ্জীবিত করিতেছে। গাছের পাতাকে সবুজ করিল কে? কুসুমে এমন সুষমা দিল কে? তাঁহারই প্রেম। মায়ের বুকে স্নেহ দিল কে? শিশুর মুখে এমন মধুমাখা হাসি ফুটাইল কে? তাঁহারই প্রেম।

মায়ের স্তনের রক্ত হে প্রেমময়,
তুমি ক্ষীর করে যে দিলে
কত ভালবাসা থেকে আড়ালে।

কবি গাহিতেছেন—

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে।
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।

মাতা যে পুত্রকে ভালবাসেন সে কি তাঁহার পুত্র বলিয়া? পত্নী যে পতিকে ভালবাসেন সে কি তাঁহার পতি বলিয়া? আর্যঋষি বলেন, তা নয়, তা নয়, এক ব্যক্তি যে আর এক ব্যক্তির প্রিয় হয়, সে তাহার আত্মা বলিয়া।

'ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ
ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো
ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।' —বৃহ-২।৪।৫

এই ঋষিবাক্যের তাৎপর্য কী তাহা ঋষি-কবির ভাষায়ই বলিতেছি—'আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি, সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা—মানবকে এক বলে জানি, সে জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা।... তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি।'

সর্বত্র একই সত্তা, একই আত্মা, একই প্রাণের নর্তন।

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগযুগান্তরের বিরাট-স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।'

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই একাত্মতাবোধ, একপ্রাণতাবোধই বিশ্বপ্রেমের মূল উৎস। এই বিশ্বানুভূতি বর্ণনা কেবল কবির কাব্যে নয়, তাহার অন্যান্য লেখাতেও ইহা আমরা দেখতে পাই।

'প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা গভীর আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কগণের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়—এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এ ছন্দের যেখানেই যতি পড়েছে সেখানে ঝঙ্কার উঠেছে, সেইখানেই মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণু-পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকালে স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তাহ'লে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হ'ত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হ'য়ে যেত।'

বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে সকল তত্ত্ব পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতেই কবির পূর্বোক্ত কথাগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে (১৫ পৃঃ দ্রঃ)।

এ সম্বন্ধে একদিনের একটি ঘটনার বর্ণনা কবির নিজ ভাষাতেই এখানে দিতেছি—

'সদর স্ট্রীটের রাস্তাটার পূর্ব প্রান্তে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে যেমনি আমি সূর্যোদয় দেখিলাম অমনি আমার চোখের উপর হইতে যেন পর্দা উঠিয়া গেল—এই অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার আচ্ছন্ন হইয়া গেল—আনন্দ ও সৌন্দর্য সর্বত্র তরঙ্গিত হইতে লাগিল।... আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। পূর্বে যাহাদের সঙ্গ আমার পক্ষে বিরক্তিকর ছিল তাহারা কাছে আসিলে আমার হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদের গ্রহণ করিতে লাগিল। রাস্তা দিয়া মুটে, মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, তাহাদের শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে সৌন্দর্যময় বোধ হইত। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া যাইত। রাস্তা দিয়া একটি যুবক আর একটি যুবকের কাঁধে হাত দিয়া যখন হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত তখন তাহা আমার কাছে একটি অপরূপ ব্যাপার বলিয়া ঠেকিত— বিশ্বজগতে অফুরান রসের ভাণ্ডার হাসির উৎস যেন আমার চোখে পড়িত।'

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।...
পরান পূরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।...
যেদিকে আঁখি যায় সেদিকে চেয়ে থাকে
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে।'

এই যে কোলাকুলি, গালাগালি, হাসাহাসি, এই যে আনন্দের মেলা, ইহা কী? সেই আনন্দস্বরূপ বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া জগতে যে আনন্দ-লীলা, প্রেমলীলা করিতেছেন তাঁহারই চিত্র। এই প্রাথমিক অনুভূতি গভীরতর হইয়া গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্যে পূর্ণ অধ্যাত্মবোধ প্রকাশিত হইয়াছে। তখন কবি গাহিলেন—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

কিন্তু আমরা তো দেখি 'আমার' মাঝে 'আমার' লীলাই চলিতেছে। কেহ হয় তো মুখে বলি 'শ্রীকৃষ্ণের সংসার' কিন্তু মনে এ জ্ঞানটা বেশই আছে, আমারই সংসার, আমার এটা, আমার সেটা, আমি কর্তা, আমিই সব। শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই 'আমি'-টার, 'অহং'-টার যখন মরণ হইবে, 'আমার' বলিতে আর যখন কিছুই থাকিবে না, তখন আমার নবজীবন হইবে, তখনি আমার মধ্যে তাঁহার লীলা হইবে। তাই পরেই বলিতেছেন—

এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।
মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

আর, এই 'আমি'-টার যদি মরণ হয়, তবে 'আমি'-টার সুখের জন্য, ভোগের জন্য যত সব কামনা-বাসনা সমস্তই থামিয়া যাইবে, তখন আমার একমাত্র কাম্য বস্তু হইবে—তুমি।

সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
সুখ দুঃখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

আর তুমি তো বিশ্বময়, সর্বভূতময়। তোমাতে যে প্রেম তাহা বিশ্বমানবের সহিতই আমাকে প্রেমে যুক্ত করিবে।

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।

গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দ ধন হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

ভগবান সর্বভূতময়, এই অনুভূতি যখন হইল তখন বিশ্বপ্রেম ও ভগবৎপ্রেম এক হইয়া গেল। তখন সর্বভূতের সেবা-পূজাই হইল ভগবৎ-পূজা।

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বার মাস।'

দেবতা ভিখারি সাজিয়া দেবমন্দিরের বাহিরে আসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন।—

'গৃহ মোর নাই
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'

পুরোহিত ঠাকুর মালা জপ করিতে করিতে বলিলেন—

'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।'
সে কহিল, 'চলিলাম'। —চক্ষের নিমিষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে!
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে।'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে তবে থাকি ঘরে।'

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা

জাতীয়তা ও মানবিকতা, জাতিপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে কোনও বিরোধিতা নাই, একটি আর একটির বিস্তারমাত্র। কিন্তু যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত অহমিকা ও স্বার্থপরতা হৃদয়-বিস্তারের বিষম অন্তরায়। আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমৈত্রী সম্বন্ধে বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সারগর্ভ সন্দর্ভসমূহ সুপরিচিত। শক্তিমদমত্ত পাশ্চাত্যের অহংসর্বস্ব পরস্বলোলুপ জাতিপ্রেম আধুনিক জগতে যে ধ্বংসলীলার অভিনয় করিতেছে তাহা দেখিয়া কবি-চিত্ত বড়ই ব্যথিত ও বিচলতি হইয়াছিল।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হ'তে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিকূল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে উঠে— বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পূরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ,
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।
....চিতার আগুন

পশ্চিম সমুদ্র তটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।
এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা।

তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক।
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধুতীরে
....ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

একপক্ষে হিট্‌লার-মুসোলিনী-তোজো, অপরপক্ষে জগতের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ পরস্পর মুখোমুখি হইয়া যখন মহা আড়ম্বরে বিশ্বব্যাপী নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, যখন স্বদেশীয় কবিকুল স্ফীত বক্ষে জিগীষু নরঘাতকদিগের দানবতার জয়গাথা কীর্তন করিয়া চিৎকার করিতেছিলেন, তখন কয়েকটি মহাপ্রাণ মানব মানবতার বাণী প্রচার করিয়া বিক্ষুব্ধ জগতে আন্তর্জাতিক প্রীতি, মৈত্রী ও শান্তি আনয়নের ব্যর্থ প্রয়াসে নিবিষ্ট ছিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাশ্চাত্যদেশে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ এবং ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী ও ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু এসকল কথা যুদ্ধোন্মত্ত জগতে শুনে কে? ফরাসীদেশে রোমাঁ রোলাঁ একরূপ অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন। এদেশেও তখন স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্বেল মত্ততায় লোকে উতলা, বিজাতীয় রাজশক্তির নিদারুণ নির্যাতনে সংক্ষুব্ধ, তখন রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক প্রীতি-মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের বাণী কাহারো ভাল লাগিত না। যাহার অতুলন জাতীয় সঙ্গীতসমূহ নগরে পল্লীতে সভা-সমিতিতে সহস্র কণ্ঠে সতত ধ্বনিত হইতেছিল, যিনি ঘৃণাভারে রাজপ্রদত্ত খেতাব লাটসাহেবের নিকট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই যখন বিজাতীয়ের প্রতি প্রীতি-মৈত্রীর বাণী লইয়া আসিলেন, তখন অনেকে ক্ষুব্ধ হইল, কেহ কেহ কটু কথা বলিতেও ত্রুটি করিল না। তখন তিনি জাতির সম্মুখে রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধীর সত্যপ্রেমের উদার উচ্চ আদর্শটি ধরিলেন, পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেন জাতিকে অতীত স্বাধীন ভারতের উদাত্ত শাশ্বত বাণী।

সেসময় তিনি লিখিয়াছিলেন—

'মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যে ক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও

আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে, সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।'

'কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হলে ফল হল কী। প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কন্‌গ্রেস প্রভৃতি কোনওরকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখন স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস করব না? উদ্বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জন দিয়ে বসব।

'একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী কাল হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কী রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে-কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল তখন এই কথাটা আর লুকানো রইল না। হঠাৎ একদিন আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তাঁর মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না, এখন থেকে যে-কোনও জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্য যে-চিন্তা করতে হবে তার সে-চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।...

'আজ এই বিশ্বচিত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনও প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সার্বজনীন কোনও বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলিছ না যে, আমাদের আরও প্রয়োজনের যা কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকাল বেলায় পাখী যখন জাগে তখন কেবলমাত্র

আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক— কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংযুক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্য ত্রুটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জন-নীতির পোষণপালন করতে যাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতে বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোট, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়-বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলেছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনও বড় জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিম দেশের এই ব্যবসায়-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তুলবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখেছি যারা এই সঙ্কল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে, সেই সব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই রকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে, যেমন রোমাঁ রোলাঁ, —তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত।... আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকব? আমরা কি এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না, —য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে সাদাকালো নেই; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি— যিনি বহুধাশক্তির যোগে অনেক বর্ণের লোকের জন্য তাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বিধান করেছেন; আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত করুন।'

জীবনবাদের নব্য কবি রবীন্দ্রনাথ

জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্মসাধন সম্বন্ধে আমাদের দেশে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই দুইটি মত প্রচলিত আছে। এক মত এই যে—মানবজীবন দুঃখময়, সংসারে জন্মটাই অপার দুঃখের হেতু, সময়ে স্বাভাবিক জরামৃত্যু তো আসিবেই, জীবিতকালেও আধি-ব্যাধি, আকস্মিক আপদ-বিপদ ইত্যাদি কত রকম দুঃখই যে জীবের ভোগ করিতে হয়, তাহার অন্ত নাই। এই সকল অনিবার্য, জীবের ইহা নিবারণের সাধ্য নাই, কেননা এ সকল তাহার প্রাক্তন কর্মের ফল। আবার ইহজন্মের কর্মের ফলও পরজন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে। কর্মই তাহার পুনঃ পুনঃ সংসারে বন্ধনের কারণ, সুতরাং এই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়—সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ, সর্বকর্মত্যাগ। এই হেতু এই সকল শাস্ত্রে জীবনের অনিত্যতা, সংসারের অসারতা, দুঃখমূলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ আছে এবং শঙ্করাচার্য প্রমুখ সন্ন্যাসবাদী ধর্মাচার্যগণ নানাভাবে নির্বন্ধ সহকারে সন্ন্যাসবাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন।

> যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
> ইতি সংসারে স্ফুটতরঃ দোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

—যেমনই জীবের জন্ম হইল অমনি মৃত্যু তাহার পশ্চাদগামী হইয়াছে। আবার যেই মৃত্যু হইল অমনি পুনরায় জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হইতেছে। জন্ম—মৃত্যু, মৃত্যু—জন্ম, এই তো সংসারের দোষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। হে মানব, ইহাতে তোমার সন্তোষের বিষয় কী আছে?

এই যে সন্ন্যাসের ডাক, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিসঙ্কুল দুঃখময় মানবজীবনের অসারতা, কর্মত্যাগের মাহাত্ম্য, এ সকল মধ্যযুগে আমাদের দেশে অতি প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাকে বলে দুঃখবাদ বা সন্ন্যাসবাদ।

কিন্তু মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ দুঃখবাদাত্মক ও সন্ন্যাসবাদাত্মক মত সর্ববাদিসম্মত নয়। ইহার বিপরীত বাদও আছে। তাহাকে বলা যায় সুখবাদ বা জীবনবাদ। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা বলেন—জীবজগতে সচ্চিদানন্দেরই প্রকাশ। সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দেই সকলে আনন্দময় ('এষ হ্যেবান্দয়াতি'), তিনি লীলাময়, সৃষ্টি তাঁহারই লীলা। তিনিই সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া জীবকে লইয়া এই খেলা খেলিতেছেন। সংসার ত্যাগ করিবার জন্যই জীব সংসারে আসে নাই, লীলাময়ের লীলাপুষ্টির জন্যই জীব সংসারে আসিয়াছে, লীলাময়

আনন্দস্বরূপ, সুতরাং 'জগৎ-লীলা' আনন্দ-লীলা (১৩৩ পৃঃ দ্রঃ)। জীব এই আনন্দলীলার সাথী, সে যদি এইটি বুঝে তবেই তাহার মানবজীবন সার্থক হয়।

দুঃখবাদিগণই মোক্ষবাদী, মায়াবাদী, জ্ঞানবাদী। ইঁহারা বলেন, সংসার দুঃখময়, জীব স্বীয় কর্মফলে দুঃখভোগী, সেই দুঃখের পরানিবৃত্তিই মোক্ষ, উহাই জীবনের লক্ষ্য, কর্মই সংসার-বন্ধনের কারণ, সুতরাং কর্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ পথ। জগৎ মিথ্যা, মায়াময়, সুতরাং কর্মও মায়াই। জ্ঞান ব্যতীত মায়াত্যাগ হয় না। সুতরাং সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাবলম্বন কর, —বিবেকবৈরাগ্য সাহায্যে জ্ঞানযোগে ব্রাহ্মীস্থিতিলাভ করিয়া অথবা সমাধিযোগে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রকৃতির অতীত হইয়া কৈবল্যসিদ্ধি লাভ কর। উহাই মোক্ষ। ইহাকে শাস্ত্রে নিবৃত্তিমার্গ বলা হয়।

অপরপক্ষে সুখবাদিগণ জীবনবাদী, লীলাবাদী, ভক্তিবাদী। ইঁহারা বলেন—জগৎ মিথ্যা নয়, জীবনও স্বপ্ন নয়, মায়া তাঁহারই অচিন্ত্য সৃজনীশক্তি, তিনি মায়াযোগে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া উহাতে অনু প্রবিষ্ট আছেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, তাই জগতে আনন্দ আছে, জীবের রসবোধ আছেন, কেননা তিনি সকলের আত্মা, অখিলাত্মা, অখিলরসামৃতসিন্ধু। তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন ইহাই জীবের পরম নিঃশ্রেয়স। তাঁহাতে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহারই কর্মবোধে নিষ্কামভাবে কর্ম করিলে সে কর্মে বন্ধন হয় না, সুতরাং কর্ম ত্যাজ্য নয়, জীবনটা অগ্রাহ্য নয়। ইহাকে বলা হয় প্রবৃত্তিমার্গ।

জন্মান্তরবাদ সনাতন ধর্মের একটি মূল তত্ত্ব। উহার সহিত কর্মফলবাদ জড়িত হইয়া দুঃখবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। দুঃখবাদ হইতেই মোক্ষবাদ ও সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কালে ভক্তিবাদ ও ভাগবতধর্মের অভ্যুদয় এই দৃঢ়মূল মোক্ষবাদের মূলও শিথিল হইয়া গেল। প্রেমময়, রসময়, কারুণ্যময় ভগবানকে পাইয়া জীব স্বস্তি লাভ করিল, তাঁহার আনন্দলীলারস আস্বাদন করিয়া মোক্ষ-টোক্ষ ভুলিয়া গেল।

কিন্তু মধ্যযুগে বেদান্তের মায়াবাদাত্মক ব্যাখ্যায় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচারে মোক্ষবাদ ও সন্ন্যাসবাদ হিন্দুর ধর্ম-জীবনে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে প্রভাব এখনও আছে। তাই কবিগুরুর একটি কথার রহস্যভেদ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। সে কথাটি হইতেছে এই—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'।

পাছে কেহ মনে করেন যে, এ কথাটি একেবারে অশ্রুতপূর্ব এবং অশাস্ত্রীয়, সেজন্য প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ভক্তিশাস্ত্রের শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদ্বাক্যে ঠিক এইরূপ একটি কথাই আছে।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।

—ভাঃ ১১।২০।৩১

—ভক্তিযোগে যে সাধকের চিত্ত আমাতে যুক্ত থাকে তাহার পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না।

জ্ঞানের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু জ্ঞান বলিতে অনেক কিছু বুঝায় যাহা ভক্তিমার্গে বিশেষ প্রয়োজনে আসে না, বরং ভক্তিসাধনার অন্তরায় হয়। যেমন, নির্বিশেষ নির্গুণ তত্ত্ব-চিন্তায় ভাবভক্তির কোনও স্থান নাই, সগুণ ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন ভক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। আবার এই জগৎ-প্রপঞ্চ মায়াময়, মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞানকেও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলা হয়। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান-চর্চার সহিত ভক্তিমার্গের সঙ্গতি নাই, কারণ ভক্তগণ লীলাবাদী, এই সৃষ্টি, এই জগৎলীলা আনন্দময়েরই আনন্দ-লীলা, ইহাই ভক্তের কথা।

বৈরাগ্য বলিতে বুঝায়—(১) বিষয়কামনা ত্যাগ, (২) বিষয়ভোগ ত্যাগ। কামনা-ত্যাগ না হইলে কেবল বিষয়ভোগ ত্যাগ করিলেই বৈরাগ্য হয় না। উহা ফল্গুবৈরাগ্য, মিথ্যাচার। কিন্তু বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত বিষয়ভোগ করিলে কোনও ক্ষতি হয় না। বরং ভক্তিমার্গে একেবারে বিষয়গ্রহণ ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনাদি করা শ্রেয়স্কর নয়, উহাতে চিত্ত-কাঠিন্য জন্মে, শুষ্কতা ও নীরসতা আসে, উহা প্রেমভক্তি সাধনার সহায়ক হয় না, বরং অন্তরায় হয়। পূর্বোক্ত ভাগবত-বাক্যের ইহাই মর্ম। ঋষি-কবির কথাটি উহারই পরিপোষক। সমগ্র কবিতাটি এই—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি,
সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

ইহা এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চে আনন্দময়ের আনন্দ-লীলার অনুভূতি। জগতের রূপ-রস সুন্দর হইয়াছে, সরস হইয়াছে, সেই আনন্দস্বরূপের রসস্বরূপের স্পর্শে। বিষয়ের রূপরস, মানবহৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-দয়া-মৈত্রী, এ সকল তো তাঁহারই রূপ-রস-স্নেহ-প্রীতির অভিব্যক্তি। ভক্তিপূতচিত্তে এ সকল তাঁহারই দানরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দও পরমানন্দের সন্ধান দিতে পারে। তখন বিষয়ের মোহও মুক্তিরূপেই পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হৃদয়ের সুকোমল ভাবসকল নিষ্পেষণ করিয়া কেবল মোহ মোহ করিয়া হা-হুতাশ করিলে মোহ্ দূর হয় না। মোহ কোথায়? প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর, সকলই মধুময়, সকলই আনন্দময়, এ ভোগ আনন্দভোগ—'তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।'

কিন্তু যে সেই রসময়কে ভুলিয়া কেবল বিষয়রসে লোলুপ, বিষয়-বাসনায় মুহ্যমান, যে ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহার নিকট এ সকল কথার কোনও অর্থ নাই, তাহার পক্ষে বিষয়ভোগ ইন্দ্রিয়-সেবা ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষযানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।। —গীতা ২।৬৪

—কিন্তু যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যাঁহার মন নিজের বশবর্তী, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

এ স্থলে বলা হইল. বিষয়ভোগ নিষিদ্ধ নয়, দূষণীয়ও নয়, বিষয়ের উপভোগ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার উপায় আছে। সে কীরূপ? প্রথম মনকে বশীভূত করিতে হইবে, অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ উভয়ই ত্যাগ করিতে হইবে। মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণও আজ্ঞাধীন হইবে, বলপূর্বক চিত্তহরণ করিতে পারিবে না। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত সেই স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও তাঁহার চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, রাগদ্বেষজনিত চিত্তবিক্ষেপ তাঁহার জন্মে না, সুতরাং তিনি নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন।

ইহাই হইল নির্লিপ্ত বিষয়ভোগ। গীতোক্ত কর্মযোগিগণ নির্লিপ্ত সংসারী। ইহা নীতিতত্ত্বের কথা। ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বটি আরও মূলস্পর্শী, তাহাই কবিগুরুর পূর্বোক্ত কবিতাটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে তত্ত্বটি হইতেছে এই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।। —ঈশ উপ

—'জগতে যাহা কিছু আছে সকলই পরিবর্তনশীল, তৎসমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ইহা ধারণা কর। সেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না।'

আক্ষরিক অনুবাদে কথাটার অর্থ সুস্পষ্ট বুঝা গেল না। এখানে মূল কথাটি হইতেছে, সমস্তই এক-ব্রহ্মময় বলিয়া ধারণা করিবে। এই অনুভূতি যদি বাস্তব হয়, তাহা হইলে এই বস্তুটি আমার, ঐটি অপরের, আমি ঐটি চাই, এই রকম ভাবনা আর থাকিবে না, কারণ একত্ব-জ্ঞানে আমি-পর ভেদ থাকিতে পারে না এবং 'আমি'-র যে কামনা-বাসনা তাহাও থাকিতে পারে না। তাই বলা হইল, সেই ত্যাগ দ্বারা ভোগ কর অর্থাৎ অহংবুদ্ধি এবং তজ্জনিত কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া বিষয় ভোগ কর। ইহাতে চাই—আমাদের ভাবনা, কামনা, কর্ম, সকলই ঈশ্বরমুখী করা, ঈশ্বরে অর্পণ করা, ঈশ্বরের উৎসর্গ করা। এইরূপে ঈশ্বরে নিবেদিত জীবনের যে বিষয়-ভোগ তাহাই বিশুদ্ধ-ভোগ, আনন্দভোগ, আনন্দময়ের আনন্দলীলার উপভোগ। এই অনুভূতি যখন হবে তখনই 'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে'। কিন্তু 'আমি'-টা না মরিলে তাহা হইতে পারে না। ঋষি-কবি কবিতায়, গদ্য-রচনায়, প্রার্থনায়, সর্বত্রই পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন।

'মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।' —(১৩৭ পৃঃ দ্রঃ)

'আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হবো,
বাঁচবো তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।'

'নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে—

আপনগড়া স্বপন হতে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।
ঢেকে তোমার হাতের লেখা
কাটি নিজের নামের রেখা,
কতদিন আর কাটবে জীবন
এমন ভীষণ আপদ বয়ে।'

'আত্মার আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন ক'রে করব?

ঐ যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়—যে কৃপণ নেবার মৎলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মৎলব ছাড়া কিছু করে না—সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়দের মত সমাদর ক'রে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়—কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, 'ন জায়তে ম্রিয়তে'—না জন্মায়, না মরে। কিন্তু ঐ অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে—কিছু না পারে তো অন্তত তার ঐ নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, এ-কে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, আর ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না। আমি বলব না যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি, আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুতে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বার বার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না ব'লে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি। এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।....

তাই বলছিলুম, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না—তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব।'

'হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো—আমার আর কিছুই বাকি রেখো না—কিছুই না, অহঙ্কারের লেশমাত্র না—আমাকে

একেবারেই তুমিময় করে তোল। কেবলই তুমি, তুমি তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলি তুমিময় আনন্দ।'

এই যে অহংবর্জিত, নিঃশেষে ভগবানে নিবেদিত জীবন, ইহাই দিব্য জীবন। ইহা মুক্ত জীবন, অহং যখন গেল, তখন সংসারে থাকিলেও, কর্ম করিলেও, সংসার-বন্ধন, কর্ম-বন্ধন, সকল প্রকার বন্ধনই গেল। তখনই পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ আনন্দ— 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' এই দিব্য জীবনের আদর্শ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার লেখায়, উপদেশে, সাধনায় সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি (৯৯ পৃঃ)। ঋষি-কবির অধ্যাত্ম-রচনায় অভিনবরূপে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই আমরা তাঁহাকে জীবনবাদের নব্য কবি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি।

ভারত-আত্মার বাণী ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ

ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও বিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রচনা অতি সমৃদ্ধ। এ সকল বিষয়ে তাঁহার সুবিশাল রচনাবলীর প্রকৃষ্ট আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ভারতের শাশ্বত বাণী

'এক দেবতার অখণ্ড, অক্ষয় ঐক্য'

ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণীসমূহ প্রাচীন ভারতের তপোবনেই প্রথম উত্থিত হইয়াছিল। ঋষি-কবি গদ্যে পদ্যে গানে এবং শান্তিনিকেতনে উপাসনাকালীন ব্যাখ্যানে সে সকল সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন—

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল, সবার উপরে,
অগ্নিতে জলেতে এক বিশ্ব-চরাচরে,
বনস্পতি-ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

মন্ত্রটি এই—

যো দেবো অগ্নৌ, যো অপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ। (শ্বেত. উপ, ৪।১৭)

—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার করি।

ঋষি-কবি এই মন্ত্রটির যেরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এই জন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনও চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ একথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, 'তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ' এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায়, মৃত হয়ে যায়—এ কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু একথা যাঁরা কানে শুনে' বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না—এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।....

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোট করে ওষধির বনস্পতির নাম করা হলো?

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলা শক্ত নয়, আমরা অনায়াসেই বলে থাকি—এ কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে ঋষি বলেছেন, তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন, সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রকে তিনি কেবল মনের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল—তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন একথা ব'লে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন।'

ভারতের মন্ত্র—এক, এক, এক

'মানব-সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল, তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক, এক, এক। তিনি বলছিলেন—ইহচেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান একের উপলব্ধির অভাব, যত ক্ষুদ্রতা নিস্ফলতা দৌর্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।'

'অনন্ত অমৃত-বার্তা'

'একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ

দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।
আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা-আনন্দমন্ত্র সে উদাত্তবাণী
...অনন্ত অমৃত বার্তা।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।
ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

'এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, 'এক সূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও'— এই মন্ত্র কোনও এক ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনও একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোন তুমি জাগ্রত হও—শৃণ্বন্তু বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব-গগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতম্—আমি জানতে পারছি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন ক'রে জানতে পারে তেমনি ক'রে—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

'... হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্মা, আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে. জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো; ...আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয় বলতে থাক আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনা'র বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানব-সমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপর এই বাণী প্রচার ক'রে দিক—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'।'

উপনিষদেই ভারত-আত্মার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি

'এই বিচিত্র সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্য, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনও বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনও

বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনও বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার জটিলতা সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়াছেন। যাহা নাই তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—ছুটোছুটি যে চরম সার্থকতা, একথা ভারতবর্ষের নয়। যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাঁহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়। কারণ তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য; যিনি অন্তরে আছেন, তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা। ...যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিধিব আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমান করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে।'

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা নয়

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকের এরূপ ধারণা, আছে যে প্রাচীন ভারতীয়েরা বুঝি ঐহিক উন্নতি, সুখ-সমৃদ্ধি, রাজত্ব, প্রভুত্ব, এ সকল অগ্রাহ্য করিয়া পারত্রিক মঙ্গলের আশায় সকলেই মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য সমালোচক তা লিখিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতার মাত্রাধিক্যই ভারতের অশেষ দুর্দশার কাবণ। এ কথা ঠিক নয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ছিল প্রাণসম্পদে অতি সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষ যখন ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ শিখরে সমারূঢ় তখনও উহা ছিল ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্যে অতি শক্তিমান, এবং বৈশ্যের ধনৈশ্বর্যে অতি সমৃদ্ধ।

'হেথা মূর্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।'

এই ক্ষত্রিয়-গরিমা ও ব্রাহ্মণ-মহিমার সমন্বয়ই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ।

এ সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিয়াছেন—

'আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশ বিদেশে যাতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদান-প্রদান, দিগ্‌বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত দেশে আমরা সেই ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধি রাজ্যের মতো দেখতে পাই এবং

আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল—আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলই শান দিতেন—তাকে একেবারে কর্মাতীত অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা—সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহু দিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র। আমাদের অবয়ব সাদৃশ্যের উপর ভর করে আমরা মনে করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাতে ক্ষিত্যপ্‌তেজের সংশ্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়।

সে সমাজ কোনও একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কালের সমাজ ছিল না। সে সমাজে একদিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য চরিত্রকে সর্বদা মথিত ক'রে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্ত-লোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয়, আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বত্র জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।'

'আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্র পারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

আমাদের ধর্ম পাশ্চাত্যের রিলিজন (Religion) নয়

হিন্দুর ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে কোনও পার্থক্য নাই—পাশ্চাত্যের ন্যায় 'secular life and religious life' নাই। ঋষি-শাস্ত্রে হিন্দুর জীবনকালকে ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের কর্তব্য কর্মাদি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। উহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক আশ্রমোচিত কর্তব্য পালনই হিন্দুর ধর্ম। সুতরাং তাহার সমগ্র জীবনই ধর্মজীবন, উহার লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ।

'য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব, কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়, বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই।

'আমাদের ধর্ম রিলিজন নয়, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নয়, তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসা হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নয়। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়, সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনের জন্য। এই জন্য ভারতীয় আর্য সমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থ-তনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য।'

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে

ভারতবর্ষ উপনিষৎ হইতে যে পরম সত্য, যে একত্বের মন্ত্র লাভ করিয়াছে, সে তাহা কেবল মুখস্থ বা পুস্তকস্থ করিয়া রাখে নাই। সে ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা সেই মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহার সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবন সেই একত্বের মন্ত্রদ্বারাই অনুপ্রাণিত, অনুশাসিত। তাহার ফলে সে নানাকে এক করিবার, পরকে আপন করিবার কৌশলটি শিক্ষা করিয়াছে, বিশ্বমানবের সহিত প্রীতি-মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইতিহাসই ইহার সাক্ষী।

'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশি যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করেন নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি মহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিস্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুতেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশুযুদ্ধ-ভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া উৎসাদন করিয়া সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া,

নিউজিল্যাণ্ড, কেপ-কলোনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই—তাহারা নিজেই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ, তাহাদের লোককে সে-সমাজে নিজের কোন্ খানে আশ্রয় দিবে? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত, সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না।

যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুগৃহীত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিযা দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

আমাদের শাস্ত্রে বার বার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ, অহং সীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, নেশনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনও মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে, এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পারলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানব সভ্যতার সৃষ্টিকার্যে তার স্থান হল না।

ভারতবর্ষের যে-বাণী আমরা পাই, সে-বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড় বড় অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি।

অহংকেই যে-মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সে-ই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের

সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তাহলেই আমরা ধন্য। আমরা যে-ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষ, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষ। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তা হলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নূতন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

'য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ এক মূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মতো হইয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানব-সাধারণের।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতি লাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে। স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ-নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি, যে ধর্ম-নীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয়, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়, এ-কথা একপ্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে,

ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেই জন্য ফরাসি, ইংরেজ, জার্মান, রুশ, ইহারা পরস্পরকে কপট, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে যুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র যুরোপের মুখে পরিহাস-বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খ্রিস্টান মিশনারিদের মুখেও 'ভাই' কথার মধ্যে ভ্রাতৃভাবেব সুর লাগে না।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি যুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। যুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাই ছেদন করিতে পারিলে রাজা-মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা যুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দুক ও দমদম বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না। কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের দ্বারা যাহা পাইব, তাহার দ্বারা আমরা কিছুই বড় হইব না।

পনেরো-ষোল শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নয়। নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চরিত্রে আদর্শ উচ্চতম নয়। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা, চাতুরি ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষণীয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই কি বলে না—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতো বধীৎ।।

আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।'

ভারতের শিক্ষা

'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম-যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বকর্মফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।'

'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা--
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'

মহাত্মা গান্ধী

'আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরেরই পূজারী, এই এক সত্যই আছে, আর অন্য সকলই মিথ্যা। এই সত্য আমি লাভ করি নাই, কিন্তু সন্ধান করিতেছি। সেই অনুসন্ধানে যে বস্তু আমার প্রিয় হইতেও প্রিয় তাহাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এই সন্ধানরূপী যজ্ঞে আমার শরীরকে হোম করিতে প্রস্তুত আছি এবং সে শক্তি আমার আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। এই সত্যকে আমি যতক্ষণ না লাভ করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মা যাহাকে সত্য বলিয়া গণ্য করে তাহাই আমার আশ্রয়। তাহাকেই আমার পথ-প্রদর্শক প্রদীপ জানিয়া তাহারই আশ্রয়ে আমি আমার জীবনযাপন করিতেছি।'

—আত্মকথা

সত্য-সন্ধানী, সত্যের পূজারী মহাত্মা

আশ্রমের সেবাধর্মী সহকর্মী ও শিক্ষার্থীগণকে মহাত্মাজী বলিতেছেন—

'আমাদের সংস্থার মূল সত্যের আগ্রহের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য সত্যব্রত সম্বন্ধেই প্রথমে বলিব।

সত্য শব্দ 'সৎ' হইতে হইয়াছে। সৎ অর্থাৎ যাহা আছে। সত্য তাহাই যাহা থাকিতে পারে। সেইজন্য সত্য ব্যতীত আর কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। সেইজন্যই পরমেশ্বরের যোগ্য নাম হইতেছে 'সৎ' বা 'সত্য'।

আবার যেখানে সত্য আছে সেইখানেই জ্ঞান—শুদ্ধজ্ঞান আছেই। সেইজন্য ঈশ্বরের নামের সহিত 'চিৎ' অর্থাৎ জ্ঞান শব্দ যোজনা করা হয়। আবার যেখানে সত্যজ্ঞান আছে সেইখানেই আনন্দ আছে। শোক সেখানে নাই, কেননা সত্য শাশ্বত, সেইজন্য আনন্দও শাশ্বত। সেইজন্যই তো ঈশ্বরকে আমরা সচ্চিদানন্দ বলি।

সাধারণত সত্য মানে সত্য কথা বলাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এখানে আমরা সত্য শব্দ ব্যাপক অর্থেই দেখিতেছি। বিচারে বাক্যে আচরণে সত্যই—সত্য। এই সত্য যিনি সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, জগতে তাঁহার অন্য কিছুই জানিতে বাকি নাই।

সত্যের আরাধনা হরির মার্গ, উহাতে ভীরুতার স্থান নাই। এ পথে কদাচ হার নাই। ইহা 'মরিয়া বাঁচার' মন্ত্র।

এই সত্যরূপ পরমেশ্বর আমার রত্ন-চিন্তামণিস্বরূপ হইয়াছেন, তোমাদের সকলের কাছেও তিনি তাহাই হইয়া উঠুন।'

তাই তো তিনি বিশ্ব-বন্দিত 'মহাত্মা', রাষ্ট্রগুরু বা জাতির জনক বলিয়া নয়। তিনি সত্যব্রত, সত্যপর, সত্যের পূজক— 'সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ।' সত্যই ধর্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই যোগ, সত্যই সনাতন ব্রহ্ম—'সত্যং ধর্মস্তপো যোগো সত্যং ব্রহ্ম সনাতনম্'—মভাঃ। ব্রহ্মের যেমন অনন্ত বিভূতি, ধর্মের যেমন বিভিন্ন রূপ বিকাশ, সত্যেরও তেমনি বিভিন্ন মূর্তি। দম, দয়া, ত্যাগ, তিতিক্ষা, অহিংসা প্রভৃতি সত্যেরই বিভিন্ন বিভাব—মভাঃ। তাই সত্যের পূজারী মহাত্মা, ব্রহ্মচারী, পরম কারুণিক, সর্বত্যাগী, অহিংসা-মন্ত্রের উদগাতা, তিতিক্ষু তপস্বী;

এই তপশ্চর্যা বড় কঠিন। সংসারত্যাগী আশ্রমবাসী ধর্মসাধকের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সংসারের স্বার্থানুসন্ধি, মিথ্যাচার-কলুষিত কর্মক্ষেত্রে জড়িত হইয়া সত্যপথে চলিতে পদে পদে পদস্খলনেরই সম্ভাবনা বেশি। গান্ধীজীর কর্মক্ষেত্র প্রথমে কিছুকাল ছিল ওকালতি, তারপর আজীবন রাজনীতি। এ দুইটি ক্ষেত্রই মিথ্যাচারের ক্রীড়াভূমি, সত্যের সমাধিস্থান।

আদালতে কোনও মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হওয়ার দুর্ভাগ্য যাহাদের হইয়াছে তাহারাই ইহা জানেন। যদিও আদালতের নাম ধর্মাধিকরণ, যদিও ন্যায় ও সত্যরক্ষা করাই উহার উদ্দেশ্য, তথাপি সত্যের মর্যাদা ঐস্থলে একেবারেই নাই। এক পক্ষ সত্যরক্ষার্থে আদালতের আশ্রয় লইলেন, প্রতিপক্ষ মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া তাহাব বিরোধিতা করিলেন। সেই মিথ্যার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার জন্যও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, সত্যাশ্রয়ীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যও মিথ্যাশ্রয়ী হইতে হয়। কারণ, উকিল বলিবেন প্রমাণ চাই, আদালত বলিবেন প্রমাণ চাই। কিন্তু সকল ঘটনার তো সত্যপ্রমাণ থাকে না। এরূপ স্থলে মিথ্যার আশ্রয় লওয়ার যে লোভ তাহা সংবরণ করিবার দৃঢ়তা কয়জন মক্কেলের বা উকিলের আছে? উহা করিলে মক্কেলের মামলা টিকে না, উকিলের ব্যবসা টিকে না।

এ সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখিয়াছেন—ওকালতিতে আমি অসত্যের প্রয়োগ করি নাই। আমি জানিয়াছি যে, বিরুদ্ধপক্ষের সাক্ষীদিগকে মিথ্যা শিখানো হইয়াছে, আর যদি আমি মক্কেল বা সাক্ষীকে নামমাত্রও মিথ্যা বলিতে উৎসাহিত করি তাহা হইলেই মোকদ্দমায় জিত হয়। কিন্তু আমি এই প্রকার লোভ সকল সময়ই জয় করিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়াছে। তাঁহার 'আত্মকথা' হইতে একটি ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

একটি জটিল হিসাব-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তিনি জুনিয়ার উকিল ছিলেন। সেই সকল হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিবার ভার একটি সালিশী কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের নির্দেশ অনুসারে গান্ধীজীর মক্কেলেরই জয় হয়। প্রতিপক্ষ ঐ হিসাব রদ করিবার জন্য আপিল করে। গান্ধীজী হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই একটা ভুল আছে, জমার দিকের একটা অঙ্ক ভুলে খরচের দিকে লেখা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'ভুল স্বীকার করাই সঙ্গত'। কিন্তু সিনিয়র উকিল বলিলেন—'কেন আমরা ভুল স্বীকার করিয়া প্রতিপক্ষের সুবিধা করিয়া দিব? আমরাই ভুল স্বীকার করিলে ঐ হিসাব রদ হইয়া যাইবে, পুনরায় সালিশী নিযুক্ত করিতে হইবে, মক্কেল বহু খরচের তলে পড়িবে, শেষ ফল কী হইবে তাহাও বলা

যায় না। কোনও বুদ্ধিমান উকিলই মক্কেলকে এরূপ বিপদের ভিতরে ফেলে না। আমরা ভুল স্বীকার না করিলে উহারা সহজে উহা ধরিতে পারিবে না।

গান্ধীজী বলিলেন—'ভুল স্বীকার করিলে যদি মক্কেলের ক্ষতিই হয় তাহাতেই বা আপত্তি কি? ভুল স্বীকার না করিলে আমার দ্বারা এ মোকদ্দমা চালানো অসম্ভব।' সিনিয়র উকিল বলিলেন—'তাহা হইলে আপনিই এই মোকদ্দমায় সওয়াল-জওয়াব কোর্টে করিবেন। ভুল স্বীকারের সর্তে আমি এই মোকদ্দমায় হাজির হইতে প্রস্তুত নই।' এই আলোচনার সময় মক্কেলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটু মুস্কিলে পড়িলেন। গান্ধীজীর উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এবং তাঁহার স্বভাবও তিনি ভালরূপই জানিতেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে তিনি গান্ধীজীকে বলিলেন—'তাহা হইলে আপনিই আদালতে দাঁড়াইবেন, ভুল স্বীকার করিবেন। হারা যদি কপালে থাকে তবে হার হইবে। সত্যের দিকেই ঈশ্বর তো আছেন।'

গান্ধীজী আদালতে উপস্থিত হইয়া ঐ ভুলটি নিজেই বিচারককে দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, এই ভুল ইচ্ছাকৃত ও দুরভিসন্ধিমূলক নয়, উহার জন্য সমস্ত হিসাব রদ হইতে পারে না, উহা সহজেই শুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রতিপক্ষের উকিল অনেক মাথা কুটিলেন। কিন্তু জজ গান্ধীজীর দিকে ঝুঁকিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের উকিলকে বলিলেন, যদি মিঃ গান্ধী ভুল স্বীকার না করিতেন তবে আপনি কী করিতেন? এ ভুলের জন্য আমি সমস্ত হিসাব রদ করিতে পারি না, উহা শুদ্ধ করিয়া লইলেই হইবে।

গান্ধীজীর স্বচ্ছ সরলতা ও সত্যনিষ্ঠায় বিচারক বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—'ওকালতিতে সত্যত্যাগ না করিয়াও কাজ চলে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইল।'

ওকালতিক্ষেত্রে সত্য প্রয়োগের পরীক্ষায় গান্ধীজী কিরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়া সর্বত্রই উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহার পরিচয় পাইলাম। রাজনীতিক্ষেত্রে সত্যসাধন আরও দুষ্কর। এস্থলে অসত্যের নিরঙ্কুশ রাজত্ব। অস্পষ্টোক্তি ও কথার চাতুরি দ্বারা সত্য গোপন করাই কূটনীতিজ্ঞদের প্রশংসনীয় গুণ। মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা রাষ্ট্রক্ষেত্রে লজ্জার বিষয় নয়। 'জোর যার মুলুক তার' এই জঙ্গলী নীতিটা, এই প্রচণ্ড অসত্যটা আধুনিক সভ্যজাতিগণের মধ্যে সত্য বলিয়াই গণ্য হইয়া গিয়াছে।

'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।'

উহার ফলে আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিবাসিগণ মশা-মাছির ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই অসত্যেরই রাজত্বে ভারতবাসী—'নিজবাসভূমে পরবাসী' হইয়া দাসখত লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহামানব গান্ধী ও তাঁহার অনুবর্তী শত সহস্র 'রাজদ্রোহী' পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত, নির্বাসিত, শৃঙ্খলিত হইয়াছিলেন। এই নিদারুণ, নির্মম, সাংঘাতিক অসত্যটার বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর যে সংগ্রাম, তাহাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাই উহার নাম সত্যাগ্রহ।

উহা রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিতান্তই অভিনব। সত্যদ্বারা অসত্যকে জয় করিবে, অহিংসা দ্বারা, প্রেমের দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে—ইহা এই শাশ্বত ধর্ম-নীতি। কিন্তু এ নীতি তো প্রচলিত রাজনীতি নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ জগতে এই প্রথম। তাই সমগ্র বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে উহার প্রয়োগ সন্দর্শন করিল, সানন্দে প্রয়োগকর্তাকে অভিনন্দন করিল।

সত্যসাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণই ঋষিপদবাচ্য। তাঁহারা সত্যসাধনার যে ফল, উহার যে অমোঘ শক্তি তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন—ইহা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। এ প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্র হইতে দুইটি সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

'সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।'

ব্যাখ্যা—'যখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোনও কর্ম না করিয়াই তাহার ফল লাভ হইয়া থাকে।'

যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নে পর্যন্ত তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কায়মনোবাক্যে সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যাচারণ করিবে না, তখন (এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে), তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন যদি তুমি কাহাকেও বল, তুমি কৃতার্থ হও, সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বল, 'রোগমুক্ত হও', সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া যাইবে। —স্বামী বিবেকানন্দ

'অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।'

ব্যাখ্যা—'অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে অপরে তাহার নিকট আপনাদের স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করে।'

'যদি কোনও ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থা লাভ করেন, তবে তাঁহার সম্মুখে, যে সমস্ত প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র, তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে

ব্যাঘ্র, মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না; এই অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অহিংসাব্রত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, তপোবনে ব্যাঘ্র হরিণ একত্র ক্রীড়া করে, মুনিঋষির ক্রোড়ে সর্প শয়ান থাকে, এ সকল কথাও আমরা শ্রবণ করি, কিন্তু শ্রদ্ধার অভাবে সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু মহাত্মা সত্য ও অহিংসার এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। অহিংসার প্রভাবে বন্য পশুও যখন হিংসা ত্যাগ করে, তখন অত্যাচারী নর-পশু হইলেও ত্যাগ ও অহিংসার প্রভাবে তাহার ভাবান্তর (Change of heart) হওয়া অসম্ভব কি? তাই তিনি বলিতেন, অহিংস প্রতিরোধের সফলতার মূলে রহিয়াছে আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধি (Self-sacrifice and self-purification)। প্রশ্ন হইতে পারে, এ সকল উচ্চতম সাধনতত্ত্বের কথা, যোগশক্তির কথা, এইরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ ব্যাপার নয়। সত্যে ও অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ জগতে কয়টি মিলে? সে কথা গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন—

'আত্মশুদ্ধির পথ অত্যন্ত দুর্গম। নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইতে হইবে।

আমি জানি যে এ জন্য নিরন্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি এই ত্রিবিধ পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। এই জন্যই জগতের স্তুতি-গীতি আমাকে স্পর্ধিত করিতে পারে না। বস্তুত, এই সমস্ত স্তুতি-গীতি আমাকে আঘাতই করে। চঞ্চল রিপুকে জয় করা অস্ত্রবলে পৃথিবীকে জয় করা অপেক্ষাও ঢের বেশি দুঃসাধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। সুপ্ত ও গুপ্ত প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব আমি প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছি। ইহাদের অভিজ্ঞতা আমার দীনতাকে প্রকট করিতেছে। কিন্তু তথাপি আমি পরাভূত হয় নাই। বরং এই সব প্রয়োগ, এই সব অভিজ্ঞতা আমাকে রক্ষাই করিতেছে, এবং উহারা আমাকে গভীর আনন্দও দান করিয়াছে। আমি উহাও জানি যে, আমার সম্মুখে এখনও এরূপ পথ আছে যাহা অতি দুর্গম এবং যাহা আমাকে অতিক্রম করিতে হইবে। আমার নিজেকে একেবারে রিক্ত করিয়া দিতে হইবে।'

এ সকল কথায় মহাত্মার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং বর্ধিতই হইয়াছে। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রাক্কালেই তিনি বলিয়াছেন—'আমি চাই রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকভাবে রূপান্তরিত করিতে (to spiritualize the po-

litical life and the political institutions of the country. —Madras speech, 1915)। ইহাতে যে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল মহাপুরুষ স্বীয় জীবনে ও উপদেশ ঈদৃশ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক মানবসমাজকে পবিত্র করিতে প্রচেষ্টা করেন, তাঁহারা মানবজাতিরও নমস্য। বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতম।

অহিংসা-মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক মহাত্মা

গান্ধীজী বলিয়াছেন—'অহিংসা অর্থ সর্বজীবে প্রেম।' বস্তুত অহিংসা অভাবাত্মক শব্দ, উহার ভাবাত্মক প্রতিশব্দ হইল প্রেম। যিনি চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে অহিংস তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। বিশ্বপ্রেমের মূলে রহিয়াছে সর্বভূতের সহিত একাত্মতা-বোধ। ইহাই পরম সত্যস্বরূপের অনুভূতি— যাহাকে বলি পরমেশ্বর। গান্ধীজীর ভাষায়ই কথাটা বলিতেছি—

'সত্য ভিন্ন কোনও পরমেশ্বর আছেন, ইহা আমি অনুভব করি নাই। সত্যময় হওয়ার জন্য অহিংসা একটি অবলম্বন।.... আমার অহিংসার ভিতর ত্রুটি আছে, উহা অসম্পূর্ণ। সহস্র সহস্র সূর্য একত্র করিলেও যে সত্যরূপী সূর্যের তেজের পরিমাণ পাওয়া যায় না, আমার সত্যের দৃষ্টি সেই সূর্যের একটি কিরণের একটু কণামাত্র। সেই সত্য-সূর্যের পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ অহিংসা ভিন্ন হয় না, এতাবৎ কালের পরীক্ষার পর একথা বলিতে পারি। এই ব্যাপক সত্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য জীবমাত্রেরই প্রতি আত্মবৎ প্রেমসম্পন্ন হওয়ার পরম আবশ্যকতা আছে। যাহারা উহা পাইতে ইচ্ছা করে, জীবনের কোনও ক্ষেত্রের বাহিরেই তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না। সেই হেতু আমার সত্যের পূজা আমাকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ধর্মের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার যিনি বলেন, তিনি ধর্ম কি তাহা জানেন না—একথা বলিতে আমার সঙ্কোচ হয় না। ইহা বলাতে অবিনয়ও করা হয় না।

'আত্মশুদ্ধি ব্যতীত জীবমাত্রেরই সহিত ঐক্যবোধ হয় না। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসা ধর্মের পালন অসম্ভব। অশুদ্ধাত্মা পরমাত্মা দর্শন করিতে অসমর্থ, এই হেতু জীবনযাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। এই শুদ্ধি সাধনার দ্বারা প্রাপ্তব্য। নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইতে হইবে।'

তাই তিনি আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীদিগকে বলিতেছেন—

'সকলে এ কথাটা জানিয়া লও—অহিংসা ব্যতীত সত্যের জ্ঞান অসম্ভব। অহিংসা ও সত্য এমন ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে যে, উহা একটা টাকার এ-পিঠ ও-পিঠের মত। উহাকে যেদিকে উল্টাও টাকা টাকাই থাকিয়া যায়। তাহা হইলেও অহিংসাকে সাধন বলিয়া গণ্য করা চাই, সত্যকে সাধ্য জানিবে। সাধন আপনাদের হাতের জিনিস। ইহার জন্যই অহিংসা পরম ধর্ম হইয়াছে। সত্য পরমেশ্বর হইয়াছে। যদি সাধন যত্ন করিয়া অভ্যাস করি, তবে সাধ্য কোনও দিন ত দেখা দিবেই। এইভাবে নিশ্চয় সংকল্প করিলে ইহাতে জগৎকে জয় করা যায়। আমাদের পক্ষে যতই সংকট আসুক না কেন, বাহ্য দৃষ্টিতে আমাদের যতই হার দেখা যাক না কেন, আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া একমাত্র মন্ত্র জপ করিয়া যাওয়া চাই—'সত্য আছে—এক সত্যই আছে, সত্যই এক পরমেশ্বর। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের পথও একটি মাত্রই আছে, একটি মাত্র সাধন আছে, তাহা হইতেছে অহিংসা। তাঁহাকে কদাপি ছাড়িব না। যে সত্যরূপ পরমেশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তিনিই ইহা পালন করার বল দিন।'

এই কথা কয়টিতে গান্ধীজীর জীবনের লক্ষ্য, কর্মের উদ্দেশ্য, ধর্মের আদর্শ ও সাধনার পথ—এ সকলই সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবনের লক্ষ্য ভগবান—পরমাত্মদর্শন, ভগবানকে পাওয়া। ভগবান সত্যস্বরূপ, সর্বভূতময়—সর্বজীবে প্রেম, সর্বজীবের পূজাই ভগবৎপ্রেম, ভগবানের আরাধনা। অহিংসা অর্থই সর্বজীবে প্রেম, সুতরাং উহাই সত্যরূপী ঈশ্বরের আরাধনায় প্রধান অবলম্বন্।

কিন্তু সত্য ও অহিংসাই যাঁহার সাধনার মন্ত্র তিনি মিথ্যাচারকলুষিত হিংসাবিষে-জর্জরিত রাজনীতিক্ষেত্রে আসিলেন কেন? কারণ, তিনি তো সংসারত্যাগী, কর্মত্যাগী, মোক্ষচিন্তানিরত ধ্যানযোগী নন, তিনি লোকহিতার্থে সংসারের কর্মকোলাহলে লিপ্ত অনাসক্ত কর্মযোগী। বিদেশীয় শাসনে ও শোষণে নিষ্পেষিত, ততোধিক অনিষ্টকর বিজাতীয় জড়সভ্যতার ভোগবিলাস মোহে বিভ্রান্ত, স্বজাতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা-সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া যে জাতিটা ক্রমশ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহাকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা অপেক্ষা আর উচ্চতর কর্ম কি আছে? তাই তিনি উহাই স্বধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি সর্বভূতময় সত্যনারায়ণের পূজক তিনি সর্বজীবে প্রেমসম্পন্ন, সর্বজীবের হিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—'সেই হেতু আমার সত্যের পূজা আমাকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।' তিনি গীতোক্ত কর্মযোগী। শ্রীগীতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'আজ গীতা কেবল আমার বাইবেল ও কোরান নয়। ইনি তাহা অপেক্ষাও অধিক ইনি আমার মাতা। এই পৃথিবীতে যে মাতা আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি বহু পূর্বেই হারাইয়াছি, কিন্তু আমার এই চিরন্তনী মাতা অতঃপর সর্বদা আমার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিয়াছেন।'

শ্রীগীতার স্তন্যরসে পরিপুষ্ট গান্ধীজী। গীতাধর্মই তাঁহার উপজীব্য, গীতাধর্মই তাঁহার জীবনব্রত। সে ধর্ম কী? শ্রীগীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। শাঙ্করভাষ্যে এবং স্বামিকৃত টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই শ্লোকটিতে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবের যাহা পরম নিঃশ্রেয়স সেই মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তি কীরূপ সাধকের ঘটে, এই শ্লোকে তাহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।

—গী ১১।৫৫

—হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমারই কর্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন, আমিই যাহার একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যাহার কাহারও উপর শত্রুভাব নাই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

কথা কয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে—

১। প্রথম কথা হইতেছে মৎকর্মকৃৎ অর্থাৎ যিনি ভগবানের কর্ম করেন বা তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম করেন। মায়ামুগ্ধ জীব আমার সংসার, আমার কর্ম, 'আমি কর্তা' এইভাবেই প্রমত্ত। সে জানে না যে, সমস্ত কর্মই পরমেশ্বরের, কর্তা ও কারয়িতা একমাত্র তিনি, সে নিমিত্তমাত্র। যিনি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তাঁহারই ভৃত্যবোধে তাঁহারই কর্ম তাঁহারই প্রীত্যর্থে সম্পন্ন করেন, তিনিই 'মৎকর্মকৃৎ'।

২। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, তাঁহাকে সঙ্গবর্জিত হইতে হইবে অর্থাৎ সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়াসক্ত হইয়া জীব শুভাশুভ কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত আছে, ফলাসক্ত হইয়া যে যজ্ঞ দান তপস্যাদিও করে, তাহাতে ফললাভও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভগবানের পরম পদ লাভের সম্ভাবনা নাই।

৩। তাহা লাভ করিতে হইলে তাহাকে মৎপরম ও মদ্ভক্ত হইতে হইবে অর্থাৎ একমাত্র ভগবানই পরম গতি, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ স্থির করিয়া ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত তাঁহারই ভজনা করিতে হইবে।

৪। সঙ্গে সঙ্গে সর্বভূতে নির্বৈর হইতে হইবে। কেননা, সর্বভূতেও তিনি আছেন, সুতরাং জীবের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা বা বৈরভাব পোষণ করিলে ঈশ্বর-প্রীতি হয় না। লোক-প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তি বস্তুত অভিন্ন।

ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগীর লক্ষণ। ইহাই গান্ধীজীর জীবনাদর্শ।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শ্রীগীতায় সর্বত্রই ভগবান প্রিয় শিষ্যকে যুদ্ধকার্যে প্রণোদিত করিতেছেন, অর্জুনও ভগবদ্বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া পরিশেষে যুদ্ধই করিলেন। এ স্থলে কিন্তু নির্বৈর হইতে বলা হইতেছে। নির্বৈর হইলে আবার যুদ্ধ হয় কীরূপে? আর যে গ্রন্থে আদ্যোপান্ত যুদ্ধের প্রেরণা তাহাই বা অহিংসা মন্ত্রের দ্রঢ়িষ্ঠ সাধক মহাত্মাজীর বরিষ্ঠ জীবনাদর্শ হয় কীরূপে?

শ্রীগীতায় জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে ভগবান যে অপূর্ব যোগধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন তাহার মর্ম সম্যক্‌রূপে বুঝিলে এ প্রশ্ন উঠিবে না। উহার স্থূল কথা হইতেছে এই—আত্মজ্ঞান লাভ কর, কামনা ত্যাগ কর, স্থিতপ্রজ্ঞ হও, সর্বভূতে সমদর্শী হও, অহংকার ও মমত্ববুদ্ধি দূর কর—আমাতে আত্মসমর্পণ ও কর্মসমর্পণ কর, আমারই ভৃত্যবোধে আপনাকে নিমিত্তমাত্র জ্ঞান করিয়া নিষ্কামভাবে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া যাও, তাহাতে কর্মের শুভাশুভ ফলভাগী হইবে না। এ স্থলে 'নির্বৈর' শব্দের অর্থ এই যে, কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না। আসক্তি যাঁহার ত্যাগ হইয়াছে, অহংবুদ্ধি যাঁহার নাই, সর্বভূতে যাঁহার সমত্ববুদ্ধি জন্মিয়াছে, যাঁহার আত্মপর, শত্রু-মিত্র ভেদবুদ্ধি নাই, তাঁহার মনে বৈরভাব আসিবে কীরূপে? এইরূপ সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন শুদ্ধ অন্তঃকরণে নির্বৈর হইয়া যুদ্ধ করা চলে এবং তাহাই ভগবানের উপদেশ। লোকরক্ষা বা লোকহত্যা ইত্যাদি ধর্মাধর্ম বিচার এ স্থলে উপস্থিত হয় না, কেননা ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কর্মে নাই, বাসনায়। এই জন্যই গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—

> যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
> হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।। —গী ১৮।১৭

—যাহার 'আমি কর্তা' এই ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি কর্মের ফলাফলে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না এবং তাহার ফলেও আবদ্ধ হন না।

অহংবুদ্ধি ও আসক্তি যদি ত্যাগ হয় তবে কর্ম যাহাই হউক না কেন উহাতে বন্ধন হয় না।

মহাত্মা গান্ধী 'অনাসক্তি যোগ' নাম দিয়া গুজরাতী ভাষায় ভাষ্য ও অনুবাদ-সহ শ্রীগীতার একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর মতে শ্রীগীতায় যে যুদ্ধের প্রেরণা আছে উহা ভৌতিক যুদ্ধ নয়, নৈতিক যুদ্ধ, উহা রূপকের ভাষা। তিনি লিখিয়াছেন—ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়, পরন্তু রূপকের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভিতরে যে অন্তর্যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে ইহাতে তাহাই বর্ণিত

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এই রূপকটির এই ভাবে বিশদ করিয়াছেন—দেহ রথ, রথী অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও লাগাম মন। রথ, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই—কুরুক্ষেত্ররূপ হৃদয়-ক্ষেত্র। দৈবী ও আসুরী, হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। সেই যুদ্ধ নিয়তই মানুষের হৃদয়-ক্ষেত্রে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে যাহাতে দৈবী-শক্তিই জয়ী হয় তজ্জন্য ভগবান সারথিবেশে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান অজ্ঞদেহী অর্জুনকে দিতেছেন।

অন্তর্যুদ্ধের এইরূপ রূপক বর্ণনা মহাভারত, কঠোপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও আছে। শ্রীগীতাতেও এই তত্ত্বটির উল্লেখ আছে এবং তথায় যুদ্ধের ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—'কামনা-বাসনাই জীবের প্রবল শত্রু, উহাই সর্ববিধ পাপের মূল, তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে সংহার কর ('জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্')।

সাধারণভাবে কেহ যদি বলেন যে, ইহাই গীতার সারকথা, মূল তাৎপর্য, তাহা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু গীতায় আদ্যোপান্ত নানা তত্ত্বালোচনার মধ্যে মধ্যে 'যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর' এইরূপ প্রেরণা আছে। সে সকলের দ্বারা এই অন্তর্যুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা বড়ই কষ্টকল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

অহিংসনীতি গীতারও মান্য, তবে গীতা বলেন যে, অহিংস হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, কেননা ফলত্যাগী কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগীর কর্মে পাপ স্পর্শে না, উহার ফল যাহাই হউক (১৮।১৭, ২।৪৯।৫০।৫১ ইত্যাদি)।

এ প্রসঙ্গে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন—'ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ কর্মফলত্যাগীর দ্বারাও হইতে পারে, ঐ কথা গীতাকারের ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মানে করিলেও করা যায়। কিন্তু গীতার শিক্ষা ব্যবহারে আনিবার জন্য প্রায় ৪০ বৎসর সতত প্রযত্ন করিবার পর নম্রতাপূর্বক আমাকে একথা বলিতে হইবে যে, সত্য ও অহিংসার পালন না করিলে সম্পূর্ণ কর্মফলত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।'

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহাত্মা

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতার মূলে ছিলেন ঋষিগণ। মহাত্মা তাঁহাদেরই একজন। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন—'আমি ঋষির বেশে রাজনৈতিক নই', তাহা হইলেও আমরা এ কথা বলিবই যে, তিনি রাজনৈতিক বেশে ঋষি। ঋষিগণের সাধন-সম্পদ ছিল ভূমা—সত্য-প্রেম-ঐক্যের মন্ত্র। তাঁহারও তাহাই। ঋষিশাস্ত্র যাহাকে 'যম' বলেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ('অহিংসা-সত্যাস্তেয়-

ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ')—উহাই তিনি জীবনব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আজীবন সুদৃঢ় নিষ্ঠাসহকারে অবিচলিত ভাবে এই মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা এ যুগে 'সভ্যতা' নামক যে বস্তুটির সহিত পরিচিত হইয়াছি, রেল-স্টিমার-কলকারখানার কোলাহলে 'নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত' শ্রমিক-ধনিক-সমস্যায় সতত সংক্ষুব্ধ, মানুষের সর্বপ্রকার ভোগসুখসম্ভারের পরিবেষণে ব্যতিব্যস্ত এই যান্ত্রিক জড় সভ্যতার আধিপত্যটা গান্ধীজী মনে করিতেন ইংরেজের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকর ও অবনতিকর। তিনি চাহিয়াছিলেন তাঁহার দেশবাসীকে উহার মোহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র হইল দৈহিক ও ঐহিক সুখভোগ। ঐহিকের সুখ সকলেই চায়, কিন্তু ইহটা তো চিরকাল থাকে না, পরকালও আছে। নশ্বর দেহটাই তো মানুষের সর্বস্ব নয়, আত্মাও আছেন যাহা অবিনশ্বর, যাহা অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। সেই অমৃতের সংবাদ দিয়াছেন ভারতের ঋষিগণ, সেই আত্মার সন্ধানই ভারতের শিক্ষা, উহাতেই ভারতের দীক্ষা। এই শিক্ষা-দীক্ষা যাহার মূলে তাহাই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতা, আত্মার ন্যায় উহাও অবিনশ্বর।

এই শিক্ষায় শিক্ষিতা, এই দীক্ষায় দীক্ষিতা হইয়াই ব্রহ্মবাদিনী ঋষি-পত্নী স্বামী-প্রদত্ত ধন-সম্পত্তি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'—যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা দ্বারা আমি কী করিব? এই অমৃতত্ব লাভের উপায়—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য ('ত্যাগেনৈ-কেনামৃতত্বমানশুঃ', 'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্')। উহাই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি। ঋষিগণের পরিকল্পিত সমাজ-জীবনের গুণগত বর্ণ-বিভাগ, ব্যষ্টি-জীবনের চতুরাশ্রম প্রভৃতি আর্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ সকলের উদ্দেশ্য হইতেছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিভেদে সমাজের সর্বস্তরের নর-নারীকে ক্রমানুশীলনে বিশোধিত ও উন্নীত করিয়া অমৃতত্বের অভিমুখী করা, দিব্য জীবনের অধিকারী করা।

জগতের সকল জাতির সভ্যতা, সকল দেশের সামাজিক বিধিব্যবস্থা ঐহিক ভোগাসুখকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। আর্য ঋষি বলিলেন—'ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, অপরের ধনে লোভ করিও না।' —'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। মা গৃধঃ কস্যসিদ্ ধনম্।' ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল কথাই ত্যাগ। মহাত্মা এই মহতী সংস্কৃতিরই জীবন্ত বিগ্রহ। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'আমার মত এই যে, আমাদের সভ্যতার কাছে পৃথিবীতে আর কোনও সভ্যতাই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার

কাছাকাছি কিছু করিতে পারে এমন লোক দেখা যায় না। রোম মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, গ্রীস ধ্বংস হইয়াছে, মিশরের আধিপত্য আজ আর নাই। চীনের অবস্থা কিছু বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পড়িয়া গেলেও শিকড় তাহার মজবুত আছে। যে রোম ও গ্রীস নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পুঁথির পাঠই ইউরোপীয়েরা পড়িতেছে। উহাদের মত ভুল করিবে না—এই অহংকারেই তাহারা আজ মত্ত। এমনি দীন তাহাদের অবস্থা, কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে। ইহাই হিন্দুস্থানের গৌরব। হিন্দুস্থানের উপর এই দোষ দেওয়া হয় যে, হিন্দুস্থান এতই অসভ্য, এতই অজ্ঞান এবং এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, ওখানে কোনও পরিবর্তনই যায় না। এই অপরাধ আমাদের ভূষণ, কলঙ্ক নয়। অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কী করিয়া তাহার পরিবর্তন করা যায়? অনেক পথ-প্রদর্শক আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে। ইহাই উহার সৌন্দর্য, ইহাই উহার আশার আলোক। অনেক ইংরেজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'উপরের বিচার অনুসারে হিন্দুস্থানের কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিবার নাই। এ কথা একেবারে খাঁটি।'

—হিন্দ স্বরাজ্য

জাতির জনক মহাত্মা

দেশ লইয়া যে জাতি, সমগ্র ভারতের অধিবাসীরা যে এক জাতি, এইরূপ স্বাজাত্যবোধ (nation-sense) ভারতবাসীর প্রাচীনকালে ছিল কি? ছিল না, একথা বলা যায় না।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভারতবর্ষের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা আছে। প্রাচীন হিন্দুগণ আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষকেই আপনাদের মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতেন, আপনাদিগকে ভারত-সন্তান (Indians) বলিয়া জ্ঞান করিতেন—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

প্রাচীনেরাও আধুনিকগণের ন্যায় বলিতেন—'সার্থক জনম মোদের, জন্মেছি এ দেশে'।

অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।।—বিঃ পুঃ ২।৩।২৩

—জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করে।

বস্তুত প্রাচীন হিন্দুদিগেরও দেশভক্তি ছিল, দেশাত্মবোধ ছিল। কিন্তু উহা পাশ্চাত্যের দুরন্ত স্বাজাত্যবোধের ন্যায় উগ্রভাব স্ফূর্তি পায় নাই। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' ইহা প্রাচীন হিন্দুরই কথা। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তিসূচক সার্থক বাণী ইহা অপেক্ষা আর কী আছে? প্রাচীনেরা এই ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি, কর্মভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, দেবগণও এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন ('অতোপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত-ভূতলে'—ভাঃ ৫।১৯), এ সকল কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। বিবিধ পুরাণে সমগ্র ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া নদীসকলের উল্লেখ আছে এবং এই সকলের নামোচ্চারণ করিলেই পবিত্র হওয়া যায়, এইরূপ তাহাদের মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে। হিন্দুশাস্ত্র গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর পবিত্র সলিল সম্মুখে স্মরণ করিয়া ('জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু') পিতৃকার্য ও দেবকার্যাদি সম্পন্ন করিবার বিধান দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই নদ-নদীসকল কেবল এক প্রদেশে বা কেবল আর্যাবর্তেই অবস্থিত নয়, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়াই উহাদের অবস্থান। হিন্দুর তীর্থস্থানসমূহ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, দ্বারকা হইতে পুরী পর্যন্ত সর্বভারত ব্যাপিয়া অবস্থিত।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই সকল রাজ্যের মধ্যে একটা একত্ব স্থাপনের প্রয়াস, অসপত্ন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস প্রাচীন হিন্দু রাজগণের পুণ্যকর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। ইহারই নাম রাজসূয় যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ এই রীতি অনুসরণ করিয়াই পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারতে ধর্মরাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়ে তৎকালীন বৃহত্তর ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে শৌর্য-বীর্য, বিক্রম-বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও মোটের উপর উহা ভেদ-বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও আত্ম-কলহের করুণ কাহিনী।

ইংরেজ আমলে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র রাজশাসন এবং এক রাজভাষার প্রবর্তন জাতীয় একত্ববোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়। ফলে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে থাকে; তখনই বাঙালি কবির কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন উঠিয়াছিল—

'কত কাল পরে, বল ভারত রে,
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।'

বাংলাদেশেই জাতীয়ভাবের বিশেষ উন্মেষ এবং জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তখন মহামতি গোখ্‌লে বলিয়াছিলেন—'আজ বাংলা যাহা চিন্তা করে, কাল ভারতবর্ষ তাহা গ্রহণ করে।' এ সম্বন্ধে সেই সময় গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন—

'সত্যকার জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে বঙ্গভঙ্গ হইতে। এজন্য লর্ড কার্জনকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সেইদিন হইতেই ইংরেজের রাজ্য দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ দ্বারাই ইংরেজ রাজত্ব সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ লইয়াই সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধতা করিবাব জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের হৃদয় শক্তিতে পূর্ণ ছিল। বাংলার অনেক নেতা নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। সেই যে শক্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে আগুন আর নিভিবে না। বঙ্গভঙ্গ তো রদ হইয়া যাইবেই, * বাংলা আবার এক তো হইবেই; কিন্তু ইংরেজের জাহাজে যে ছিদ্র হইয়াছে তাহা আর বন্ধ হইবে না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন স্বরাজ্যের আন্দোলন। এই নূতন চিন্তাধারা হইতেছে বঙ্গভঙ্গের প্রধান ফল। স্বদেশীর আন্দোলন শুরু হইল। ছোট বড় ইংরেজ দেখিয়া ডরান আর কাঁপুনি বন্ধ হইল। উহাদিগকে মারপিট পর্যন্ত করার সাহস দেখা দিল। জেলের ভয় ভাঙ্গিল। বাংলার এই বাতাস উত্তরে পাঞ্জাব পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহিয়া গেল।'

এই জাগরণের ফলে রাষ্ট্রনায়কগণের মধ্যে পূর্বতন মতভেদ আরও স্পষ্টভাবে দেখা দেয় এবং পরস্পর-বিরোধী দুইটি দলের সৃষ্টি হয়—নরমপন্থী (Moderates) এবং চরমপন্থী (Extremists) এতদ্ব্যতীত যুবকগণের মধ্যে একটি অতি-চরমপন্থী দলেরও উদ্ভব হয়, ইহাদিগকে বিপ্লববাদী (Revolutionary) বলা হইত। দেশের অনেক দেশপ্রাণ বালক ও যুবক স্বাধীনতার জন্য এই পথে যাইয়া আত্মবলিদান করিয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেস নরমপন্থীগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল। চরমপন্থীগণ উহাকে বলিতেন, 'তিন দিনের তামাসা'। কংগ্রেস-সদস্যেরা বৎসরে একবার মিলিত হইয়া ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বক্তৃতা করিতেন, প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করিতেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতেন। এই সকল প্রস্তাব ব্রিটিশ-রাজের নিকট শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া ও প্রার্থনা থাকিত— 'আবেদন আর নিবেদনের থালা

---

* বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ায় তিন বৎসর পূর্বে গান্ধীজী ইহা লেখেন (১৯০৮)। ১৯১২ সনে বাংলা আবার জোড়া লাগে।

বয়ে বয়ে নত শির।' সারা বৎসর কংগ্রেসের কোনও কর্ম ছিল না, কংগ্রেস-কর্মীও ছিল না। সর্বসাধারণের সহিত কংগ্রেসের কোনও যোগসূত্র ছিল না।

এইরূপ যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি আফ্রিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া একটি আশ্রম স্থাপনপূর্বক তাহার আদর্শানুরূপ জীবনযাপনে আগ্রহশীল কয়েকটি শিষ্য বা বন্ধু লইয়া তথায় বাস করিয়া দেশের ও ধর্মের সেবা করিতে মনস্থ করেন। ১৯১৭ সালে সবরমতী তীরে এই আশ্রম স্থাপিত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার কর্ম-নীতি ও কার্যপ্রণালী কীরূপ হইবে তাহা তিনি অনেক পূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন কালে পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থেই তাহা জানা যায়।

ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি প্রথমে চম্পারণে নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্য সত্যাগ্রহ করেন এবং ইহাতে প্রত্যাশিত শুভফল লাভ করেন। ইহার পর আহমেদাবাদে মজুর-মালিকের বিবাদে মজুরদের পক্ষে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন এবং তাহাতে জয়লাভ করেন। তৎপর ১৯১৮ সনে খেরা জেলায় প্রজাদের পক্ষে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। এখানে আইন ছিল যে কোনও বৎসর চারি আনা শস্য হইলে খাজনা আদায় বন্ধ থাকিবে। প্রজারা বলেন চারি আনার কম শস্য হইয়াছে, গভর্ণমেন্ট বলেন, চারি আনার বেশি শস্য হইয়াছে। আবেদন নিবেদনে কোনও ফল হয় না, পরিশেষে গান্ধীজী প্রজাদিগকে লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। প্রজারা খাজনা দিবে না, গভর্ণমেন্ট তাহাদের জমি বা অন্য সম্পত্তি নিলাম-বিক্রি করুন বা যাহা ইচ্ছা হয় করুন। গভর্ণমেন্ট তিন মাস সত্যাগ্রহীদের জমি-জমা নীলাম-বিক্রি ইত্যাদি করিয়া শেষে উহা বন্ধ করিয়া দেন। সত্যাগ্রহীরা জয়লাভ করে।

এই সকল প্রাথমিক সত্যাগ্রহ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু এ সকলে অহিংস প্রতিরোধ (Passive resistance) বা সত্যাগ্রহ কী, উহা কীরূপে পরিচালনা করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার সহকর্মীগণ বাস্তব শিক্ষা লাভ করেন। ভারতীয় রাষ্ট্র-নায়কগণেরও দৃষ্টি ইহার অনুকূলে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সকল সত্যাগ্রহ নিরক্ষর কৃষক-মজুরদের দ্বারাই অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল, তাহারা সংযত ও সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া সোৎসাহে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয় রাষ্ট্র-নায়কগণের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহারা উত্তরোত্তর গান্ধীজীর অনুবর্তী হইতে লাগিলেন। তৎপর গান্ধীজী বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে এই নীতি চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

গান্ধীজী প্রথমেই রাওলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ করিবার জন্য হরতাল ঘোষণা করেন এবং বোম্বাই-এ আইন অমান্য করিয়া তাঁহার রচিত নিষিদ্ধ পুস্তক 'হিন্দ স্বরাজ্য' বিক্রয় করেন। গভর্ণমেন্ট দিল্লির পথে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বাইতে ফেরৎ আনে। গ্রেপ্তারের ফলে আহমেদাবাদ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে হাঙ্গামা হয়। গভর্ণমেন্ট কড়া শাসন আরম্ভ করিয়া দেয়, অত্যাচার ও গুলি চলে, ১২ই এপ্রিল (১৯১৯) জালিয়ানওয়ালাবাগের দানবীয় ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়—জেনারেল ডায়ার প্রাচীর-বেষ্টিত আবদ্ধ বাগে সমবেত দশ সহস্র লোকের উপর অনবরত দশ মিনিট কাল গুলি চালায়। সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং অকথ্য নির্যাতন চলিতে থাকে।

একদিকে যেমন পুলিশের অবাধ অত্যাচার চলিতেছিল, অন্য দিকে আবার স্থানে স্থানে প্রতিশোধপরায়ণ উন্মত্ত জনতা পুলিশের উপরও আক্রমণ চালাইতেছিল। এই সকল ঘটনায় ব্যথিত হইয়া গান্ধীজী সাময়িকভাবে সত্যাগ্রহ স্থগিত করিয়া দিলেন, প্রকাশ্যভাবে ভুল স্বীকার করিয়া বলিলেন—'সর্বসাধারণকে অহিংস প্রতিরোধে সুষ্ঠুরূপে সুশিক্ষিত না করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া আমি পর্বতপ্রমাণ ভুল করিয়াছি—

"I have called upon the people to launch upon civil disobedience before they have qualified themselves for it, and this mistake of mine seemed to me to be of a Himalayan magnitude.... It is not without sorrow I feel compelled to advise the temporary suspension of civil disobedience."

এই সনে (১৯১৯) ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই স্থলে প্রথম সমস্ত ভারতীয় নেতাদের সহিত গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও কর্মের যোগাযোগ সাধনের সুযোগ ঘটে।

এই সময় মুসলিম লীগ খিলাফত আন্দোলনে লিপ্ত ছিল, গান্ধীজী উহা সমর্থন করেন। ১৯২০ সনে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস গান্ধীজীর উত্থাপিত অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করে (non-violent, non-co-operation)। এই প্রস্তাবে ব্রিটিশরাজ-প্রদত্ত খেতাব বর্জন, কাউনসিল বর্জন, আদালত বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশি পণ্য বর্জন ইত্যাদি বিষয় ছিল। এই আন্দোলনে সমগ্র দেশ অতি সন্তোষজনকভাবে সাড়া দিয়াছিল। অকস্মাৎ দেশে যেন এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হইল। দেশের স্বাধীনতা আসিল না বটে, কিন্তু লোকচিত্তের স্বাধীনতা, নির্ভীকতা, ত্যাগশীলতা, অপূর্বভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিল।

দেশের মুক্তির জন্য দুঃখবরণে আগ্রহশীল সে সময়ের সত্যাগ্রহীদের উদ্যম উৎসাহ কীরূপ চরমে উঠিয়াছিল তাহা জওহরলালজীর উক্তিতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি এক ম্যাজিস্ট্রেটকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন—'Affection and loyalty are of the heart. They cannot be purchased at the market-place, much less can they be extorted at the point of the bayonet. We are fighting for freedom of our country and faith. I shall go to jail again most willingly and joyfully. Jail has indeed become a heaven for us, a holy place of pilgrimage. I marvel at my good fortune. To serve India in the battle of freedom is honour enough. To serve her under a leader like Mahatma Gandhi is doubly fortunate. But to suffer for the dear country! What greater fortune could befall an Indian unless it is death for the cause or the full realization of our glorious dream.'

'রাজভক্তি চিত্তের জিনিস, উহা বাজারে ক্রয় করা যায় না, বন্দুক বা ছোরা দেখাইয়া আদায় করা যায় না। আমরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছি। আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে আবারও জেলে যাইব। বাস্তবিকই জেলখানা হইয়াছে আমাদের স্বর্গ, পবিত্র তীর্থস্থান। আমার এই সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত, বিস্মিত। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতের সেবা করা যথেষ্ট সম্মানের বিষয়, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতার পতাকাতলে দেশের সেবা করা দ্বিগুণ সৌভাগ্যের বিষয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে হয় মৃত্যু না হয় ঈপ্সিত সিদ্ধিলাভ, ইহা ব্যতীত ভারতবাসীর অধিকতর গৌরবের বিষয় আর কি আছে?'

আন্দোলন পুরাদমে চলিতে লাগিল। ১৯২২ সনে ত্রিশ হাজার সত্যাগ্রহী কারাবাসে গেল, ততোধিক লোক আদেশের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

কিন্তু আন্দোলন যতই ব্যাপক হইতে লাগিল ততই উহা বিশুদ্ধ অহিংস-নীতি হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অ-সত্যাগ্রহী বাহিরের জনতাও উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিংসাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হইত। চৌরীচেরায় প্রতিশোধপরায়ণ ক্ষিপ্ত জনতা কর্তৃক দুইটি কনস্টবল নৃশংসভাবে নিহত হয়। ইহার পরই গান্ধীজী হঠাৎ সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করিলেন এবং পাঁচ দিন অনশন যাপন করিলেন। তিনি লিখিলেন—

'God had been abundantly kind to me. He has warned me the third time that there is not as yet in India that non-

violent and truthful atmosphere which alone can justify mass civil disobedience.'

এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেস নেতৃগণ ও কর্মীগণ সকলেই মর্মাহত হইলেন। অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পত্রাদিও লিখিলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

ওদিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া উহা একেবারে নিষ্পেষিত করার জন্য সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিবার সিদ্ধান্ত পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিল। বিলাত হইতেও এ সম্বন্ধে বড় লাটসাহেবের নিকট জরুরী নির্দেশ আসিতে লাগিল। কিন্তু আন্দোলন তো মহাত্মাজী নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহা সত্ত্বেও 'Young India'-তে তিনটি প্রবন্ধ লেখার দরুণ রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ৬ বৎসরের জন্য কারাবাসে পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট শাসন-সংস্কার-সংসৃষ্ট নূতন আইনটি তাড়াতাড়ি পাশ করিয়া স্বল্পসন্তুষ্ট নরমপন্থীদিগকে (Liberals) পরিতুষ্ট করিলেন।

দুই বৎসর পরে অসুস্থতার দরুণ গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জেল হইতে বাহির হইয়া গান্ধীজী দেখিলেন, কংগ্রেসের ভিতর দুইটি দলের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহার প্রবর্তিত কর্মধারা যথাযথ অনুসৃত হইতেছে না। তিনি দুই দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কংগ্রেসের কার্য স্বরাজ্য দলের হাতে ছাড়িয়া নিজে সূতা-কাটা ও খাদি-প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হরিজন উন্নয়ন প্রভৃতি জাতি-গঠন-মূলক কার্যে একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করেন। শত সহস্র ত্যাগশীল, একনিষ্ঠ, অহিংসধর্মী কর্মী এই জাতিগঠনের তপশ্চর্যায় তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিলেন।

১৯৩০ সনে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজীর উত্থাপিত সত্যাগ্রহ প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি আবার প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

গান্ধীজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লাহোর কংগ্রেসের এই প্রস্তাবটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া আসিতেছিল তাহাকে 'স্বরাজ' বলা হইত। কিন্তু স্বরাজ বলিতে কী বুঝায় তাহা এ পর্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। লাহোর কংগ্রেসেই উহা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয় যে, স্বরাজ অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে জওহরলালজী আপনাকে সমাজতন্ত্রী (Socialist) এবং সাধারণতন্ত্রী (Republican) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, কংগ্রেস যে স্বরাজ চাহে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার বহির্ভূত পূর্ণ স্বাধীনতা।

'Independence for us means complete freedom from British domination and British imperialism.'

গান্ধীজীর উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রথম কথাই এই—কংগ্রেস সংবিধানের প্রথম দফায় যে স্বরাজ শব্দের উল্লেখ আছে উহার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা—'The word Swaraj in the first article of the Congress constitution shall mean complete Independence.'

৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে হর্ষধ্বনির মধ্যে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ স্বরাজ-পতাকা উত্তোলিত হইল, চতুর্দিকে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল— 'Inquilab Zindabad, Long Live Revolution.'

কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করিলেন, ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করা হইবে। ঐ দিবস দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিয়া সকলে পূর্ণ-স্বরাজমন্ত্র গ্রহণ করিবে। তদবধি প্রতি বৎসর ভারতবাসী ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস (বর্তমানে গণতন্ত্র দিবস) পালন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য স্বরাজ লাভের পর ১৫ই আগস্টই বাস্তব স্বাধীনতা দিবস হইয়াছে।

ওদিকে বিলাতে এক সভায় বক্তৃতাকালে আর্ল রাসেল (Under-Secretary for India) বলিলেন—'ভারতের পক্ষে পূর্ণস্বরাজের কথা বলা বোকামি, উহা এখন তো সম্ভবপর নয়ই, দূর ভবিষ্যতেও হইবে না।'

গান্ধীজী Young India-তে লিখিলেন—আর্ল রাসেল যাহা দিতে চান তাহা লৌহ-শৃঙ্খলের পরিবর্তে স্বর্ণ-শৃঙ্খল। যদি কর্মীগণ অহিংস থাকে এবং গঠনমূলক কার্য সুষ্ঠুভাবে চলে, তবে আমি ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন (mass civil disobedience) কয়েক মাসের মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত করিব।

আবার স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গান্ধীজী প্রস্তাব করিলেন, —প্রথমে লবণ সত্যাগ্রহ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আমি আশ্রমের শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকটি কর্মী লইয়া সমুদ্রতীরস্থ ডাণ্ডি নামক গ্রামে যাইয়া লবণ আইন অমান্য করিব। পরে বাহিরের কর্মীগণ যোগ দিতে পারিবে।

ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ হইল মার্চ মাসে, গান্ধীজী লাঠি হাতে নগ্নপদে চলিলেন। গুজরাটের বালুকাকীর্ণ পথ উত্তপ্ত, অনেক স্থলে উহা জলসিক্ত ও পত্রাবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুইটি সহযাত্রী চলিতে অশক্ত হওয়ায় গরুর গাড়ির ব্যবস্থা হইল। গান্ধীজী বলিলেন—'ভগবৎকৃপায় আমি পায়ে হাঁটিয়াই যাইতে পারিব, এ আমার তীর্থযাত্রা—অমরনাথ, বদরী, কেদার।' 'God willing, I hope to do the march on foot. My feeling is like that of the pilgrim to Amarnath or Badri-Kedar. For me, this is nothing less than holy pilgrimage.'

২৪ দিনে ২৪১ মাইল পথ হাঁটিয়া দলবল সহ গান্ধীজী ডাণ্ডি পৌঁছিলেন। তিনি সমুদ্র-স্নান করিয়া তীর হইতে একখণ্ড সামুদ্র-লবণ কুড়াইয়া লইলেন। তারপর তিনি বলিলেন—এক্ষণে যে কেহ লবণ-সংগ্রহ করিতে পারে, বা তৈরি করিতে পারে, যদি সে লবণ-আইন ভঙ্গ করার দরুন দণ্ডভোগ করিতে প্রস্তুত থাকে এবং সম্পূর্ণ অহিংস থাকে। তিনি আরও বলিলেন—আমাকে সরকার গ্রেপ্তার করিলে আব্বাস তৈয়াবজী (বরোদার ভূতপূর্ব জজ) আমার স্থলবর্তী হইয়া আদেশ দিবেন এবং তিনি গ্রেপ্তার হইলে সরোজিনী নাইডু তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন।

কয়েকদিন পুলিশ বাধা দিল না। তারপর গান্ধীজী নিকটবর্তী ধর্ষণা নামক স্থানে গভর্ণমেন্টের লবণের গোলায় প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহ করিবেন মনস্থ করিলেন এবং বড়লাটের নিকট তারিখ নির্দেশ করিয়া তদনুরূপ বিজ্ঞপ্তি-পত্র পাঠাইলেন। কিন্তু উহার পূর্বেই ৪ঠা মে মধ্যরাত্রিতে সুরাটের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশদল সহ তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে আব্বাস তৈয়াবজী ধর্ষণা গোলার দিকে যাত্রা করিলে তাঁহাকে দলবলসহ গ্রেপ্তার করা হইল। তৎপর সরোজিনী নাইডু তাঁহার স্থান গ্রহণ করিলেন এবং ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক সহ ধর্ষণা গোলা দখল করিতে গেলেন। তথাকার নিদারুণ নির্যাতনের কাহিনী আমেরিকার সাংবাদিক মিঃ মিলার (Mr. Miller) স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

A hundred yards from the stockade the satyagrahis drew up and picked a column advance, wading the ditches and approaching the barbed wire. Police officers ordered them to disperse. The column calmly ignored the warning and slowly went forward. Suddenly at a word of command, scores of native police rushed upon the advancing marchers, and rained blows on their heads with steelshod lathis. Not one of the marchers even raised an arm to fend off the blows. They were down like ninepins. Those struck down fell sprawling unconsious or writhing in pain with fractured skull or broken shoulders. In two or three minutes the ground was quilted with bodies. Great patches of blood widened on their white clothes. The survivers without breaking the ranks silently and doggedly marched on until struck down.

So it went on. When the first column was gone another marched forward. Though every one knew that within a few

minutes he would be beaten down, perhaps killed, I could detect no sign of wavering or fear. They marched steadily with heads up. The police rushed on and methodically and mechanically beat down the second batch. There was no fight, no struggle, the marchers simply walked forward until struck down. There were no outcries, only groans after the fall.

After a while the tactics were varied, and twenty-five men would advance and sit waiting. The police beat them with their lathis. 'Bodies toppled over in threes and fours, bleeding from great gashes on their scalps. Group after group walked forward, sat down and submitted being beaten into insensibility, without raising an arm to fend off the blows. Finally, the police became enraged by the non-resistance, sharing I suppose, the helpless rage I had felt at the demonstrators for not fighting back. They commenced savagely kicking the seated men in the abdomen and testicles. The injured men writhed and squealed in agony, which seemed to inflame the fury of the police, and the crowd again almost broke away from their leaders. The police then began dragging the sitting men by the arms or feet, sometimes for a hundred yards and throwing them into ditches. One was dragged to a ditch where I stood; the splash of his body doused me with the muddy water. Another policeman dragged a Gandhi man to the ditch, threw him in, then belaboured him over the head with his lathi. Hour after hour stretcher-bearers carried back a stream of inert, bleeding bodies.'*

'বেড়ার ১০০ গজ দূরে সত্যাগ্রহীরা সার বাঁধিয়া দাঁড়াইল; এক সার বাছাই করা সত্যাগ্রহী খাদের জল ভাঙ্গিয়া কাঁটাতারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুলিশ কর্মচারীরা তাহাদের চলিয়া যাইতে হুকুম করিলেন। সত্যাগ্রহীর দল শান্তভাবে সেই সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। হুকুম পাইয়া হঠাৎ কয়েক কুড়ি দেশি পুলিশ সেই অগ্রগামী সত্যাগ্রহীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল

* D G. Tendulkar's 'Mahatma'. Vol. 3

এবং তাহাদের মাথায় লোহা-বাঁধানো লাঠির আঘাত বর্ষণ করিতে লাগিল। আঘাত ঠেকাইবার জন্য একজন সত্যাগ্রহীও হাত তুলিল না; কেবল কাৎ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। অনেকে অজ্ঞান হইয়া গড়াইয়া পড়িল, অনেকে ফাটা মাথা ও ভাঙ্গা ঘাড় লইয়া ব্যথায় কাৎরাইতে লাগিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই আহত দেহগুলিতে স্থানটা ছাইয়া গেল। তাহাদের সাদা জামা-কাপড়ে রক্তের ছোপ ছড়াইয়া বড় হইয়া যাইতে লাগিল। আর একদল অক্ষতদেহ সত্যাগ্রহী সার না ভাঙ্গিয়া নীরবে ও দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনি পুলিশ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লাঠির আঘাতে তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিল।

'এই ভাবেই চলিতে লাগিল। একদল পড়িয়া যায়, আরেক দল অগ্রসর হয়। যদিও প্রত্যেকেই জানিতেন যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহাকে মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে হইবে, হয়ত মরিয়াই যাইতে হইবে, তবু আমি দ্বিধা বা ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। মাথা উঁচু করিয়া ধীরে ধীরে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। পুলিশ ছুটিয়া আসিয়া দ্বিতীয় দলকে কায়দামত সমানে ঠেঙাইয়া গেল। না হইল লড়াই, না কোনও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ; কোনও আর্তনাদ নাই পড়িয়া যাওয়ার পর শুধুই গোঙানি শোনা যাইতে লাগিল।

'কিছুকাল পরে সত্যাগ্রহীরা প্রতিরোধের ধারা বদলাইল। ২৫ জন সত্যাগ্রহী অগ্রসর হইয়া মারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালাইয়া গেল। তিন-চারটি করিয়া দেহ উল্‌টাইয়া পড়িতে লাগিল; তাহাদের মাথার খুলি ফাটিয়া তাহা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। এইরূপে দলের পর দল অগ্রসর হইয়া বসিয়া রহিল এবং বসিয়া বসিয়া মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল। তবুও মার ঠেকাইবার জন্য হাত তুলিল না। অবশেষে এই অপ্রতিরোধ দেখিয়া পুলিশ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল; বর্বরের মত তাহারা উপবিষ্ট লোকদের পেটে ও অণ্ডকোষে লাথি মারিতে লাগিল। আহত লোকগুলি বেদনায় কাৎরাইতে ও করুণ শব্দ করিতে লাগিল। ইহাতে পুলিশ যেন ক্ষেপিয়া গেল, আর জনতা আর নেতাদের নিকট হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পুলিশ তখন উপবিষ্ট লোকদের হাতে বা পায়ে ধরিয়া টানিয়া কখনো ১০০ গজ দূরে লইয়া খাদের মধ্যে ফেলিতে লাগিল। যে-খাদের পাশে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, একটি লোককে টানিয়া আনিয়া সেই খাদে ফেলিয়া দিল। তাহাতে কাদা-জল ছিটিয়া উঠিয়া আমাকে একেবারে স্নান করাইয়া দিল। আরেকটি পুলিশ একটি গান্ধীর লোককে খাদে টানিয়া আনিয়া তাহাতে ফেলিয়া দিল, তারপর তাহার মাথায় লাঠি মারল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্ট্রেচার-বাহকেরা ভূপাতিত, রক্তাক্ত দেহগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।'

এই স্থানে সরোজিনী নাইডু ও মণিলাল গান্ধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ৩০শে জুন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। জওহরলালজীকে পূর্বেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

নেতৃগণের অনুপস্থিতিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বেগ কমিল না, বরং প্রবলতর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র দহন, মদের দোকানে পিকেটিং, ব্রিটিশ পণ্য ও ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক বর্জন ইত্যাদি চলিল। এই সকল দমন করিবার জন্য সরকার কঠোর অর্ডিনান্স সকল জারি করিতে লাগিল। সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া হাজার হাজার লোক কারাবরণ করিতে লাগিল। জেলখানাগুলি সত্যাগ্রহীতে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের স্থান করিবার জন্য অনেক স্থলে জেলের কয়েদীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল।

এই আন্দোলনে রমণীগণ অতি সন্তোষজনক সাড়া দিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহীদিগের মধ্যে নারীগণের সংখ্যাধিক্য সকলকেই আনন্দিত ও বিস্মিত করিয়াছিল। জওহরলালজীর বৃদ্ধা জননী এবং মণিলাল গান্ধীর জননী কস্তুরবা গান্ধীও পিকেটিংএ নামিয়াছিলেন। গান্ধীযুগের বহু পূর্বে বাংলার কবি গাহিয়াছিলেন—

'না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা।'

এতকাল পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ভারতবাসী ভারত-ললনার সত্যিকার জাগরণ প্রত্যক্ষ করিল।

এখানে যখন সত্যাগ্রহ পুরাদমে চলিতেছিল তখন বিলাতে ব্রিটিশ সরকার একটি গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহ্বান করেন। কংগ্রেস উহাতে যোগদানে অস্বীকার করে। সাপ্রু, শাস্ত্রী, জয়কার, জিন্না, আম্বেদকার, মুঞ্জে প্রভৃতি অ-কংগ্রেসী নেতারা ভারত সরকারের মনোনয়নে উহাতে যোগদান করেন। দশ সপ্তাহ ধরিয়া এই সাম্প্রদায়িক নেতারা সাইমন কমিশনের সাম্প্রদায়িক রিপোর্ট আলোচনা করেন, কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। এই রাম-ছাড়া রামায়ণ-কীর্তন শেষ হইলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস যদি অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক একটি সুমীমাংসার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সহযোগিতা করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

বড় লাট লর্ড আরুইনও উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়াই মনে হয় ৯ই জানুয়ারি

(১৯৩১) এক বিবৃতিতে তিনি বলিলেন—

'However mistaken any man think him to be, and however deplorable may appear the results of the policy associated with his name, no one can fail to recognise the spiritual force which impels Gandhi to count that no sacrifice is too great in the cause, as he believes, of India that he loves.'

—'গান্ধীকে কেহ ভ্রান্ত মনে করিতে পারেন, তাঁহার অনুসৃত নীতির ফলে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে কেহ মনে করিতে পারেন, কিন্তু যে মহদ্ভাবের অনুপ্রেরণায় তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য যে-কোনওরূপ ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ গান্ধী অত্যধিক মনে করেন না, সেই আত্মিক শক্তির গুরুত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

ইহার এক সপ্তাহ পরে ২৫শে জানুয়ারি লর্ড আরুইন ঘোষণা করেন যে, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং কংগ্রেস কমিটির উপর যে-সকল বাধা-নিষেধ আছে সে সমস্ত প্রত্যাহার করা হইবে। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে যাহাতে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, আশা করি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষও অনুরূপ মনোভাব লইয়াই যাহাতে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে যত্নপর হইবেন।

শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি অর্থ সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরতি (Truce)। কী সর্তে তাহা হইতে পারে সে সম্বন্ধে গান্ধীজী আলাপ-আলোচনা এক্ষণে আরম্ভ হইল। ১৫ দিনে ৮ বার সাক্ষাৎকার এবং মধ্যে মধ্যে পত্র-বিনিময়ও চলিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি-চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

'At noon on March 5, a truce was signed by Irwin and Gandhi at Viceroy's House. Lord Irwin suggested that they should drink each other's health in tea. Gandhi agreed but said that his own part of the toast should be with water, lemon and a pinch of salt only. They joked freely and shared in merriment over Churchill's lurid accounts of "half-naked fakir.' —D. G. Tendulkar's 'Mahatma'

এই চুক্তিপত্রখানি অতি বিস্তৃত। উহার স্থূল কথা হইল এই যে, কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিবেন এবং উহার আনুষঙ্গিক পিকেটিং প্রভৃতিও বন্ধ করিবেন,

অপরপক্ষে গভর্ণমেন্টও সত্যাগ্রহ দমন করিবার জন্য যে সকল বিধি-নিষেধ জারি করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিবেন এবং ধৃত ও দণ্ডপ্রাপ্ত সত্যাগ্রহীদিগেকে মুক্তি দিবেন। লবণ আইন রদ করা এখন সম্ভবপর হইবে না, তবে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে লোকে নিজেদের ব্যবহারার্থে লবণ তৈরি করিতে পারিবে এবং ঐ স্থানে বিক্রয়ও করিতে পারিবে। কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিলে বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইবে।

করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সকলের মনঃপুত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর এইরূপ আপোষ-মীমাংসা করা কি সমীচীন হইয়াছে? বিলাতে যাইয়া গোলটেবিল বৈঠকে কি পূর্ণ স্বরাজের দাবি চলিবে? মহাত্মাজী এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন তাহা চলিবে, আমি সেই দাবিই উপস্থিত করিব, করিতে বাধ্য—'I should feel bound to press for Purna Swaraj at the conference and we should deny our very existence if we did not press for it.'

কথা হইতেছে এই যে, যাহাকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Dominion Status) বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ-স্বরাজ বা স্বাধীনতাই, কারণ ব্রিটিশ রাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা ডোমিনিয়নগুলির ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করিলেই তাহারা আনুগত্য অস্বীকার করিতে পারে। The Statute of Westminister দ্বারা এই স্বত্ব তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ স্বত্বই ভারতবর্ষকে ব্রিটিশেরা দিতে নারাজ ছিল, এবং পরিশেষে পূর্ণ Dominion Status দিয়াছে। পরে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া সাধারণতন্ত্র (Republic) ঘোষণা করিয়াছে (১৯৫০)। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব প্রসঙ্গে বক্তৃতাকালে জওহরলালজী এইরূপ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন (২০১ পৃঃ দ্রঃ)। ইহার পর রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তাবে এ কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয় যে, কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতাই দাবী করে, কোনও নিম্নতর অধিকার চাহে না। ('nothing short of complete independence')।

ইহার পর মহাত্মাজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে যাহা ঘটিবে তাহা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ পূর্বেই অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষই ভারতের অশেষ দুর্দশার কারণ। হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ-বহ্নি পূর্বাবধিই প্রধূমিত হইতেছিল, ইংরেজ শাসকগণের ভেদ-নীতি উহাতে সততই ইন্ধন যোগাইত। তাহারা আবার পরস্পরবিবদমান নব নব দলেরও সৃষ্টি করিতে

ত্রুটি করেন নাই। তপশিলী জাতি (Scheduled Castes) এইরূপ একটি নূতন সৃষ্টি। ডাঃ আম্বেদকার উহাদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, তাঁহাকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উহাদিগের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, যদিও মহাত্মা গান্ধী একাধিক বার উহাদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজগণ ইংরেজের দাসত্ব মাথায় লইয়া প্রজাদের উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিতেছিলেন, প্রজাসাধারণের পক্ষাবলম্বন করাতে কংগ্রেস হইয়াছিল তাহাদের চক্ষুশূল। ইহারা সকলেই ব্রিটিশরাজের দাসত্বও স্পৃহণীয় মনে করিতেন, কিন্তু কংগ্রেস-রাজের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠিতেন। ব্রিটিশ কূটনীতি এই সকল দলকে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কংগ্রেস-বিরোধী একটা সংখ্যালঘু জোট গঠন করিয়াছিল। ইহারা স্বীয় স্বীয় সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া ও পৃথক কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদও লাভ করিয়াছিলেন। জাতীয়তার মূলে জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, যুক্ত-নির্বাচন; পৃথক নির্বাচনে উহার মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করা হয়। যিনি জাতির জনক জাতি-গঠনে, জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত, তিনি পৃথব নির্বাচন স্বীকার করিবেন কীরূপে?

'যে তরণী একমাত্র পারের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?' —রবীন্দ্রনাথ

তিনি শেষ বৈঠকে বলিয়া আসিলেন— 'The Congress will wander, no matter how many years, in the wilderness, rather than lend itself to a proposal under which the hardy tree of freedom and responsible Government can never grow. ....As far as I am concerned, we have come to the parting of the ways.'

—বরং যত বৎসর হউক না কেন কংগ্রেস অরণ্যেরোদন করিতে থাকিবে, কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহাতে কখনও স্বাধীনতার বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। আমরা এখন আমাদের পথ দেখিব।

এদিকে গান্ধীজীর বিলাতে অনুপস্থিত-কালে দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধবিরতি চুক্তিটা ছিল পূর্বাবধিই একতরফা। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা উহা গ্রাহ্য করিতেন না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশে বিশেষ কড়া শাসন চলিতেছিল। পেশোওয়ারে সরকার একটি দরবার ঘোষণা করিয়া আবদুল গফুর খাঁকে আহ্বান করে। তিনি উহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করিলেন। অমনি সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। এলাহাবাদে জওহরলালজীর গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার এক নোটিশ জারি করিল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে

লিখিলেন—'আমি কোনও রাজকর্মচারী হইতে আদেশ গ্রহণ করিতে রাজি নই।' (I do not propose to take orders from any other). পরেই তাঁহাকে বোম্বাইর পথে গ্রেপ্তার করা হইল।

গান্ধীজী দেশে ফিরিয়া এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন। তিনি বলিলেন—'Even if there is a single ray of hope I will preserve and not abandon negotiations. But if I don't succeed, I will invite you to join me in the struggle which will be fight to a finish. In the last fight the people had to face lathis, but this time they would have to face bullets. I would not flinch from scarificing even a million lives for India's liberty. I told this to the English people in England.'

—'যদি কিছুমাত্রও আশা পাই, তবে আমি আপোষ-আলোচনার পথেই মীমাংসার চেষ্টা করিব। তাহাতে কৃতকার্য না হইলে আমার সহিত সংগ্রামে যোগ দিতে দেশবাসিগণকে আহ্বান করিতেছি। এবার যুদ্ধে যাহা হয় একটা চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। গতবার আমাদিগকে পুলিশের লাঠির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবার বন্দুকের গুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য দশ লক্ষ লোকের জীবন আহুতি দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। একথা আমি ইংলণ্ডের লোকদিগকে বলিয়া আসিয়াছি।'

ইহার পর লাট সাহেবের সহিত গান্ধীজীর দুই তিন বার পত্রালাপ হয়। ৩রা জানুয়ারি (১৯৩২) তিনি লাট সাহেবের নিকট শেষ পত্র দেন, ৪ঠা তারিখে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি দেশবাসীকে এই বাণী দিয়া গেলেন—

'Infinite is God's mercy. Never swerve from truth and non-violence; never turn your back and sacrifice your lives and all to win Swaraj.'

ভগবানের অপার করুণা। কখনও সত্য ও অহিংসা হইতে বিচ্যুত হইও না, কখনও পৃষ্ঠভঙ্গ দিও না। স্বরাজ অর্জনের জন্য জীবন ও যথাসর্বস্ব বিসর্জন দাও।

যে দিন পত্রালাপ বন্ধ হইল ঐ দিনই সরদার প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করিয়া যারবেদা জেলে পাঠান হইল। সেই দিনই জওহরলালজীর বিচার হইল এবং তাঁহার জন্য দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। সরদার প্যাটেলের স্থলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হইলেন, ৫ তারিখে তাঁহাকে এবং ৮ তারিখে তাঁহার স্থলবর্তী ডাঃ আনসারীকে গ্রেপ্তার করা হইল। ১০ই জানুয়ারির মধ্যেই সমস্ত কংগ্রেস নেতা

কারাবদ্ধ হন। ১৩টা অর্ডিনান্স জারি করা হয়। কংগ্রেস, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রভৃতি সমস্ত বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কেবল তাহাই নয়, কিষাণ-সভা, যুবসঙ্ঘ, ছাত্রসঙ্ঘ, জাতীয় স্কুল-কলেজ, কংগ্রেস হসপিটাল, স্বদেশী দোকান, লাইব্রেরি প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। কংগ্রেস সত্যাগ্রহীদের বিশেষ ভাবে নির্যাতন করা হইতেছিল। পুলিশের বড় কর্তার গুপ্ত সার্কুলারের বলে ('to treat grimly') বেত্রাঘাত প্রভৃতি নির্মম অত্যাচারও চলিতেছিল। বিলাতে ভারতের ভাগ্যবিধাতা স্যার স্যামুয়েল হোর, ভারত সরকারের বড় কর্তা লর্ড ওয়েলিংডন, উভয়েই জবরদস্ত লোক, কংগ্রেসকে একেবারে শেষ করিতে বদ্ধপরিকর। হোর মহোদয় শাসাইতে লাগিলেন—এবার যুদ্ধটা একেবারে চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িব— 'There will be no drawn battle this time.' ইনি আর একবার দর্পভরে বলিয়াছিলেন—'কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু যাত্রীর বহর স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়'—The dogs bark but the caravan goes on.'

কিন্তু এ সকল নির্যাতন সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ পুরাদমে চলিতে লাগিল। ১৮ মাসে এক লক্ষ লোক জেলে গেল। আইন অমান্য করিয়া সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা ইত্যাদি করাতে সর্বত্রই পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। এলাহাবাদে জওহরলালজীর জননী পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিটুনি পুলিশ, পাইকারী জরিমানা, সান্ধ্য-আইন ইত্যাদি ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল।

কিছুদিন পরেই আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীব সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহাতে তপশিলী সম্প্রদায়েরও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—হরিজনদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাটাই আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্মাঘাত করিয়াছে। উহাতে জাতির বুকে, হিন্দু সমাজের বুকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে। উহাতে অস্পৃশ্যতার কায়েমি করা হইয়াছে। ইহা অসহ্য। আমি আমরণ অনশন-ব্রত গ্রহণ করিব—'I will fast unto death'.

যে কথা, সে-ই কার্য, ২০শে সেপ্টেম্বর অনশন আরম্ভ হইল। উহার পূর্বদিন গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের (গুরুদেব) আশীর্বাদ চাহিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু উহা প্রেরণের পূর্বেই কবিগুরুর একখানি টেলিগ্রাম আসিল। তিনি লিখিয়াছেন— 'It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love'—ভারতের

জাতীয় একতার জন্য, সামাজিক সংহতির জন্য মূল্যবান জীবন দান সার্থক দান। আমাদের ব্যথিত হৃদয় প্রেমভক্তির অর্ঘ্য লইয়া আপনার পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত অনুধ্যান করিতেছে।

ঐ দিবস লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রার্থনা ও উপবাসে কাটাইল। হিন্দু নেতারা সমবেত হইয়া কীরূপে গান্ধীজীর জীবন রক্ষা হইতে পারে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় লাগিলেন। অনুন্নত শ্রেণীর নেতারাও উহাতে যোগ দিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ আম্বেদকারও ছিলেন। তিনিই যুক্ত-নির্বাচনের ঘোর বিরোধী এবং পৃথব নির্বাচনের পক্ষপাতী। তাঁহার মত না হইলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। অনেক আলাপ-আলোচনার পর তাঁহার সহিত একটা রফা হইল, কিছু পরিবর্তিত ভাবে যুক্ত-নির্বাচনই রহিল, তবে হরিজনদের মোট সদস্য সংখ্যা অনেক বর্ধিত করা হইল, পূর্বে ছিল ৭১, এখন হইল ১৪৭। এই ব্যবস্থায় গান্ধীজী স্বীকৃত হইলেন।

অনশন আরম্ভের পাঁচ দিন পর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া যারবেদা জেলে উপস্থিত। তখনই অনশন ভঙ্গ হইল। তিনি গীতাঞ্জলির একটি গান নিজেই গাহিলেন। তারপর মহাত্মাজীর প্রিয় সঙ্গীত 'বৈষ্ণবজন' সমস্বরে গীত হইল। তারপর মহাত্মাজী এক গ্লাস কমলালেবুর রস পান করিলেন।

ইহার পর তিনি অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও হরিজন-সেবায়ই বিশেষ ভাবে মন দেন। কিন্তু জেলে থাকিয়া এ কার্য ভালরূপ চলিতেছিল না। ওদিকে সনাতনী দলও ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে ব্যথিত হইয়া গান্ধীজী বলিলেন—হিন্দু সমাজের এই সুকঠিন ব্যাধির প্রতিকারের অন্য উপায় নাই, ইহার একমাত্র উপায় প্রায়শ্চিত্ত—অনশন ও প্রার্থনা, আমি তাহাই করিব। ....এ বিষয়ে আমি আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছি।

আবার ২১ দিনের অনশন ব্রত আরম্ভ হইল। তখন গভর্নমেন্ট আদেশ দিলেন—'যে উদ্দেশ্যে গান্ধী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল।'

২১ দিন পরে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করিলেন। কিছু সুস্থ হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী কীরূপ হইবে তাহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ (mass civil disobedience) আর সম্ভবপর ছিল না। পরিচালনা করিবার নেতাও অধিক ছিল না। সাব্যস্ত হইল, যাহারা এক্ষণে জেলের বাহিরে আছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগতভাবে নিজের

দায়িত্বে সত্যাগ্রহ করিতে পারেন এবং সর্বসাধারণকে ব্যক্তিগত অহিংস প্রতিরোধের আদর্শ (individual civil disobedience) শিক্ষা দিতে পারেন।

গান্ধীজী বলিলেন—'আমারই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি, আমিই ইহা প্রথমে আরম্ভ করিব।' তিনি আশ্রমের ৩৩ জন সহকর্মীসহ গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রচারকার্য করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে পুলিশ দলবলসহ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইল। তিন দিন পরে আবার মুক্তি দিয়া তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারি করা হইল। তিনি জানাইলেন, আমি কোনও নিয়ন্ত্রণ-আদেশ মান্য করিতে পারিব না। তখন সরকার তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিল এবং বিচার করিয়া এক বৎসরের কারাদণ্ড বিধান করিল।

পূর্বে জেলে আবদ্ধ থাকা কালে তিনি হরিজন পত্রিকা রীতিমত প্রকাশের বিধি-ব্যবস্থা, তৎসম্পর্কে চিঠিপত্র লেখা এবং পত্রিকা সম্পাদক প্রভৃতির সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারিতেন। এখন সরকার সেই সকল সুযোগ-সুবিধা অনেকটা সঙ্কুচিত করিলেন। গান্ধীজী ইহাতে অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ চিঠি দিলেন—হরিজন-কার্য করিতে না পারাতে আমার যে কষ্ট হইয়াছে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, জীবনে আর আমার স্পৃহা নাই, আমি আহার ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। — 'The strain of deprivation of Harijan work is becoming unbearable. I must deny myself all nourishment save salt and water. Life ceases to interest me, if I may not do Harijan work, without let or hindrance.' ইহার উত্তরে সরকার জানাইল—যদি গান্ধী সম্পূর্ণরূপে হরিজন-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং সত্যাগ্রহ পরিচালনা ত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে। গান্ধীজী সর্তাধীন মুক্তি অস্বীকার করিলেন।

এদিকে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল। তাঁহাকে হাসপাতালে নেওয়া হইল। ডাক্তারগণ বলিলেন, অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। তখন অকস্মাৎ তাঁহার মুক্তির আদেশ আসিল।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত মুক্তিলাভে গান্ধীজী বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—এ মুক্তিতে আমাকে আনন্দ দেয় নাই, লজ্জা দিয়াছে। যে সহকর্মীগণকে সঙ্গে লইয়া জেলে গেলাম, তাহাদিগকে ফেলিয়া উপবাস করিয়া বাহিরে আসিলাম। এক্ষণে আমি কী করিব? যে পর্যন্ত আমার কারাদণ্ডের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম না হয়, সে পর্যন্ত আমি আপনাকে কারাবদ্ধই মনে করিব, সত্যাগ্রহ

পরিচালনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিব। তবে হরিজন সেবাই আমার অন্তরের কাম্য বস্তু, উহাই আমার শ্বাসবায়ু, আহার্য অপেক্ষাও মূল্যবান, আমি উহাই করিব। —Harijan service will be always after my heart, and will be the breath of life for me, more precious than the daily bread.

ইহার পর গান্ধীজী একান্তভাবে হরিজন-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। চারি বৎসর (১৯৩৪-৩৮) গান্ধীজী একনিষ্ঠভাবে গঠনমূলক কার্যে রত ছিলেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হরিজন সেবা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি কার্যে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার-কার্য করিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা, মাদকতা, খাদি প্রচলন, বুনিয়াদি শিক্ষা, কুটীর-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধসমূহ এই সময় 'হরিজন' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হইত। এই সময় তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ইচ্ছা করিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রিটিশ সরকার ভারতেও সৈন্য-সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। অহিংসা মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক গান্ধী ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। তিনি কেবল ভারতবাসীকে নয়, ইংরেজ, জার্মান প্রভৃতি যুদ্ধোন্মত্ত জাতিসমূহকে লক্ষ্য করিয়াও পত্র-প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেছিলেন।

এদিকে রামগড় কংগ্রেসেও যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হইল—The Congress and those under the Congress influence cannot help in the prosecution of the war with men, money and material.

গান্ধীজী প্রস্তাব করিলেন, এবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ (individual civil disobedience) অবলম্বন করা হইবে। কংগ্রেস নেতা ও পরীক্ষিত কংগ্রেস কর্মীদের মধ্য হইতে বাছাইকরা সত্যাগ্রহীদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া রাখা হইবে। নেতাগণের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক সত্যাগ্রহী গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য করিবে। প্রচার-বাণী এই—

ইংরেজদের যুদ্ধে সৈন্য বা অর্থ দ্বারা সাহায্য করা অন্যায়। অহিংসভাবে সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধিতা করাই একমাত্র শ্রেয় কর্ম। ('It is wrong to help the British war effort with men or money. The only worthy effort is to resist all war with non-violent resistance.')

এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী নিযুক্ত হন আচার্য বিনোবা ভাবে। তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার কার্য আরম্ভ করেন (অক্টোবর, ১৭, ১৯৪০)। তাঁহাকে ২১শে অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন মাসের জন্য জেলে দেওয়া হয়। তাঁহার পরবর্তী সত্যাগ্রহী নিযুক্ত হইয়াছিলেন জওহরলালজী,

ওয়ার্ধা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং ৪ বৎসরের জন্য জেলে দেয়। ইহার পর কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন নেতারা সকলেই ক্রমে ক্রমে রাস্তায় বাহির হইয়া যুদ্ধবিরোধী প্রচারবাণী আবৃত্তি করিয়া কারাবরণ করিতে থাকেন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১১জন সদস্য, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ১৭৬ জন সদস্য, ২৯ জন পূর্বতন মন্ত্রী এবং ৪০০ শতেরও অধিক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য কারাবরণ করেন। ১লা জানুয়ারি (১৯৪১) মৌলানা আজাদ গ্রেপ্তার হন। তাঁহার ১৮ মাস কারাদণ্ড হয়।

জানুয়ারি পর্যন্ত ২২৫০ জন সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড হয়। এপ্রিল মাস হইতে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদিগকেও তালিকাভুক্ত করা হয়। তখন সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ২০,০০০ হাজার হইয়া উঠে।

বৎসরের শেষ দিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশ সঙ্কটজনক হইতে থাকে, এশিয়াতে জাপানের যুদ্ধ-প্রবেশও আসন্ন হইয়া উঠে। তখন ভারত-সরকার হঠাৎ সমস্ত সত্যাগ্রহীকে মুক্তিদান করে এবং কিছু আশার বাণীও শুনায়।

পরদিনই পার্ল হারবারের ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। জাপানী সৈন্যবাহিনী ঝটিকাবেগে অগ্রসর হইয়া সমগ্র সুদূরপ্রাচ্যভূমি ওলট-পালট করিয়া ফেলিতে থাকে। রেঙ্গুনের পতন ঘটিলে (৭ই মার্চ, ১৯৪২) যুদ্ধ একেবারে ভারত সীমান্তে আসিয়া পড়ে।

সিঙ্গাপুরে সর্ববৃহৎ ব্রিটিশ ক্রুইজারটির সলিল-সমাধি, ব্রিটিশ বাহিনীর দুর্গতি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমগ্র ব্রিটিশ অধিকারের নাভিশ্বাস, ভারতে বিদ্রোহী কংগ্রেসের যুদ্ধ-বিরোধী ডাক, বহির্ভারতে সুভাষ বাহিনীর 'দিল্লী চলো' হাঁক;—এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক এক বার্তা লইয়া আসিলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ (Cripps' Mission)।

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ যে বার্তা আনিলেন তাহার মর্ম এই—

১। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা (Dominion Status) দিতে প্রস্তুত আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সম্পর্ক ত্যাগ করিতেও পারিবে।

২। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Indian Union) গঠিত হইবে। তবে, কোনও প্রদেশ বা কোনও দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করিলে উক্ত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান নাও করিতে পারে, তাহাদের জন্য অনুরূপ পৃথক ব্যবস্থা হইবে।

৩। বর্তমানে যুদ্ধ-বিরতি না হওয়া পর্যন্ত দেশরক্ষার ভার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে।

৪। যুদ্ধ-বিরতির পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত ভারতবর্ষের এ বিষয়ে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবে।

তিনি কংগ্রেসের এবং বিভিন্ন দলের নেতাদিগের সহিত পৃথকভাবে আলাপ-আলোচনা করিলেন, কিন্তু কেহই এই পরিকল্পনায় সন্তোশ প্রকাশ করিলেন না। কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান কারণ ঃ (১) ইহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের নয় কোটি প্রজাবৃন্দের কোনও স্বত্ব-স্বামিত্বই স্বীকৃত হয় নাই; (২) ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান প্রদেশসমূহের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বেচ্ছাধীন করিয়া ভারতীয় জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে; (৩) ইহাতে ভবিষ্যতে স্বাধীনতার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্তমান পরাধীন ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে যোগদানে কোনও উদ্যম-উৎসাহ থাকিতে পারে না।

গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—It is a post-dated cheque.

কংগ্রেস এক্ষণে কোন্ পথে যাইবে? এই সময় একজন আমেরিকান সাংবাদিকের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে আলাপ হইয়াছিল তাহাতেই উহা বুঝা যাইবে—

সাংবাদিক— আপনি এক্ষণে কি একটা নূতন পথ ধরিবেন সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সে পরিকল্পনাটি কী তাহা জানিতে পারি কি?

গান্ধী— সে প্রস্তাবটি এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আজই শেষ করিতে হইবে। আপনি কি চমকিয়া উঠিলেন? (The British Government in India should end to day. Are you startled?)

সাংবাদিক—না, আপনি তো এতদিন যাবৎ ইহাই চাহিতেছেন এবং এই জন্যই খাটিতেছেন।

গান্ধী—তা ঠিক। কিন্তু এখন একটা চূড়ান্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আমি অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাহিতেছি—জগতের শান্তির জন্য, চীনের জন্য, রাশিয়ার জন্য, মিত্রপক্ষের মঙ্গলের জন্য। ....এ সম্বন্ধে বিস্তারিত হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছি, তাহা দেখিবেন।

কিছুদিন পরেই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন যাহা 'ভারত ছাড় প্রস্তাব' (Quit India Resolution) বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'The events happening from day to day, and the experience that the people of India are passing through, confirm the opinion of Congressmen that British rule in India must end immediately, not merely because foreign domination, even at its best, is an evil in itself and a continuing injury to the subject people, but because India in bondage can play no effective part in defending herself and affecting the fortunes of the war that is desolating humanity. The freedom of India is thus necessary not only in the interest of India, but also for the safety of the world and for the ending of Nazism, fascism, militarism and other forms of imperialism, and the aggression of one nation over another.

Should, however, this appeal fail, the Congress will then be reluctantly compelled to utilize all the non-violent strength it might have gathered since 1920, when it adopted non-violence as part of its policy for the vindication of the political rights and liberty. Such a widespread struggle would inevitably be under the leadership of Mahatma Gandhi.'

—'ভারতবাসিগণ যে অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে এবং দিন দিন যে ঘটনা-পরম্পরার সম্মুখীন হইতেছে, তাহা দেখিয়া কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের অবিলম্বে অবসান হওয়া উচিত। পরাধীনতা সকল অবস্থায়ই অশুভকর; কেবল এই কারণেই নয়, পরাধীন ভারত আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং জগতে যে সর্বনাশা ধ্বংসলীলা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ, এই কারণেও অবিলম্বে বিদেশীয় শাসনের অবসান আবশ্যক। ভারতের স্বাধীনতা কেবল ভারতের স্বার্থের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, নাজিবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্যও উহা আবশ্যক।

....কংগ্রেসের এই প্রস্তাব যদি নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে ১৯২০ সন হইতে এ পর্যন্ত কংগ্রেস যে অহিংস-প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করিয়াছে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবে। অবশ্য এরূপ ব্যাপক সঙ্ঘর্ষ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইবে।'

এই প্রস্তাব সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক সমর্থিত হইলে কার্যকরী হইবে।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পর কংগ্রেস নেতৃগণ যে সকলেই গ্রেপ্তার ও শৃঙ্খলিত হইবেন তাহা সুনিশ্চিত ছিল। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বহীন সত্যাগ্রহ সংগ্রাম

কীরূপে চলিবে সে বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশসহ প্রচার-পত্র গান্ধীজী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। উহাতে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, আইন অমান্য, অসহযোগ প্রভৃতি নানা বিষয় ছিল।

৭ই আগস্ট সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C.) এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ৮ই আগস্ট ভারত-সরকার ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টকে শক্তি-পরীক্ষায় আহ্বান করা হইয়াছে। ইহার একমাত্র উত্তরই আছে (To a challenge, such as the present, there can be only one answer)। ৯ই আগস্ট প্রাতে পুলিশ কমিশনার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। স্টেশনে একটি স্পেশাল ট্রেন দাঁড়ানো ছিল, তাহাতে কংগ্রেস-কমিটির সমস্ত সদস্য ও অন্যান্য কংগ্রেসীদিগকে রাখা হইয়াছিল। গান্ধীজীকে বিড়লাভবনে লইয়া গেল, অন্যান্যের গন্তব্যস্থান জানা গেল না। মহাত্মাজী দেশবাসীকে এই শেষ আদেশ দিয়া গেলেন—

Let every non-violent soldier of freedom write out the slogan 'Do or Die' on a piece of paper or cloth and stick it on his clothes—স্বাধীনতা-সংগ্রামের অহিংসা-ব্রতী প্রত্যেক সেনানী তাহার গাত্রাবরণে এই কথাটি লিখিয়া রাখিবে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

সর্বত্রই কংগ্রেস নেতৃগণের ধর-পাকড় আরম্ভ হইল। ফলে, উন্মত্ত জনতার সহিত পুলিশের প্রবল সংঘর্ষ চলিতে লাগিল, স্থলে স্থলে রেল লাইন, টেলিগ্রাম লাইন প্রভৃতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

আগা খাঁ প্রাসাদে আবদ্ধ থাকাকালে গান্ধীজী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে জানান, অবস্থা ভালই (৩০ এপ্রিল, ১৯৪০)। কিন্তু তিন দিন পরে প্রকাশ করা হয় যে, তাঁহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে, রক্তের চাপ কমিতেছে, চিন্তার কারণ হইয়াছে। পরদিন জেলের বড় কর্তা আসিয়া গান্ধীজীকে বলিলেন—আপনি ও আপনার সঙ্গীরা সকলেই বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। (৫ই মে, ১৯৪৪)।

এই সময় বহির্ভারতে দুইটি অভাবনীয় ঘটনার সংঘটন হয়। একটি আমেরিকার আবিস্কৃত আণবিক বোমার বিস্ফোরণে জাপানে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা; ইহার ফলে বিশ্বযুদ্ধের আশু পরিসমাপ্তি ঘটিল। আর একটি, বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে জবরদস্ত চার্চিল-আমেরী দলের শোচনীয় পরাজয় এবং শ্রমিক সরকারের প্রতিষ্ঠা। ইহার ফলে গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের সফল পরিণতির সূচনা দেখা দিল। অনতিবিলম্বেই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে তিন জন সদস্য ভারতে আসিলেন (Cabinet Mis-

sion)। কীরূপে শান্তিপূর্ণভাবে এবং বিভিন্ন দলের সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাইবে এবং ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবে তাহা নির্ধারণ করা হইল এই ক্যাবিনেট মিশনের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বিভিন্ন দলের নেতৃগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। মুসলিম লীগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা প্রভৃতি সহ ভারতের এক বৃহৎ অংশ লইয়া পাকিস্তানের দাবি করিয়া বসিলেন। গান্ধীজী পূর্বাবধিই উহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ক্যাবিনেট মিশনও উহার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিলেন এবং এক বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। লীগ-নেতার তাহা মনঃপূত হইল না। লীগের সঙ্গে একটা রফা না হইলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে রাজি নন। এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া অবশেষে গান্ধীজী, পাঞ্জাব ও বাংলা দ্বিখণ্ডিত করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টি করিতে রাজি হইলেন। যিনি এতদিন বলিতেছিলেন ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা মহাপাপ ('Vivisection of India is a sin'), যিনি একদিন মুসলিমদিগকে বলিয়াছিলেন—'আগে আমাকে খণ্ড খণ্ড কর, পরে ভারত দ্বিখণ্ডিত করিও' ('First vivisect me, then vivisect India'), তিনিই এখন অবস্থার চাপে উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। ভাগ্য-বিধাতার এমনই প্রভাব। কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দু 'জাতি' এবং ভারতের মুসলিম 'জাতি', ইহারা স্বাধীন না পরাধীন হইল? দ্বিজাতি-তত্ত্ব বিচারে ইহাদের স্থান কোথায়? ভাগ্যবিধাতা উত্তর দিলেন—আশ্রয়প্রার্থীর শিবিরে।

স্বাধীন ভারতের জন্ম হইয়াছে। অস্ত্রবলে নয়, শত্রুরক্তে ধরাতল সিক্ত করিয়া নয়, আত্মিক শক্তির বলে। এই জাতির যিনি জনক তিনি নরঘাতক 'দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ' নন, তিনি সত্যসেবক, অহিংসার সাধক, বিশ্বপ্রেমিক, ভগবদ্ভক্ত তপস্বী। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার অনুসরণে, তাঁহার প্রেম-পবিত্রতার প্রভাবে ভারতবর্ষ দীর্ঘকালের পরাধীনতার হীনতা, দীনতা ও ভীরুতা হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে।

'কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সঙ্কোচে অভিভূত ছিল, কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য। সাময়িক যে সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে, কিন্তু এ তো বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর

ভ্রান্তি হয়েছে। কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছিল, এই যে অপরাজেয় সঙ্কল্প-শক্তি এ তাঁর সহজাত; কর্ণের সহজাত কবচের মতো—এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্য পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উৎঘাটিত হলো তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।'
—রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মাজীর স্বরাজ কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়। তাঁহার স্বপ্নের স্বরাজ্য ধর্মরাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্য (Independence of my dream means Ram Raj, that is the kingdom of God, on earth)। তিনি চাহিয়াছেন এমন রাজ্যগঠন যাহার প্রত্যেক ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ, অহিংসক, ধর্মশীল, স্বকর্মনিষ্ঠ, সর্বভূতে সমদর্শী, সর্বভূতহিতপরায়ণ হয়। ইহাকেই তিনি 'রামরাজ্য' বলিয়াছেন। ইহাতে চাই মানুষের নিম্নপ্রকৃতির সম্পূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া দিব্যজীবন লাভ, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, spiritual order of life, Life divine. ইহা কখনও বাস্তবে পরিণত হইবে কি না বলা যায় না। কিন্তু এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন পরিচালনা করিলে তাহা একেবারে নিষ্ফল হয় না, বরং জগতের অশেষ কল্যাণের কারণ হয়। যে সকল মহাপুরুষ এই মহান আদর্শ মানব সমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাঁহারা জগতের নমস্য। মহাত্মাজী তাঁহাদেরই একজন। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির উহাই লক্ষ্য।

বৈষ্ণব ভক্তোত্তম মহাত্মা

'বৈষ্ণবজন' শীর্ষক ভজনগানটি মহাত্মাজীর বড় প্রিয় ছিল। প্রার্থনাকালে প্রায়ই উহা তাঁহাকে শুনান হইত। অনশন আরম্ভকালে বা ত্যাগকালে, সত্যাগ্রহ আরম্ভকালে, এমন কী রাজাদেশে কারাগারে গমনকালেও উহা শ্রবণ করা তাঁহার নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতটিকে প্রকৃত বৈষ্ণব কে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। উহার অনুবাদ এইরূপ—

তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি পরের দুঃখ নিজের দুঃখ বলিয়া বোধ করেন, এবং যিনি সততই পরের সেবাকার্যে নিরত, যিনি অমানী, মানদ, যাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই, যাঁহার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম পবিত্র। যিনি স্ত্রীলোকমাত্রেই মাতৃজ্ঞানে ভক্তি

করেন, যিনি মিথ্যাভাষণে জিহ্বা কলুষিত করেন না, অন্যের ধন স্পর্শ করেন না, যিনি অনাসক্ত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-নির্মুক্ত, যাঁহার মুখে সদা রাম-নাম, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

এই যে বৈষ্ণব-চরিত্রচিত্রটি, যাহা তিনি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সতত রাখিতেন, ইহা যে তাঁহার স্বকীয় পবিত্র চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান প্রিয়ভক্তের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। —গীতা ১২।১৩

—যাহার কাহারও প্রতি কোনও দ্বেষের ভাব নাই, যিনি সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়াবান যিনি মমত্ববুদ্ধিশূন্য, যিনি অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, যিনি সদা সন্তুষ্ট, ক্ষমাশীল, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, দৃঢ়-নিশ্চয়, যাহার মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত এমন যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।

এস্থলে ভগবানের প্রিয় ভক্তের যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হইল এই সকল গুণেই তো মহাত্মার চরিত্র মহোজ্জ্বল হইয়াছে, সুতরাং তিনি যে ভগবানের প্রিয় ভক্ত তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেস্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ। —ভাঃ ১১।২।৫২

—যাঁহার আত্মপর ভেদ নাই, বিত্তাদিতে আমার এবং পরের বলিয়া ভেদজ্ঞান নাই, সর্বভূতে যাঁহার সমজ্ঞান, যাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন সংযত, তিনি ভক্তোত্তম।

ইহা অধ্যাত্ম-তত্ত্বের, প্রীতি-তত্ত্বের নীতিতত্ত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ। মহাত্মাজী যে এই আদর্শ-প্রতিমার অতি নিকটবর্তী সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

মহাত্মার বাণী

'আমার জীবনই আমার বাণী।'

সত্যাগ্রহ (সত্যে আগ্রহ) মানবমাত্রেরই জীবনধর্ম। অহিংস-প্রতিরোধ উহার একটি প্রকারভেদ মাত্র। সত্যই আমার ঈশ্বর। কেবলমাত্র অহিংসা-ব্রতের মধ্য

দিয়াই আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারি, অন্য পথ নাই। স্বদেশের স্বাধীনতা কী জগতের স্বাধীনতা, সত্যানুসন্ধানেরই অন্তর্গত। ইহকালে কিংবা পরকালে অন্য কোনও লাভের লোভে আমি উহা হইতে বিরত হইতে পারি না। এই সত্যান্বেষণেই আমি রাজনীতিকক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি।

—'Satyagraha of which civil resistance is but a part is to me the universal law of life. Truth is my God. I can only search Him through non-violence and in no other way. And the freedom of my country, and of the world, is surely included in the search for truth. I cannot suspend this search for anything in this world or another. I have entered the political life in pursuit of this search.'

* * *

এককালে এই ভারতভূমিকে স্বর্ণভূমি বলা হইত। তাহার কারণ ভারতবাসীরাই সোনার মত ছিল। ভূমি তো এখন তাহাই আছে, কেবল মানুষগুলি বদলাইয়া গিয়াছে। ইহাকে আবার স্বর্ণভূমি করিতে হইলে আমাদিগকেই সদ্‌গুণদ্বারা স্বর্ণ হইতে হইবে। এই স্বর্ণ করার পরশ পাথর দুইটি অক্ষরের মধ্যে আছে, উহা সত্য।

* * *

প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তনহীন, অপরিবর্তনীয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন বা ব্যাঘাত ঘটাইয়া কোনও অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে পারে না। কিন্তু আমরা অপূর্ণ জীবগণ সর্বপ্রকার বিষয়ই কল্পনা করি এবং আমাদের অপূর্ণতা ভগবানে আরোপ করি। আমরা ভগবানের অনুকরণ করিতে পারি, কিন্তু তিনি কখনও আমাদের অনুকরণ করেন না। আমরা যেন কালের দ্বারা খণ্ডিত করিয়া তাঁহাকে না দেখি। তাঁহার নিকট কাল অনন্ত। আমাদের কাছে কাল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎরূপে বিদ্যমান। একশত বৎসরের মনুষ্যজীবন অনন্তকালের কাছে একটি বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর।

* * *

আমার কাছে সত্যই শ্রেষ্ঠ নীতি। আরও অনেকগুলি নীতি ইহার অন্তর্গত। এই সত্য কেবল বাক্যের সততা নয়, চিন্তার সততাও—কেবল আমাদের ভাবলোকের আপেক্ষিক সত্য নয়, পরন্তু ইহা পরমসত্য, শাশ্বত নীতি অর্থাৎ ঈশ্বর। ভগবানের বহু সংজ্ঞা আছে, কারণ তিনি বহুভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই বহুবিচিত্র

অভিব্যক্তি আমাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া তোলে এবং মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য আমি অভিভূত হইয়া পড়ি।

* * *

আমি তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ক্রোধ সংবরণ করিবার চরম শিক্ষা লাভ করিয়াছি। যেমন উত্তাপকে সংরক্ষণ করিলে তাহা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ যদি ক্রোধ দমন করা যায়, তাহা হইলে তাহা এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, যাহা জগৎকে চালিত করিতে পারে।

* * *

আমার মত সত্যসন্ধানীর কাছে নীরবতা খুব সহায়ক। মৌন নিস্তব্ধতার মধ্যেই আত্মা আরও স্পষ্টতর আলোকে পথ দেখিতে পায় এবং যাহা ভ্রান্ত ও আপাত সত্য, তাহা এই আলোকের স্বচ্ছতার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। দুশ্চর সত্য সাধনা এবং পূর্ণ সত্য লাভের জন্য আত্মার পক্ষে অন্তর্লোকের নিস্তব্ধতা আবশ্যক।

* * *

আমি ভারতের সম্মুখে আত্মত্যাগের সুপ্রাচীন নীতি উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছি। কারণ সত্যাগ্রহ ও তাহা হইতে উদ্ভূত অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুঃখবরণ নীতিরই নূতন নাম। যে ঋষিগণ হিংসার মধ্যেও অহিংসার নীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিউটন অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহারা ওয়েলিংটন অপেক্ষা বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা নিজেরা অস্ত্রের ব্যবহার জানিয়াও তাঁহারা অস্ত্রশক্তির ব্যর্থতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরিশ্রান্ত পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, হিংসার ভিতর দিয়া নয়, অহিংসার ভিতর দিয়াই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

* * *

আমি নিজেকে কখনো সন্ন্যাসী বলিয়া প্রচার করি নাই। সন্ন্যাস আরও কঠিন ব্যাপার। আমি নিজেকে গৃহস্থ বলিয়া মনে করি। আমি দীন সেবকের জীবনযাপন করি এবং আমার সহকর্মীগণের সঙ্গে বন্ধুগণের দানের উপর জীবিকা নির্বাহ করি। যদি সরলতা ও স্বচ্ছন্দতা মানসিক ব্যাপার হয়, তাহা হইলে আমি যে জীবনযাপন করি, তাহা অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াও আমার যাহা প্রয়োজন তাহা পাই।

* * *

আমি 'ঋষির বেশে রাজনৈতিক' নই। কিন্তু সত্য পরম জ্ঞান বলিয়া সময় সময় আমার কার্যাবলী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমি আশা করি, সত্য ও অহিংসার নীতি ছাড়া আমার আর কোনও নীতি নাই। আমার দেশ ও ধর্মের মুক্তির জন্য আমি সত্য ও অহিংসা বিসর্জন দিব না। এ কথার অর্থ এই যে, দেশ ও ধর্মের মুক্তি ঐরূপে হইতে পারে না।

* * *

আমি এখনও যে তাঁহার (ভগবানের) নিকট হইতে দূরে আছি, ইহা আমার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। তিনি আমার নিঃশ্বাস পরিচালনা করেন, আমি তাঁহার সন্তান। আমি জানি, আমার অন্তরের পাপ আকাঙ্ক্ষাসমূহ আমাকে এ পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমি তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছি না।

* * *

আজ গীতা কেবল আমার বাইবেল ও কোরান নয়; ইহা তাহা অপেক্ষাও অধিক—ইহা আমার মাতা। এই পৃথিবীতে যে মাতা আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি বহু পূর্বেই হারাইয়াছি। কিন্তু আমার এই চিরন্তনী মাতা অতঃপর সর্বদা আমার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিয়াছেন।

* * *

মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জা—ভগবানের এই তিন গৃহকে আমি পৃথকভাবে দেখি না। ধর্মবিশ্বাসই তাহাদিগকে রূপদান করিয়াছে। যে কোনও ভাবেই হোক তাহারা মানুষের সেই চির-অগোচরের নিকট পৌঁছিবার আকুলতার পরিপ্রকাশ।

* * *

আমার ধর্ম আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, বিপদে পড়িলে এবং সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মানুষের উপবাস ও প্রার্থনা করা উচিত।

* * *

আমি একথা বলি না যে, 'দস্যু চোর ও যে সমস্ত জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে, তাহাদিগকে বাধা দিতে বা দমন করিবার ব্যাপারে হিংসা ত্যাগ

কর'। এই বাধা দিবার কাজ যাহাতে আমরা আরও ভালভাবে করিতে সক্ষম হই, সেজন্য আমাদিগকে নিজেকে সংযত করিতে শিক্ষা করা দরকার। সামান্য কারণে পিস্তল ধরা শক্তির পরিচায়ক নয়, তাহা দুর্বলতা। পরস্পর ঘুষাঘুষি হিংসার শিক্ষা নয়, ভীরুতারই শিক্ষা। আমার অহিংসনীতি কখনও শক্তিক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করিতে পারে না, পরন্তু যদি দেশ এই নীতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে একমাত্র অহিংসনীতির দ্বারাই বিপদের সময়ে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ সহিংস প্রতিরোধ সম্ভবপর।

*   *   *

মনের মধ্যে কোনও তিক্তভাব না লইয়া এবং একমাত্র আত্মাই অবিনশ্বর, আর কিছুই অবিনশ্বর নয়, এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া পার্থিব যে কোনও শক্তির কাছে জানু নত না করায় যে দৃঢ়-সঙ্কল্পিত অস্বীকৃতি, তাহা অপেক্ষা মহত্তর বীরত্ব আর নাই।

*   *   *

যাহারা শ্রম করে এবং লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোক প্রত্যহ পেট ভরিয়া আহার করিতে পারে না এবং একখণ্ড বাসি রুটি ও এক চিমটি লবণের সাহায্যে কোনও প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, আমি তাহাদের জন্যই স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছি।

এমন এক ভারত গড়ে তোলাই আমার সাধনা যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিও মনে করতে পারবে এ তারই স্বদেশ।

*   *   *

দিল্লির গগনচুম্বী অট্টালিকা আর দারিদ্র্যপিষ্ট শ্রমিকের জীর্ণ বস্তির মধ্যে যে পার্থক্য এখন চোখে পড়ে, প্রকৃত স্বাধীন ভারতে তা বজায় রাখা চলবে না। জাতির সম্পদ ও ক্ষমতা যদি সকলে মিলে সমানভাবে ভোগ করিতে না পারে—ধনী-নির্ধনের বিভেদ যদি নিঃশেষে বিলুপ্ত না হয়, তবে রক্তক্ষয়ী গণ-বিপ্লবের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং তা' কেউ রোধ করতে পারবে না।

*   *   *

ধর্মের দিক থেকে রামরাজ্যকে বলা যায়, ইহলোকে ভগবানের রাজত্ব। রাজনীতির দিক থেকে রামরাজ্যের অর্থ নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র। সম্পত্তি, জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে আজকের সমাজে যে অসাম্য রয়েছে রামরাজ্যে তা'

নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্র ও ভূমির মালিক হবে জনসাধারণ। মানুষ সুবিচার পাবে দ্রুত এবং বিনা অর্থব্যয়ে। কাজেই সেই রামরাজ্যে মত প্রকাশের ও ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে অবাধ।

* * *

মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্যে নয়, সমগ্র মানব সমাজের জন্য আমি সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাই। সম্পদ পুঞ্জীভূত হোক, কিন্তু কয়েক জনের হাতে নয়—সকলের হাতে। আজ যন্ত্রের জোরে মুষ্টিমেয় কয়েক জন কোটী কোটী মানুষের ওপর চেপে বসে আছে। শ্রম বাঁচাবার জন্যে বৈজ্ঞানিকের যে উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা, দোষ তার নয়, দোষ হচ্ছে মুষ্টিমেয় বিত্তবানের লোভ। আর এরই বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম।

* * *

I do believe that where there is only a choice between cowardice and violence, I would advise violence, ...I would rather have India resort to arms in order to defend her honour than that she should in a cowardly manner become or remain a helpless witness to her own dishonour. But I believe that non-violence is infinitely superior to violence. Forgiveness is more manly than punishment. Forgiveness adorns a soldier. But abstinence is forgiveness only when there is the power to punish, it is meaningless when it pretends to proceed from a helpless creature..... But I do not believe India to be helpless. I do not believe myself to be **a** helpless creature. Only I want to use India's and my strength for a better purpose.

* * *

I have always said since 1909 that means and ends are convertible terms, and that, therefore, when the means are various and even contradictory, the end must be different and even contradictory..... Many Congressmen do not admit this—to me obvious truth. They believe that the end justifies the means, whatever they may be.

* * *

I am a touchable by birth, untouchable by choice.

অষ্টম অধ্যায়

স্বাধীন ভারতের বাণী

এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিবার এবং ভারতের ভাবী শাসন-ব্যবস্থার জন্য একটি শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করিবার দৃঢ় ও পবিত্র সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে।

....এই প্রাচীন দেশ জগতে ইহার যথাযোগ্য সম্মানজনক স্থান লাভ করিবে এবং বিশ্বের শান্তি ও মানবজাতির কল্যাণ-বিধানে স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবে।

—ভারতীয় রাষ্ট্রিক আদর্শের ঘোষণা-পত্র

Service to mankind must be the watch-word of free India.... The core of all India-born faiths is universal love and fellowship. It is our duty as inheritors of this tradition to propagate the message of love and fellowship to the world at large.... The turmoils and conflicts in the world would end if this great message of ancient India is accepted by all.

On this day, the sixth anniversary of our independence, let us once again dedicate ourselves to the great task of contributing to our utmost to the happiness of our people and the general welfare of the world. It is a task which is at once a heavy responsibility as well as a privilege which freedom bequeathes.

We dedicate ourselves to the principles that make for peace and prosperity not only of our nation but of the human race. In this connection, we look back with satisfaction that our humble efforts in the cause of peace have begun to show signs of success.

—President Dr. Rajendra Prosad

"We have certain principles governing us. On account of our ancient culture which has taught us love and tolerance and good relations with neighbours, we have always been motivated to do something for humanity as a whole.... Whether people and nations like it or not, we will continue on the path we have followed, that of peace and truth, which is given to us by great men throughout history and by Mahatma Gandhi during our struggle for independence.

Throughout her long history, India has stood for peace and every prayer than an Indian raises ends with an invocation to peace. It was out of this ancient and yet young India that Mahatma Gandhi arose and taught us a technique of action that was peaceful and yet it was effective. The objectives of our foreign policy are the preservation of world peace and enlargement of human freedom.

Free India would continue to fight for the preservation of peace in this world with all the strength at her command.

—*Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru*

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে মহাত্মাজী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

'India will have to decide whether, attempting to become a military power, she would be content to become, at least for some years, a fifth-rate power in the world without a message, or whether she will by further refining and continuing her non-violent policy prove herself worthy of being the first nation in the world, using her hard-won freedom for the delivery of the earth from the burden which is crushing her in spite of the so-called victory'.

—স্বাধীন ভারতের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। সামরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ভারত হয়তো কয়েক বৎসরে জগতের শক্তিসমূহের মধ্যে একটি পঞ্চম শ্রেণীর শক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে, এরূপ ভারতের জগৎকে দিবার কিছু নাই। অথবা ভারত তাহার অবলম্বিত অহিংস-নীতি আরও বিশুদ্ধভাবে অনুবর্তন করিয়া হিংসা-দ্বেষ যুদ্ধ-বিগ্রহে ভারাক্রান্ত জগতের উদ্ধারার্থে তাহার কষ্ট-লব্ধ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে পারে। ভারত তাহা হইলে জগতের সর্ববরেণ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। স্বাধীন ভারত কোন্ পথে যাইবে এক্ষণে তাহা স্থির করিতে হইবে।

মহাত্মাজীর আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের অনুসরণ করিতেই স্বাধীন ভারত চেষ্টা করিতেছে, সামরিক বলবৃদ্ধির প্রচেষ্টা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়! ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন অশোকচক্র-শোভিত ভারতের জাতীয় পতাকা। অশোক-স্তম্ভের শীর্ষদেশে স্থাপিত ছিল বলিয়া ইহাকে অশোক-চক্র বলা হয়। বুদ্ধত্ব লাভের পর বোধিসত্ত্ব তাঁহার পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যের নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। ইহা বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে 'ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত' (ধর্মচক্র-প্রবর্তন সূত্র) বলিয়া পরিচিত। চক্র শব্দে চাকাও (wheel) বুঝাইতে পারে, অথবা রাজ্য, অধিষ্ঠান-স্থানও (Dominion, circle or sphere of authority) বুঝাইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠে বুঝা যায় যে, ধর্মচক্র প্রবর্তন অর্থ ধর্মরাজ্যের (kingdom of Righteousness) প্রবর্তন, গান্ধীজী যাহাকে রামরাজ্য বলিতেন। বুদ্ধদেব বিশ্বজগতে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির বাণী প্রচার করিয়াছেন

এবং তাঁহার রাজর্ষি শিষ্য প্রিয়দর্শী অশোকও ঐ মহান্ ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিয়া জগতে নমস্য হইয়াছেন। অশোক-চক্র এইরূপ ধর্মরাজ্যেরই প্রতীক। জাতীয় পতাকায় উহা গ্রহণ করিয়া গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষিত ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির চিরন্তন আদর্শই স্বাধীন ভারত অনুসরণ করিয়াছে।

এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভের অনেক পূর্বেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্বাণীরূপে যে সুন্দর কথাটি বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি—

'কামান-বন্দুকের শব্দ, তরবারির ঝন্‌ঝনানি, রক্তস্রোতের কলকলধ্বনি যখন থামিবে, যখন হিংসাদ্বেষ দর্প অহঙ্কারের একান্ত বিনাশ সাধন হইবে, —তখন হয়ত বিশ্বজগৎ বুঝিবে বাহুবলের দ্বারা কখনওই বিশ্বসাম্রাজ্য গঠন সম্ভব নয়। অন্তর্জাতীয় সখ্য স্থাপনের দ্বারা সে সাম্রাজ্য স্থাপন একমাত্র সম্ভব। হিন্দু ভারতবর্ষের লুপ্ত সাধনা তখন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে হিংসাদ্বেষ ভুলিতে বলিবে, তাহাদের সেনাবল বৃদ্ধি নিষেধ করিয়া সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিতে বলিবে। রোমীয় সাম্রাজ্যের বৈরীর সাধনা পুনর্জীবিত হইয়া ইউরোপের ইতিহাসে বহুবার অশান্তি মহানিষ্ট আনিয়া দিয়াছে। হিন্দুভারত-সাম্রাজ্যের মৈত্রীর সাধনা ইউরোপীয় জগতে প্রচারিত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই, পাশ্চাত্য জগতের এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যেই রোমীয় ভাবের মোহ দূর হইবে। বিশ্বমানবের নব মৈত্রী-গীতার প্রচার হইবে। পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় সাধনার মহিমা তখন বুঝিবে, মৈত্রী, প্রেম সাধনার দ্বারা বিশ্বজগৎ তখন শান্তিরাজ্য গঠন করিবে, জাতির সহিত জাতির ব্যবহারে হিংসানীতি বিসর্জিত হইবে, বিশ্বজগৎ এক বিরাট প্রেমরাজ্যের অভ্যুত্থান দেখিবে, সে বিরাট রাজ্যের অবলম্বন হইবে—নেপোলিয়ান, শার্লিমান, সীজার, আলেকজাণ্ডারেরও সাধনা নয়—জগতে প্রথম প্রেমসাম্রাজ্যের অধিনায়ক, ধর্মনীতির প্রচারক ভিক্ষু সম্রাট দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের সাধনা। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জগতের সাধনা তখন সিদ্ধিলাভ করিবে, শুধু ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা নহে।'

—মনোময় ভারত

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে পূর্বে গান্ধীজীর যে কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহা তাঁহার স্বপ্নরাজ্যের আদর্শ যাহাকে তিনি রামরাজ্য বলিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

....'My conception of Ram Raj excludes replacement of the British army by a national army of occupation.'

—আমার স্বপ্নের স্বাধীনতা হইতেছে রামরাজ্য, সে রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর স্থলে জাতীয় সৈন্যবাহিনী অধিষ্ঠিত করিলে চলিবে না। সে রাজ্যে কোনও সৈন্যবাহিনীই থাকিবে না।

ইহা আদর্শমাত্র, এই স্বপ্ন যে কখনও বাস্তবে পরিণত হইবে ইহা কল্পনা করা যায় না, গান্ধীজী স্বয়ংই একথা বলিয়াছেন।

'আমার আকাঙ্ক্ষিত রামরাজ্য বাস্তবে কখনই সম্ভব নয়। 'রামরাজ্য' মানবীয় কল্যাণের একটা আদর্শ রূপ—তা লাভ করা যাবে না কোনওদিন। কিন্তু তা লাভ করার জন্য চিরপ্রয়াসই হল মানুষের কাজ। আদর্শ যদি কোনওদিনও সফল না হয়, তাতে কিছু আসে যায় না; কারণ সৎপ্রয়াসী মানুষই একটা সুন্দর কল্যাণের রূপ।"

মানবীয় কল্যাণের এই আদর্শ রূপটি সম্মুখে রাখিয়াই ভারতবর্ষ চলিতেছে। তাহার সৈন্যরক্ষা আত্মরক্ষার্থ, পররাজ্য আক্রমণ বা অধিকারের নিমিত্ত নয়।

বস্তুত, অস্ত্রবল একেবারে বর্জন করিয়া কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে বর্তমান জগতে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সসম্মানে টিকিয়া থাকাই সম্ভবপর নয়। শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, জগতের নমস্য ধর্মাশোকের বিশাল সাম্রাজ্য অনতিবিলম্বেই বিরুদ্ধশক্তির-সংঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এ বাস্তবতায় সচেতন আছেন, তাঁহারা অন্ধ আদর্শবাদী নন। গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য এবং 'উত্তরাধিকারী' স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রথম কর্ণধার জওহরলালজী বলিয়াছেন—

'I am not a pacifist. Unhappily the world of to-day finds that it cannot do without force. We have to protect ourselves and to prepare ourselves for every emergency. We have to meet aggression and evils of other kind. To surrender to evil is always bad. But in resisting evil we must not allow ourselves to be swept away by our own passions and fears and act in a manner which is itself evil. Even in resisting evil and aggression we have always to maintain the temper of peace and hold out the hand of friendship to those, who through fear or for other reasons, may be opposed to us. That is the lesson that our great leader Mahatma Gandhi taught us, and imperfect as we are, we drew inspiration from that teaching.'

—'কোনও অবস্থায়ই যুদ্ধ করিব না, এরূপ শান্তিবাদী আমি নই। দুঃখের বিষয় জগতের বর্তমান অবস্থায় সৈন্যবল পরিহার করা সম্ভবপর নয়। আত্মরক্ষার জন্য,

বিপন্ন দুর্বলের সাহায্যের জন্য, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করা কাপুরুষতা। কিন্তু কর্তব্যবোধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলেও আমরা নিজেরা শান্ত ও সংহত থাকিব, ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশীভূত হইব না, যে শত্রুতা করে, অন্যায় করে, তাহার প্রতিও মৈত্রীভাব পোষণ করিব। মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে এই মহতী নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। দুর্বল মানব আমরা, তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া এই পথে চলিতেছি।'

ইহাই গীতোক্ত ধর্মযুদ্ধ-নীতি। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরের মত দণ্ডায়মান হও, কাপুরুষতা, ক্লীবতা ত্যাগ কর ('ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ')। কিন্তু কাহারও প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিবে না, বৈরভাব পোষণ করিবে না, সকলের প্রতিই মৈত্রীভাব রক্ষা করিবে ('অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।' 'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু।') শত্রু-মিত্রে সমভাবাপন্ন হইবে ('সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ')।

অবশ্য, এ বড় কঠিন কথা। কঠিন কথাই তো হইতেছে। এ তো লৌকিক রাজনীতি নয়, এ আধ্যাত্মিক রাজনীতি, গান্ধীর অনুসৃত নীতি।

জগতের অহিতকারী অসুরগণকে প্রতিরোধ করিতে হইলে যুদ্ধ অনিবার্য, তাই বলিয়া কি আমাদিগকেও অসুর হইতে হইবে—ঈর্ষাদ্বেষ-কামক্রোধ-মদ-মত্ততায় ক্ষিপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে? অসুর-বধের জন্য সুদর্শন চক্রের আবশ্যক হয়, কিন্তু চক্রধারী সম শান্ত নির্বিকার; তাঁহার শত্রু-মিত্র নাই ('সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ')।

নৃপাসুর জরাসন্ধ একশত পরাজিত রাজাকে বলিদান করিবার জন্য নিদারুণ সঙ্কল্প করিয়াছিল। দুর্ধর্ষ অসুরকে বাধা দিতে পারে এমন লোক ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ, ভীমার্জুন সহ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিয়াছেন—'তুমি কি বলিয়া এমন ভয়াবহ ক্রূরকর্মে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছ? তোমাকে বাধা না দিলে আমাদিগকেও তোমার এই পাপে পাপী হইতে হইবে, কারণ আমরা ধর্মাচারী ও ধর্মরক্ষণে সমর্থ। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত নৃপতিগণকে মুক্তিদান কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে যাও। আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে, বল।'

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হইলে ক্ষত্রিয়গণ কখনই যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইতেন না, কিন্তু যুদ্ধ করিলে যে জরাসন্ধই যমালয়ে যাইবে তাহার অবশ্য কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তের দিন দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ভাবে ভীমসেনের সহিত এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

অধর্ম-অত্যাচারের প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইলে অত্যাচারীর পাপের ভাগী হইতে হয়, ইহাই ভারতের শিক্ষা, ভারতের চিরন্তন রাজধর্ম। স্বাধীন ভারত এই শাশ্বত ধর্মই তাহার বৈদেশিক নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সমস্ত দেশগুলি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের খাসতালুকে পরিণত হইয়াছিল। এখনও অনেক দুর্ভাগ্য দেশ তাহাদের কুক্ষিগত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ এই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধিতায় অগ্রণী-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ভারত সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত এই দেশগুলির প্রতি আন্তরিক সৌভ্রাত্র ও সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সতত তাহাদের সাহায্যার্থে সচেষ্ট। এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহে ভারতের এই ভূমিকা বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় ভারতের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা নানাক্ষেত্রে কার্যত পরীক্ষিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই সম্মান ও সমর্থন লাভ করিয়াছে। আজ সমগ্র জগৎ দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। 'মুক্ত দুনিয়ার' বার্তাবহক মার্কিনী কর্তারা এই মত পোষণ করেন যে, যতদিন জগতে একটিও কমুনিষ্ট রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোথাও গণতন্ত্র নিরাপদ নয়। সুতরাং তাহারা জগৎকে কমুনিষ্ট-মুক্ত রাখিবার জন্য সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারেই সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন এবং ডলার খয়রাতের জোরে অন্যান্য রাষ্ট্রকেও নিজেদের জোটে টানিয়া আনিতেছেন। ওদিকে অমিতবিক্রম সোভিয়েট কর্তারাও বিপুল সৈন্যবল ক্রমশ বিপুলতর করিতেছেন। উভয়পক্ষ আণবিক বোমা এবং ততোধিক প্রলয়ঙ্কর হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় লাগিয়েছেন। এই দুইটি বিরোধী পক্ষ পরস্পরের প্রতি গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করে, উহাই বর্তমান জগতে অশান্তির মূল কারণ। সকল দেশেরই জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রনায়কগণও প্রকৃতপক্ষে শান্তিকামী, তবুও বিভিন্ন রাষ্ট্র হয় মার্কিন না হয় মস্কোর পতাকাতলে মিলিত হইতেছে, উহাতেই বিশ্বশান্তির সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। ভারতবর্ষ জগতের সর্ববৃহৎ অ-কমুনিষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমেরিকাও সর্বপ্রধান অ-কমুনিষ্ট গণতান্ত্রিক রাজ্য। সুতরাং এ উভয়েরই সংযোগ ও সহযোগিতা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারত যুদ্ধ-বিরোধী, ভারত বিশ্বাস করে যে, এই বিশাল বিশ্বজগতে গণতন্ত্র ও কমুনিষ্টতন্ত্র উভয়ই সম্প্রীতি ও সৌভ্রাত্র সহকারে অবস্থান করিতে পারে, একটিকে টিকিয়া থাকিতে হইলে যে আর একটিকে উৎসন্ন করিতে হইবে তাহার কোনও কারণ নাই; সে চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক বোমা প্রভৃতির অবতারণায় মানবসভ্যতাই লোপ পাইবে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, সোভিয়েট-মার্কিন বা অন্য কোনও বিবাদমান শক্তিগোষ্ঠীর কোনও পক্ষই যোগদান

করিবে না, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। কোনওরূপ ভয়, হুমকি বা প্রলোভনই তাঁহাকে এ সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। যে সকল রাষ্ট্র এইরূপ নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করে, সে সমস্ত লইয়া ভারত একটি নিরপেক্ষ ক্ষেত্র গঠন করিয়া উহার প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। অতি অল্প সময় মধ্যে স্বাধীন ভারত প্রকৃত শান্তিকামী বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহার এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে। ভূখণ্ডের অনেক রাষ্ট্রই যে এ বিষয়ে ভারতের সহযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের নিরপেক্ষতা অর্থ নিষ্ক্রিয়তা বা উদাসীনতা নয়। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, বিশ্বজগতের এই সকল গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের কোনও মতামত নাই বা ঐ সকল সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিতে ভারত সচেষ্ট নয়। প্রত্যুত, শান্তিকামী ভারত যুদ্ধাদি নিবারণের জন্য এবং জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য সর্বদাই আগ্রহশীল ও সচেষ্ট আছে এবং তজ্জন্যই সে কোনও শক্তিচক্রের সহিত যোগদানে অনিচ্ছুক। তাহার স্বাধীন ও সতন্ত্র পররাষ্ট্রনীত এশিয়া, আফ্রিকা ও

ইউরোপের অনেক দেশেই পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতেছে। বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণ সাধনই স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে শ্রীনেহরুর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

'We wanted to follow not merely a neutral or negative policy but a positive one, naturally helping those forces that we consider right and naturally disapproving of the things that we do not like but fundamentally keeping away from other countries and other alignments of powers which normally lead to major conflicts. That does not mean that, in our economic life or in other spheres of life, we do not incline this way or that; it does, however, mean in the jargon of the day, that we do not line up with this or that set of forces but try to maintain a certain friendliness and spirit of co-operation with both the great and the small countries of the world.'

'The objectives of our foreign policy are the preservation of world peace and enlargement of human freedom.'

'We have to meet aggression and to resist it and the force employed must be adequate to the purpose. But even when preparing to resist aggression the ultimate objective, the objective of peace and reconciliation, must never be lost sight of and heart and mind must be attuned to this supreme aim and not swayed or clouded by hatred or fear.

This is the basis and the goal of our foreign policy.

'We are neither blind to reality nor do we propose to acquiesce in any challenge to man's freedom from whatever quarter it may come. Where freedom is menaced or justice threatened or where aggression takes place, we cannot be and shall not be neutral. What we plead for and endeavour to practise in our own imperfect way is a binding faith in peace and an unfailing endeavour of thought and action to ensure it.'

'আমাদের নিরপেক্ষ-নীতি নিষ্ক্রিয় নীতি নয়, উহা সক্রিয়। যাহা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি তাহা সমর্থন করি এবং তাহাতে সাহায্য করি, যাহা অন্যায় মনে করি তাহার বিরোধিতা করি। কিন্তু সততই আমরা বিবদমান শক্তিচক্র হইতে

দূরে থাকিব; কোনও পক্ষাবলম্বন করিব না, উহাতে সংঘর্ষ প্রবলতর হইবারই সম্ভাবনা। আমরা ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল দেশের সহিতই সমভাবে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভার রক্ষা করিয়া চলিতেছি।

... ...

'আমাদের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হইতেছে—বিশ্বের শান্তিরক্ষা এবং মানব-স্বাধীনতার প্রসার।

'শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবেই এবং উপযুক্ত সামরিক শক্তিসহকারে উহার প্রতিরোধও করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রতিরোধকালেও আমরা ভুলিব না যে, আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য শান্তি ও সম্প্রীতি, যুদ্ধ নয়। চিত্তকে ভয়-বিদ্বেষ হইতে নির্মুক্ত করিয়া আমরা সততই এই উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিব। ইহাই আমাদের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি এবং লক্ষ্য।'

'আমরা বাস্তবতায় দৃষ্টিহীন নই, মানব-স্বাধীনতার বিরোধিতা যেখান হইতেই আসুক না কেন, তাহা আমরা নীরবে উপেক্ষা করিব না। যখন স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, যথায় অন্যায় ও জুলুমবাজির আবির্ভাব হয়, তথায় আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি না, থাকিবও না। কিন্তু আমরা শান্তিকামী, শান্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাসী, চিন্তায় ও কার্যতায় বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য আমাদের অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তদনুরূপ চেষ্টাই আমরা করিতেছি।'

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির তাত্ত্বিক আলোচনা
অভিমত (সংক্ষিপ্ত)

যুগান্তর—মানব-সভ্যতার আদি যুগ হইতে ভারতবর্ষ নিজস্ব একটি ভাবধারা ও বাণী বহন ও প্রচার করিয়া আসিতেছে। সমগ্র বিশ্বের আনন্দ বেদনাকে একেবারে নিজের মনে করিয়া নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করা, শিক্ষা ও জ্ঞানকে আত্মার সেই বিচিত্র অনুভূতির মহৎ আদর্শের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে লোক-কল্যাণ ও মানব-প্রীতিকে শ্রেয়ঃ হিসাবে গ্রহণ করাই সেই বাণী। আদি যুগে এই বাণী ও ভাবধারা প্রচার করিয়াছেন মুনি ঋষি, মহাপুরুষ ও তত্ত্বব্যাখ্যাতাগণ, আজিকার পৃথিবীতে সেই বাণীরই প্রচার সাধন ও নূতনতব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রভৃতির জীবন রচনা ও চিন্তাধারায়। এই বিরাট ভাবগঙ্গাকে প্রবীণ লেখক পুস্তকাকারে অত্যন্ত উপভোগ্যভাবে সঙ্কলন ও পরিবেশন করিয়াছেন। একটা জাতির সুবিস্তীর্ণ আত্মিক ভাব-সাধনার ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দূরূহ কাজ। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিরাট ইতিহাসের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের পরিচয়ই আছে। লেখকের গভীব পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রানুসন্ধান ও আদর্শনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় গ্রন্থখানির সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। চিত্রগুলি গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা—ভাবত-আত্মার মূল বাণী তার আধ্যাত্মবাদ। শুধু আত্মার মুক্তি নয়, আত্মার উদ্ধার নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধই ভারতের অধ্যাত্মশিক্ষা। ঋক্ বেদ থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শন পর্যন্ত এই সর্বকল্যাণময় ঐক্যবোধের অব্যয় ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। সেই সনাতন ধারাটি বিভিন্ন মহাপুরুষদের নানা উপলব্ধিতে নানা ব্যাখ্যানে যে সর্বক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আশ্চর্য দক্ষতায় সেই সব ব্যাখ্যাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এমন সহজ ভাষা ও সরল উদ্ধৃতির তিনি সাহায্য নিয়েছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষেও তার ব্যাখ্যাব স্বাদ গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই।

শুধু তত্ত্ব নয়। তথ্যের দিক থেকেও এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। স্বল্প পরিশ্রমে যারা ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান এই বইখানি যে তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দেশ—গ্রন্থকার বাংলার চিন্তাশীল সমাজে অতি সুপবিচিত। তাঁহার ব্যাখ্যাত 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও তাঁহার প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণ' তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। তাঁহার প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতের সংস্কৃতি-সম্পর্কিত। বহুর ভিতর একের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় সভ্যতার ইহাই সনাতন আদর্শ। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার সমগ্র আলোচনায় এই

সত্যটিই পরিস্ফুট করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ হইতে গ্রন্থকার বহু রচনারাজি উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের সাংস্কৃতিক সূত্র ধরিয়া পুস্তকখানির আরম্ভিক এই আলোচনা ভগবান বুদ্ধের বিশ্বপ্রেম, মানব-মৈত্রী ও মহাকরুণার কীর্তনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে বলা চলে। ইহার পর মধ্যযুগের ভক্তিবাদে মানবতা ও মৈত্রীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার পর আধুনিক ভারতের প্রসঙ্গ।

গ্রন্থকার মনস্বী পুরুষ। ভগবান বুদ্ধ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর বাঙময় অবদানের কুঞ্জকানন হইতে তিনি যে ভাবে অনবদ্য কুসুমরাজি চয়ন করিয়াছেন এবং সুনিপুণ হস্তে মালা গাঁথিয়া পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বাণীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন তাহা তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রাচীন ও আধুনিক কালের ব্যবধান কাটাইয়া ভারতের সনাতন আদর্শ এতদ্বারা আমাদের দৃষ্টিতে সমুজ্জল হইয়া উঠে এবং ভাবের সেই আলোক-সম্পাতে আমাদেব চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়। আমরা মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুপ্রেরণা লাভ করি। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর। কয়েকখানি চিত্রে গ্রন্থখানি সুশোভিত। প্রচ্ছদপট অতীব মনোমুগ্ধকর।

হিমাদ্রি—ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে গ্রন্থকারের অধিকার সুবিদিত। ইহার ব্যাখ্যাত 'গীতা' ও রচিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহের এবং সাধক মনীষীদের বাণীসমূহের নিপূণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাব মাধ্যমে শ্রীযুক্ত ঘোষ ভারত-আত্মার মর্মবাণীটি প্রকাশিত কবিয়াছেন।

প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের ভারতীয় জীবনে বিশ্বপ্রেমের যে মহান্ আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে. গ্রন্থকার শ্রদ্ধা ও ধৈর্যের সহিত আটটি অধ্যায়ে তাহা গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাতে ঋষিযুগের শাস্ত্রীয় বচন, বুদ্ধবাণী, মধ্যযুগের ভক্তি ও প্রেমের আদর্শ এবং আধুনিক যুগের ভারত-আত্মার মর্ম-ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতির বাণী সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্র ও সাধন-মার্গের মূল তত্ত্বটি এই দেশের আদর্শে, জীবনে ও সাধনায় এক অন্তঃসঞ্চারী ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, ইহা লেখকের গ্রন্থে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মনোজ্ঞ ও মূল্যবান্ গ্রন্থ।

উদ্বোধন—এই সুপরিকল্পিত পুস্তকখানিতে লেখক শাস্ত্রাদি হইতে এবং আধুনিক যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষ ও মনীষীদিগের প্রচুর লেখা ও কথা উদ্ধৃত করিয়া ভারত-আত্মার যথার্থ বাণী কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর্যসভ্যতার মূলমন্ত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই গ্রন্থের প্রধানতম উদ্দেশ্য। জনসমাজে ভারত-আত্মার যথার্থ বাণী-প্রকাশক এই জাতীয় পুস্তকের একান্ত আবশ্যকতা আছে।